বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সেলিনা শিউলী

ভাস্কর্য 'বীর বাঙ্গালী' বগুড়া

বাঙালির ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। বগুড়া জেলা বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। সেই জনপদের ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি উদ্ধার, যাচাই-বাছাই ও গ্রন্থনার দায়িত্ব পালন করেছেন ইতিহাস-সন্ধানী গবেষক সেলিনা শিউলী। বগুড়ার প্রায় প্রতিটি উপজেলা ঘুরে, একেবারে তৃণমূলের অনেক ঘটনা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে সেলিনা শিউলী গভীর দেশপ্রীতির স্বাক্ষর রাখলেন। মেধা ও শ্রমের পাশাপাশি তিনি সাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। আক্ষেপের বিষয় হলো, বগুড়ার মতো ঐতিহ্যবাহী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে এখনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এলেন গবেষক সেলিনা শিউলী। শিক্ষকতার মতো সার্বক্ষণিক দায়িত্বশীল পেশায় ব্যস্ত থাকার পরেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সন্ধান করেছেন। জন্মস্থান বগুড়া না হলেও কেবল কর্ম ও বসবাসের দায় ও অঙ্গীকার থেকেই তিনি বগুড়াকে ভালোবেসেছেন এবং ইতিহাস রচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষকের এই প্রতিশ্রুতিকে সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। এই কারণে বগুড়াবাসীও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারে। হয়তো ইতিহাসের সকল ঘটনা তিনি উদ্ধার করতে পারেননি, হয়তো এই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ নয়, তবু সেলিনা শিউলীর এই প্রচেষ্টা সন্দেহাতীতভাবে পথিকৃতের। যত সীমাবদ্ধতাই থাক, এই গ্রন্থকে আমলে নিয়েই কিংবা এই তথ্যকে অনুসরণ করেই একদিন নির্মিত হতে পারে বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। আপাতত সেলিনা শিউলীর 'বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'ই হতে পারে গ্রহণযোগ্য এক সাহসী প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থের তথ্য হতে পারে অবশ্যম্ভাবী উপকরণ। যে কোনো অঞ্চলের পাঠকই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন, এই প্রত্যাশা আমাদের।

সাংবাদিক-গবেষক সেলিনা শিউলীর জন্ম ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২। বাবা মতিয়ার রহমান তালুকদার, মা জাহান আরা রহমান। জন্ম কুমিল্লায়, বড় হয়েছেন ঢাকায়, পৈত্রিক বাস পিরোজপুরে ও বাগেরহাটে, কর্মসূত্রে আবাস বগুড়ায়। মিরপুর শহীদ স্মৃতি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ থেকে স্নাতক এবং বগুড়া আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পেশায় শিক্ষক, নেশায় সাংবাদিক ও গবেষক। শিক্ষকতা করছেন বগুড়ার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে। আর লিখছেন দৈনিক 'প্রথম আলো', 'দ্য ডেইলি স্টার', দৈনিক 'সমকাল', দৈনিক 'যুগান্তর', পাক্ষিক 'স্টার ইনসাইট', 'সাপ্তাহিক ২০০০'-সহ দেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকপত্রে। ২০০৫ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রদত্ত 'বগুড়া জেলার শ্রেষ্ঠ পাঠক' হিসেবে পুরস্কার লাভ। সাংবাদিক হিসেবে ২০০৭ সালে অর্জন করেছেন 'সালমা সোবহান ফেলোশিপ'। 'প্রথম আলো বন্ধুসভা'র বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি। পাঠক হিসেবে সর্বভুক। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, ইতিহাস, সংগীত, বিশ্বসাহিত্য– কোনো কিছুই তার আগ্রাসী এলাকার বাইরে নয়। কাজ করতে ভালোবাসেন নীরবে-নিভৃতে। এক হাতে কলম আরেক হাতে ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে ছুটে চলেন পথ থেকে পথে– যেন মোনাজাতউদ্দিনের যোগ্য উত্তরসূরি। রবীন্দ্রপ্রেমী সেলিনা শিউলীর সৃষ্টি ও কর্মে বাঙালির চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের নানান অনুষঙ্গ উঠে আসে কখনও কবিতায়, কখনো গল্পে, কখনো প্রতিবেদনে, কখনো প্রবন্ধে। ইতিহাস নিয়ে রয়েছে অপরিসীম আগ্রহ। তারই পরিণত প্রকাশ এই গবেষণাগ্রন্থ 'বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'।

বগুড়া জেলার

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

বগুড়া জেলার
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সেলিনা শিউলী

গতিধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

উৎসর্গ

শহীদ মুক্তিযুদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি

সূ চি প ত্র

অবতরণিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। বাংলা একাডেমীর প্রণীত জেলা পর্যায়ের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন প্রকল্পও আলোর মুখ দেখেনি। দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের উপাদান-উপকরণ। সরকারি উদ্যোগ ফলপ্রসূ না হলেও নিজস্ব উদ্যোগে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় এগিয়ে এসেছেন। সাংবাদিক ও গবেষক সেলিনা শিউলী তাঁদেরই একজন।

আমরা অনেকেই জানি যে, মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারা খুব বেগবান না হলেও যথেষ্ট সচল। বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ ও গবেষক এই কাজে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিশেষত ড. সুকুমার বিশ্বাস, ড. আবুল আহস[illegible] চৌধুরী, ড. মাহবুবর রহমান, ড. নুরুল ইসলাম মনজুর, ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ গবেষক মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় ভূমিকা রেখে চলেছেন। কেউ কেউ গ্রন্থও রচনা করেছেন। ড. মাহবুবর রহমান (গাইবান্ধা), ড. মো. গাউস মিয়া (খুলনা), ড. স্বরোচিষ সরকার (বাগেরহাট), ড. সুজিত সরকার (নাটোর), গাহজাহান শাহ ও ড. মাসুদুল হক (দিনাজপুর), মাহফুজুর রহমান (হবিগঞ্জ), আবুল কাসে[illegible] (কুমিল্লা) ড. নাজমুল হক (পঞ্চগড়), রফিকুর রশীদ (মেহেরপুর), আবু সাঈদ খান (ফ[illegible]র), মহসিন হোসাইন (নড়াইল), নকিব ফিরোজ ও শ্যামলচন্দ্র সরকার (ঝালকাঠী), আলী আহাম্মদ খান আইয়োব (নেত্রকোণা), ড. তপন বাগচী (গোপালগঞ্জ), ড. মযহারুল ইসলাম তরু (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), আশফাক হোসেন (মৌলভীবাজার), রাজিব আহমেদ (চুয়াডাঙ্গা), হাবিবউল্লাহ বাহার ও জুলফিকার হায়দার (টাঙ্গাইল) এবং কালাম ফয়েজী (ভোলা) প্রমুখ গবেষক জেলা পর্যায়ের ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আরো অনেকে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে চলছেন। সেলিনা শিউলীর 'বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধ এই ধারার নবতর সংযোজন।

বাঙালির ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী বগুড়া জেলা বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। সেই জনপদের ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি উদ্ধার, যাচাই-বাছাই ও গ্রন্থনার দায়িত্ব পালন করেছেন ইতিহাস-সন্ধানী গবেষক সেলিনা শিউলী। বগুড়ার প্রায় প্রতিটি উপজেলা ঘুরে, একেবারে তৃণমূলের অনেক ঘটনা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে সেলিনা শিউলী দেশপ্রীতির স্বাক্ষর রাখলেন। মেধা ও শ্রমের পাশাপশি সেলিনা শিউলী সাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। বগুড়ার মতো ঐতিহ্যবাহী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে এখনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। সেই

অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এলেন এই গবেষক। শিক্ষকতার মতো দায়িত্বশীল পেশায় ব্যস্ত থাকার পরেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সন্ধান করেছেন। জন্মস্থান বগুড়া না হয়েও কেবল কর্ম ও বসবাসের দায় থেকেই তিনি বগুড়াকে ভালবেসেছেন এবং ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। গবেষকের এই প্রতিশ্রুতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। এই কারণে বগুড়াবাসীও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারে।

সেলিনা শিউলী পেশাদার ইতিহাসবিদ নন। দেশমাতৃকার প্রতি প্রবল অনুরাগে তিনি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পেশাদার ইতিহাসবিদরা যখন চুপ করে বসে থাকেন, তখন এরকম দেশপ্রেমী মানুষেরাই এগিয়ে এসেছেন ইতিহাস রচনায়। এবং কালের বিচারে তাঁদের ইতিহাসগ্রন্থও আজ পেশাদার ইতিহাসবিদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি সেলিনা শিউলীর শ্রমও বৃথা যাবে না। কারণ এই উদ্যোগের পেছনে কোনো ধান্ধা নেই। তাঁর মতো গবেষক প্রতিটি জেলায় একজন করে থাকলেও আমাদের জাতীয় ইতিহাস এতদিনে পূর্ণতা পেত।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, সকল অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি একটি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছি। আমার শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য সকল প্রশংসা কাছে এসে পৌঁছেনি। তবে নিন্দাটুকু যথাসময়েই পৌঁছেছে। সেলিনা শিউলীও হয়তো তেমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারেন। অগ্রজ গবেষকের অধিকার থেকে তাঁকে বলতে চাই, তাতে দমে গেলে চলবে না। কারণ, যদি বগুড়ার ইতিহাস লেখার যোগ্য কেউ থাকতেন, তাহলে এতদিনে তাঁদের এগিয়ে আসার সময় হতো।

হয়তো ইতিহাসের সকল ঘটনা তিনি উদ্ধার করতে পারেননি, হয়তো এই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ নয়, তবু সেলিনা শিউলীর এই প্রচেষ্টা সন্দেহাতীতভাবে শংসাযোগ্য। যত সীমাবদ্ধতাই থাক, এই গ্রন্থকে আমলে নিয়েই কিংবা এই তথ্যকে অনুসরণ করেই একদিন নির্মিত হতে পারে বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। আপাতত সেলিনা শিউলীর 'বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধ গ্রহণযোগ্য এক সাহসী প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থের তথ্য হতে পারে অবশ্যম্ভাবী উপকরণ। যে কোনো অঞ্চলের পাঠকই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন, এই প্রত্যাশা আমাদের।

ড. তপন বাগচী
কবি সাংবাদিক গবেষক
যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, একুশে টেলিভিশন
'মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ' গ্রন্থের প্রণেতা।

মুখবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালি স্বাধিকার চেতনার ইতিহাস। আপামর বাঙালি যে কোনও বয়সসীমায় মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে হৃদয়ে। বুক তাদের গর্বে হয়ে ওঠে স্ফীত। রক্তাক্ত একাত্তর আমাদের লড়ে যাওয়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার ভাষা শেখায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিদের শেকড়লগ্ন একটি পরিব্যাপ্ত আশ্রয়। মাটি ও মানুষের অবধারিত উপস্থিতি, লড়াই আর আত্মপ্রত্যয়ের বীজ গেঁথে ছিল এই মুক্তিযুদ্ধেই। মুক্তিযুদ্ধের কথা এলে মনে ভেসে ওঠে বলা না বলা, জানা অনেক প্রাণের কথা, অনেক ছবির দৃশ্যকল্প। এদেশে ক্যু হয়েছে আক্ষরিক অর্থে বেশ কয়েকবার। ১৯৭১ সালটাই তার ঋণশোধ করে। ১৮৩০ সালে এ দেশে যে আন্দোলনগুলো শুরু হয়েছিল তার ব্যাপ্তি ১৯৭১ এ এসে পূর্ণতা পায়।

আমি ইতিহাসবেত্তা নই। ইতিহাস বিজ্ঞানের গতিপথ বিশ্লেষণ আমার অধীত বিদ্যায় পড়ে না। বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ও স্বাধীনতাপূর্ব সময়গুলোয় বাংলাদেশকে নিয়ে কাজ করার তাগিদ অনুভব করেছি বরাবর। এরই পরিক্রমায় বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধকে বেছে নিয়েছি। ইতিহাস বিষয় নিয়ে ছেলেবেলা থেকেই ছিল অপরিসীম আগ্রহ। যা কিছু শিখেছি তার মূল পর্যন্ত জানার আগ্রহ ছিল বরাবরই। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ ভাবনাটা। বগুড়াকে নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনাটা তৈরি হয়। এ বিষয়টির কোনও রূপরেখা তৈরি করতে পারছিলাম না যখন দ্বিধাবিভক্তি কাজ করছিল মনে, তখন এগিয়ে এসেছেন একজন। ড. তপন বাগচী। অভয় দিলেন, সাহস জোগালেন। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যউপাত্তের ঘাটতি পেয়েছি। পাঠাগারে ধরনা দিয়েছি। যার কথা জেনেছি সেদিকেই ছুটে গেছি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু জানতে। বিশিষ্ট জনের কথা, স্মৃতিচারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের ধারা বর্ণনায় সেই ভয়াল নয়টি মাস। অনেক ত্যাগ আর প্রাপ্তির মাসগুলো নিয়ে কথা বলেছেন অনেকেই। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছি যারা তথ্য দিয়েছেন। আমাকে কাজ করতে সাহসী করেছেন। কাজ করতে গিয়ে মিশ্র অভিজ্ঞতাও হয়েছে প্রচুর। শুধু যে স্বাধীনতার পক্ষে অর্থাৎ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয় বিপক্ষের মানুষও ছিল। দু'পক্ষের কথা শুনেছি। অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ নয় মাস বগুড়াসহ তার আশে পাশের বিপন্ন মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াইও প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাদের জবানীতেই।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলোর ধারাবাহিক লেখাও সম্ভব হয়নি নানা জটিলতায়। এ কথা বললে এতটুকু অত্যুক্তি হবে না যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ

এখনও সংগৃহিত হয়নি। দেশের অন্য সব জেলার মতো বগুড়ায়ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা লিখেছে তাতে বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গতা প্রায় নেই বললেই চলে। আমি জানি না এর কতটা কাজ করতে পেরেছি আমি। তবে কাজ করতে গিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এতটুকু বলতে পারি মাত্র। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্টজনের লেখা, পত্র পত্রিকা, মতবাদ, যুদ্ধের দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া নানা কাহিনী, নানা রক্তঝরা দিনের কথা, প্রত্যক্ষদর্শীর কথাতেও উঠে এসেছে নানা বিষয়। কাজ করতে গিয়ে দেখেছি দীর্ঘ ৩৭ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো নিয়ে অনেকেই কথা বলতে আগ্রহী হননি। কেউবা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নানা দিক বিবেচনা করে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সবাই। ঘরে-বাইরে, সমরাঙ্গনে, অন্দরে যে যেভাবে পেরেছে মুক্তিপাগল মানুষদের সাহায্য করেছে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নানা পেশার নানা বয়সের মানুষের একটাই আকাঙ্ক্ষা ছিল 'আমাদের বগুড়াকে বাঁচাতে হবে। হয় মরব না হয় মারব।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী হত্যা একটি অন্যতম হৃদয়বিদারক ঘটনা। ১৯৭১ সালে যে সকল বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের দোসরদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন সে সকল ঘটনা হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী।

অনেকদিন থেকেই আমার লেখালেখির অভ্যাস। কিন্তু বই প্রকাশে ছিল প্রচুর অনীহা। কিন্তু এ বইটি লিখতে গিয়ে বুকের গভীরে একটা আলতো তাগিদ অনুভব করেছি। কাজ করতে গিয়ে নিজেও শিখেছি অনেক অজানা কথা, অনেক আবিষ্কার। কখনো ঢিমেতালে, কখনো দ্রুত করেছি। রাত জেগে কাজ করার অনুভবটা ভেতর থেকে এসেছে। যখনই সুযোগ পেয়েছি পাঠাগারে গিয়েছি। ক্যামেরা ব্যাগ নিয়ে ছুটে গেছি বগুড়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সাহায্য পেয়েছি অনেক। সময়ে-অসময়ে বিরক্ত করেছি অনেককেই। তারা আমার এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন। আমায় স্নেহের চোখে দেখেন বলেই হয়তো এমনটা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে যাদের কথা না বললেই নয় তারা হলেন, সাংবাদিক মাসুদ, জয়পুরহাটের আসাদ ভাই, রফিক ভাণ্ডারী, সাংবাদিক সমুদ্র হক, ঝনুভাই, সাংবাদিক রবিউল হাসান, যিনি অসুস্থ থেকেও আমায় অনেকটা সময় দিয়েছেন। তাইবুল হাসান খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনিও নানাভাবে আমায় উৎসাহ ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তার দিকনির্দেশনা আমার পাথেয়। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই শ্রদ্ধেয় তোফাজ্জল হোসেনকে যিনি আমাকে তার বাড়িতে ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিবরণ জানিয়েছেন। বীর বিক্রম হামিদুল হোসেন তারেক যিনি বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখছি বলে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এমন ব্যক্তিত্বের নানা উপদেশ ও দিকনির্দেশনা আমাকে ঋদ্ধ করেছে। শিহাব শাহরিয়ার, শরিফুল কবির, আর ডি. এর মিলন ভাই, লাইব্রেরিয়ান আনিসুল হক, জিলু ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমার পরিবারের কথা। আমার স্বামী হারুণ

অর রশীদ ও আমার দু' সন্তান মাশকুরা তোয়া হারুন জুঁই ও মাশকুরা জোরা হারুন ত্বিষার কথা। যারা আমাকে রাত জেগে, সময়ে-অসময়ে কাজ করতে কখনো বাঁধা দেয়নি, যারা আমাকে নানাভাবে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার মা-বাবা যাঁদের জন্য আজকের এই আমি, তাঁদের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করা হয়নি কখনোই। আমার বাবা মতিয়ার রহমান তালুকদার ও মা জাহান আরা রহমানকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এ কাজটি করতে উৎসাহ ও সহযোগিতা করার জন্য।

যে দুজন মানুষের নিরন্তর চাপে আর তাপে এই বইটি আলোর মুখ দেখছে সে দুজন ব্যক্তিত্ব আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি-সাংবাদিক-ইতিহাসবিদ ড. তপন বাগচী ও প্রথম আলোর বগুড়ার স্টাফ রিপোর্টার মিলন রহমান। তাঁদের এ অবদানের কথা ভুলবার মতো দুঃসাহস যেন আমার কখনো না হয়! তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না।

আমি গতিধারা প্রকাশনীর প্রকাশক অগ্রজপ্রতিম সিকদার আবুল বাশারকে ধন্যবাদ দিতে চাই। যার বদান্যতার কথা না বললেই নয়। তিনি যদি আগ্রহ না দেখাতেন আমাকে দিয়ে কাজটি করানোর জন্য তবে আজকে আমার লেখক হয়ে মুখবন্ধ লেখার স্পর্ধা হতো না।

আমি দ্ব্যর্থহীন চিত্তে বলতে চাই মানুষ মাত্রই ভুল হয়। এই আপ্তবাক্যটি আমার বেলায়ও প্রযোজ্য। আমার ভুলত্রুটিগুলো ও তথ্যের ঘাটতি পরবর্তীতে সংশোধনের পথে এগুবে, এমন প্রত্যাশা রইলো। এ ছাড়া অনেক তথ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে হয়তো, এক্ষেত্রে যাদের মতামতে সামঞ্জস্য পেয়েছি সে তথ্যগুলোই সংযোজিত করেছি। তারপরও কোনও রকম তথ্যবিভ্রাট থাকলে পরবর্তী সময়ে সংশোধন করা যাবে।

বইটির ফাইনাল প্রুফ দেখে দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক বজলুল করিম বাহার। তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমায় দিয়ে ঋণী করেছেন। এ প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সেলিনা শিউলী
বগুড়া

বগুড়া জেলা : ইতিহাসের আলোকে

উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বগুড়া। প্রাচীনকাল থেকে এর রয়েছে নানা ইতিহাস। ঐতিহ্যমণ্ডিত এ জেলা কৃষ্টি কালচার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে রেখেছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে বগুড়া উজ্জ্বল।

বগুড়ার ঐতিহ্যগত দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই তার আদিকথায় ফিরতে হয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ও বিজয়ের ইতিহাসকে দিয়ে শুরু করলে দেখা যায় বগুড়ার প্রাণকেন্দ্র ছিল প্রাচীন ও পুরাতন মহাস্থানের প্রাচীনত্ব। প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও দীর্ঘ জনপদ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্ররা একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছিল। পুণ্ড্রদের নামানুসারে নামকরণ করা হয় মহাস্থান গড়কে। ধারণা করা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পবিত্র পীঠ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এখানে এসে ধর্মসাধনা করতেন। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এই বগুড়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং লৌকিক উপাদান থেকে জানা যায়, বগুড়া প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের কামরূপ রাজ্যের পুণ্ড্রনগরীর অন্তর্ভূক্ত ছিল, যা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় জানা যায় ১২৮০ শতক পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাসুদেব নামক একজন শাসক এ অঞ্চলটি পরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে মূর্তি, পাথরে খোদিত মুদ্রা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজা শশাংক বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গৌড়দেশে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন। বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং এর বিবরণে শশাঙ্ককে গৌড়রাজ বলে উল্লেখ করা হয়। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৬৩৮ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি তার লেখনীতে পৌণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি সহ রাজ্যগুলোর বর্ণনা করেছেন। তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বছর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করে চীনে ফিরে যান। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই তিনি এ দেশে আসেন। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালবংশের সূচনা হয়। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল রাজা নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ১১৫০-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনভার গ্রহণ করে সেন বংশ। সেন বংশের লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে ১২০৪ সালে এ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। ১২০৬ সালে বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর তার সতেরজন সঙ্গী ১২৮১ সাল পর্যন্ত এ রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ঘটনার পরিক্রমায় দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মইজুদ্দিন তুগরিলকে পরাজিত ও নিহত করেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দীন বগরা খান (ওরফে বগরা খান) দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা দিয়ে সুলতান নাসির

উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ১৩৪২ সাল পর্যন্ত বগুড়াসহ লক্ষণাবতী ও দিল্লির সিংহাসন দখল করেছিলেন। ১৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী শাসন ক্ষমতায় ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৪৯১ সাল থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত শাসন করেন সামস্উদ্দিন মোজাফফর শাহ। আলাউদ্দিন শাহ ১৪৯৩- ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। এরপর যথাক্রমে নাসির শাহ ১৫১৯-১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ এবং মোহাম্মদ শাহ শাসনকার্য পরিচালনা করেন ১৫৩২-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। কালের ইতিহাসে এরপর সমাপ্ত হয় শাহ্দের শাসনকার্য। ১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান শেরশাহ এ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। এরপর বাংলায় মাহমুদ খান শূর বংশের সূচনা করেন। শূরদের শাসনের কিছুদিন পর কররানী বংশের শাসকরা বাংলা দখল করেন এবং শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে ১৫৭৬ সালে সূচনা হয় মোঘল শাসনের। ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধের পর এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে ব্রিটিশেরা।

পলাশীর যুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল। যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্থতা তাদের করে দিয়েছিল মূক ও বধির। ইংরেজদের দালাল, গোমস্তা আর খোদ ইংরেজরা সাধারণ নিরীহ মানুষদের ওপর নানা ধরণের অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। জনগণের ওপর নানা রকম প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু করে তারা। ইংরেজদের চতুরতার ফলশ্রুতিতে প্রশাসনিক কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ লাভ হয় জেলা গঠনের মধ্য দিয়ে। ইংরেজরা তাদের নীল চাষের সুবিধার্থে দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর কিছু অংশ নিয়ে ১৮২১ সালের ১৩ নভেম্বর বগুড়া জেলা প্রতিষ্ঠা করে। রাজশাহী জেলার আদমদিঘি, বগুড়ার শেরপুর ও নওখিলা, রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ দেওয়ানগঞ্জ এবং দিনজপুর থেকে লালবাজার, ক্ষেতলাল ও বদলগাছি থানার মিলিতকরণে এ জেলা গঠন করা হয়। ১৮৫৯ সালে বগুড়া পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তীতে এ সকল স্থানগুলো আলাদাভাবে পার্শ্ববর্তী থানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বগুড়া অন্যান্য থানা নিয়ে জেলায় বিকাশ লাভ করে। অবিভক্ত বাংলায় ভারত পাকিস্তান বিভক্তির ফলে এ অঞ্চল পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হয় এবং বগুড়া জেলা বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য জেলায় পরিণত হয়।

বগুড়া জেলার উত্তরে গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট দক্ষিণে নাটোর ও সিরাজগঞ্জ, পূর্বে জামালপুর ও পশ্চিমে নওগা অঞ্চল অবস্থিত। বগুড়া জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১০৩.৭৬ জন। উপজেলা রয়েছে বারটি। ইউনিয়ন ১০৮ টি। পৌরসভা ১১ টি। গ্রাম ২৭০ টি। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আগে জয়পুরহাট মহকুমা হিসেবে পরিচালিত হতো।

বগুড়া শহর ছিল সাতমাথা কেন্দ্রিক। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী। শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিতে বগুড়া ছিল আধুনিক। বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল শিল্পনগরী বগুড়ায়। শিক্ষাবিস্তার ও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বগুড়া জেলা ছিল উন্নত। প্রাচীনকালে দুর্গমপথ পাড়ি দিয়ে ছাত্ররা শিক্ষার জন্য চীন ও মঙ্গোলিয়া থেকে এখানে ভাসুবিহারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন। ২ হাজার ৪০০ বছর পূর্বে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো। সে সময় একমাত্র গ্রিসই ছিল শিক্ষা গ্রহণ করার স্থান। এ ছাড়া সমগ্র ইউরোপই ছিল অশিক্ষা আর বর্বরতার অন্ধকারে। জ্ঞানচর্চার কোনও পথই খোলা ছিল না ইউরোপিয়ানদের কাছে। চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাং তাঁর লেখায় পুন্ন-ফ-তনন বা পুন্ড্রবর্ধনের কথা খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ভাসুবিহার পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় ১ হাজার ২০০ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন ভাসুবিহার বা পোসিপো তে প্রায় ৭০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। ২০ টি জ্ঞানকেন্দ্র বা গর্ভগৃহ ছিল ভাসুবিহারের আশে পাশে। কথিত আছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি গৌতম বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। এবং এখানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। প্রায় তিন মাস তিনি মহাস্থানের পুণ্ড্রবর্ধনে অবস্থান করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

পুন্ড্রনগরে মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের পুত্র সম্রাট অশোক নির্মিত গৌতম বুদ্ধের শরীর ধাতুর ওপর প্রতিষ্ঠিত করে একটি মূর্তি স্থাপন করেন। মহাস্থানে হিউয়েন সাং গৌতম বুদ্ধের স্মারকস্তম্ভ পরিদর্শন করেছিলেন।

বগুড়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ছিল অনেক বেশি। ষাটের দশকে বগুড়াকে শিল্পনগরী বলা হতো। এখানে কটন মিল, চীনামাটির কারখানা, সিগারেট প্রস্তুতকরণ কারখানা ও ওষুধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় বগুড়ায় শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল প্রায় ১০৫ টির মতো। বগুড়ায় শিল্প আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন মজিবুর রহমান ভাণ্ডারী। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য বগুড়া বিশেষভাবে উন্নত। সারাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই উৎপন্ন হয় বগুড়ায়। বগুড়া রেশম শিল্পে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিল। শিল্প প্রসারে নৌ পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং করতোয়া নদীর ওপর গড়ে ওঠে বন্দর। পাটসহ নানা ধরনের পণ্য বেচা-কেনা হত এখানে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ব্যাংকিং এ বগুড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। নানা ধরণের বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও নানা জটিলতায় তাদের অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে যায়।

শিল্পনগরী খ্যাত বগুড়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতার ইতিহাসও ব্যতিক্রমধর্মী। সময়ের পরিক্রমায় এখানে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে স্ব মহিমায়।

অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনায় বগুড়া অন্যসব জেলা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বগুড়ার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী বগুড়া সফর করেন। নবাব আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও ছিলেন। ১৯২৭ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বগুড়ায় আসেন। তার বিখ্যাত উদ্দীপনামূলক কবিতা বিদ্রোহী ও কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতা

দুটি তখন তিনি আবৃত্তি করে শোনান। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ায় আসেন। প্রজাবন্ধু রাজীব উদ্দিন তরফদার ও আব্দুল আজিজ কবিরাজের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর বগুড়ায় নিখিলবঙ্গ আসাম পাট চাষি সম্মেলন হয়। মজলুম জননেতা জনদরদী মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৮ ও ১৯ মে বগুড়ায় কৃষক কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বগুড়াবাসীকে একাত্ম হতে উদ্বুদ্ধ করেন। ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়ায় আসেন এবং তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। ১৯৭১ সাল বাংলার ইতিহাসে গৌরবোজ্জল ইতিহাস। ৭নং সেকটরের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়াবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।

বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ : আক্রমণ, প্রতিরোধ, গণহত্য, বধ্যভূমি

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক হীরক সময়। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অহংকার এই একাত্তর। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে এ দেশ। এ অর্জন সরল পথে আসেনি। একটি পরিচয়, একটি অনন্য দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য এ জাতিকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, ত্রিশ লাখ শহীদ ও শত শত নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা।

স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন। শোষণ আর বঞ্চনার শিকার ছিল এদেশের অসহায় মানুষ। প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে এ জাতির মনে ভাঙ্গন তৈরি হয়। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮-র পর ১৯৬৯ এদেশের মানুষকে প্রতিবাদী করে গড়ে তোলে। ১৯৭০ সালে তার বিস্ফোরণ হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রম মুক্তির সংগ্রাম। এই ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙ্গালি জাতি নড়ে চড়ে বসেছিল।

২৫ মার্চ ভয়াল রাতে সারাদেশের মানুষ জেগে উঠেছিল আত্মপ্রত্যয়ে। অন্য অনেক জায়গার মত জেগে উঠেছিল বগুড়ার মানুষও। আবালবৃদ্ধবনিতা, যার যা ছিল তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মার্চ মাসের প্রতিরোধ সংগ্রামে বগুড়ার ছাত্রদের স্বত স্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিল সময়ের দাবী। ২৫ মার্চ রাতেই বগুড়ায় ছড়িয়ে পড়ে, পাকসেনারা বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। জনমনে আশংকা ভয় আর উত্তেজনা, কখন কি হয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যেবেলায় ছাত্রদের একটি মিছিল বের হলো। বগুড়া শহর প্রদক্ষিণ করল। লাল ঝাণ্ডাকে সামনে নিয়ে মিছিল হল শ্রমিকদের। বগুড়া শহরের পথঘাট, অলি-গলিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল ছাত্র আর শ্রমিকদের ঝাঁঝালো শ্লোগান। বগুড়াবাসীর একাংশ থেমে থাকলেও ছাত্ররা থেমে থাকেনি। তারা জানত দেশে উত্তাল হাওয়া বইছে। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যাটা যেন অন্যরকম অশুভ হাওয়া বইয়ে দিচ্ছিল। ঢাকায় কখন কি হচ্ছে সব খবর নিত বগুড়াবাসী। সেদিন খবর এসেছে শেখ মুজিবর আর ইয়াহিয়ার আলোচনা সফলতা আসেনি। ভেঙ্গে গেছে তাদের বৈঠক। ঘটনার গতিপথ চলছে অজানায়। সময় যেন অশনিসংকেত। তরুণরা এগিয়ে আছে অনেকটাই। কর্ অথবা মর্ এই আপ্ত্য বাক্য তাদের। ধমণীতে রক্ত ফুটছে টগবগ করে। এ উত্তেজনায় গোটা দেশে আন্দোলন যখন দানা বেঁধেছে সেই তখন থেকেই অর্থাৎ একাত্তরের মার্চ মাসেই সচেতন অনেক বাড়িতে বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা বানানো শুরু হয়। বয়স তাদের যতই হোকনা কেন উচ্ছ্বাস যেন এক বিন্দুতে এসে মিসেছে। গাঢ় সবুজ, আর লাল কাপড় কিনছে পতাকার জন্য। সবুজ ভূমি। রক্ত লাল তার দাবী। অনেক পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা

হয়েছে। লাল বৃত্তে দেশের মানচিত্র। কেউবা নতুন পতাকা উড়িয়েছে তাদের বাড়ির সামনে।

এভাবেই চলে উত্তেজনা আর নিজ দেশকে নিয়ে লড়ার উৎসাহ উদ্দীপনা। ৭ মার্চ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভাষণ দিলেন। সারাদেশে বেতারের মাধ্যমে ভাষণটি সম্প্রচার করা হবে, খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে বগুড়ায়। সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছিল বেতারে মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনবে। কিন্তু বিধিবাম। হঠাৎই ঢাকার বেতারকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল দুপুর ৩ টা ২০ মিনিটে। বগুড়ার সচেতন মানুষ বুঝতে পারলেন কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। পুরো শহর যেন ফুসছে। বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষ নেমে এল রাস্তায়। পুরো শহরে উদগীরণ হচ্ছে ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির মত। '৭১ এর ৮ মার্চ সকালে আবার বেতার সচল হল। প্রচারিত হল শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' শেখ মুজিবের ভাষণ আরও উজ্জীবিত করল বগুড়ার জনগণকে। এভাবেই আটপৌরে বগুড়াবাসীর জীবনে এল নতুন অধ্যায়। বাঁচতে হবে, বাঁচার জন্য লড়তে হবে। ২৫ মার্চ দিনের শেষে তাদের সর্তক করে দিল। নতুনভাবে প্রস্তুত সবাই। সতর্কতা আরও জোরদার হলো। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বগুড়ার দামাল তরুণরা পর্যায়ক্রমে শহরের প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায় পাহারা দিতে শুরু করে। অনাহুত কোনো লোক এলে জবাবদিহি করতে হতো। কোনো যানবাহন এদিকে এলে চেকিং হতো। কেউ বিপদে পড়লে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। কাউকে সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দিত। ২৫ মার্চ সারাদিন বগুড়া শহরে চলেছে ছোট ছোট অংশে মিছিল, মিটিং। সেদিন বগুড়া ছিল মিছিলের শহর। শ্লোগন ছিল তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা। পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা বাংলা। শহরে চলছিল নামা জল্পনা কল্পনা। চায়ের টেবিলে উপচে পড়া ভীড়। রেডিওর সামনে ঘিরে থাকে সব ভিড়। কখন ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবে শেখ মুজিবের হাতে। সন্ধ্যায় থমথম অবস্থা বিরাজ করছে বগুড়া শহরসহ আশে পাশের গ্রামগুলোতে। ২৫ মার্চ রাতে তরুণরা অন্যদিনের তুলনায় কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তুলছে। চারদিক থেকে খবর আসতে লাগল পাকসেনারা বগুড়ার দিকে আসছে। তরুণরা দৃঢ়। একতাবদ্ধ যুদ্ধ সামনে। বন্ধ করতে হবে বগুড়ায় ঢোকার সব পথ। রাত যত বাড়ে উত্তেজনা তত গভীর হয়ে ওঠে। রাত ১২ টার পর বগুড়া শহরে যেন জনতার ঢল নামে। নানা বয়সী মানুষ। যার যা আছে তা নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে। সবাই। দা কুড়াল, লাঠি সোটা, বললম সহ ব্যাক্তিগত তীরধনুক ও বন্দুক হল ব্যক্তিগত তাদের অস্ত্র। অতিদ্রুত শহরের প্রতিটি সড়কেই ব্যারিকেড দেয়া হল। গাছ কেটে পথে ফেলে রাখা হল যেন প্রবেশপথে সহজে কোনো যান ঢুকতে না পারে। ইটের ভাটাগুলো ইট শুন্য হয়ে গেল মুহূর্তে। তরুণরা ইট দিয়েও ব্যারিকেড করেছে। শহরস্থ রেললাইনের উপর দিয়ে যেন এলোপাতাড়ি ভাবে সেনাদের গাড়ির বহর রাস্তা পার হতে না পারে। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে মাটিডালি, বাঘোপাড়া এলাকায় বগুড়া, রংপুর,

সড়কে প্রতি ১৫/২০ মিটার পরপর গাছ, ইট দিয়ে এমনভাবে ব্যারিকেড দেয়া হলো যেন পাক সেনাদের কনভয় পার হতে না পারে। সারারাত চলল প্রস্তুতি। ভোর হবার আগেই বগুড়ার যোদ্ধারা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত। রাত বাড়তে থাকে। চারদিক থেকে খবর আসে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা গুরুতর হতে থাকে। চারদকি থেকে খবর আসে যার যা আছে তাদিয়ে যুদ্ধ করবে সবাই পাক সেনাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এরই মধ্যে ভাষাসৈনিক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গাজীউল হক এবং সে সময়ের গাবতলীর সংসদ সদস্য মোস্তাফিজর রহমান পটল (১৯৭৫ সালে নিহত) এর অস্থির ছোটাছুটি শুরু হল। বগুড়া পুলিশ লাইনে খবর দিলেন তারা, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পুলিশ সদস্যকে হত্যা করছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। একথা শুনে বগুড়া পুলিশ লাইনের রিজার্ভ অফিসার পুলিশের সকল সদস্যকে অস্ত্র হাতে দিয়ে যুদ্ধের জন্য পুরো প্রস্তুতি নিতে বললেন। নির্দেশ দিলেন পাকসেনাদের গুলি এলে পাল্টাগুলি ছুড়ে পিছু হাটিয়ে দিতে হবে হানাদারদের।

এদিকে বগুড়া সদর থানার তৎকালীন দারোগা নিজাম উদ্দিন এবং নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় কিছু পুলিশ এবং ছাত্র-জনতা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাক সেনাদের প্রতিহত করার জন্য অবস্থান নেয়।

২৬ মার্চ '৭১ সুর্যোদয় হল। শুরু হল একটি নতুন দিনের। শহরের সব পথ বন্দ। শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার জটলা। উত্তেজনা বিরাজমান। কখন কি ঘটবে। শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মাঝিড়া সেনানিবাসে (নতুন বিরাজমান) স্বল্প সংখ্যক হানাদার বাহিনী এসে যোগ দেবে। এমন পরিস্থিতিতে বগুড়ার ছাত্র শিক্ষক, পেশাজীবী, কৃষক, গৃহস্থ চিকিৎসক তরুণ তরুণী সহ নানা বয়সের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে প্রথমে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে পাকসেনাদের সকল পথ বন্ধ বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিল। মাঝিড়ার পথে রওনা হল কিছু উদ্যোগী তরুন। ২৫ মার্চ রাত থেকে দুরন্ত পথিকদের নানা দিকনির্দেশনা দেন বগুড়ার তৎকালীন সংসদ সদস্য আওয়ামীলীগের প্রবীণ নেতা মাহমুদুল হাসান খান (মরহুম)।

২৬ মার্চ সকালের দিকে রংপুর থেকে পাকিস্তানী আর্মিরা বগুড়া শহর অভিমুখে রওনা হয়ে বাঘোপাড়া এলাকা পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। রাস্তার ওপর গাছ পড়ে আছে। পাকসেনাদের গাড়িগুলো সেখানে দাড়ালো সারিবদ্ধভাবে। জিপ ট্রাক মিলে এক বড় গাড়ি বহর। পাকসেনারা অনেক কসরত করে ঘন্টাখানেক অমানষিক পরিশ্রম করে বড় বড় আমগাছগুলো সরিয়ে রাস্তার একপাশ দিয়ে ব্যারিকেড অতিক্রম করে বগুড়া শহর অভিমুখে এগিয়ে যেতে লাগল। বাঘোপাড়া থেকে শহরে আসার পথে পাকসেনাদের প্রতিহত করতে শতাধিক পয়েন্টে বন্দুক, বল্লম, লাঠিসোটা, দা-কুড়াল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে সর্বস্তরের মানুষ। সকাল সাতটা। ঠেঙ্গামারা গ্রামের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে পাক হানাদার বাহিনী। ঠেঙ্গামারা গ্রামের মৃত ভোলা শেখের পুত্র রিকশাচালক তোতা মিঞা ও তার সঙ্গীরা বাঘোপাড়া নওদাপাড়া এলাকায় (বগুড়া-রংপুর সড়ক) গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে দেয়ার কাজ করছিল। গাছের ডাল বনের বাঁশ কেটে জড়ো

করছিল। এমন সময় হানাদার বাহিনীর কনভয়গুলো ঠেঙ্গামারা রাস্তায় এসে পড়ে। তোতার সঙ্গীরা পালিয়ে যায় কিন্তু অসীম সাহসী তোতা তীব্র ক্ষোভে কুড়াল উঁচিয়ে এগিয়ে যায় পাকহানাদার বাহিনীর দিকে। পাকসেনারা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। বগুড়ায় প্রথম দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রথম শহীদ হন তোতা মিঞা। তোতা মিঞা রাস্তায় পড়ে গেলে নিষ্ঠুর হানাদারেরা তার লাশের ওপর দিয়ে তাদের গাড়ি চালায়। এরপর বাঘোপাড়া নওদাপাড়া এলাকা থেকেই পাকিস্তানী সেনারা গুলি চালাতে চালাতে বগুড়া শহর অভিমুখে এগিয়ে আসতে থাকে। পাকসেনাদের একটি অগ্রগামী দল পায়ে হেটেই এগিয়ে আসে। বাঘোপাড়া, মাটিডালী, ফুলবাড়ি, কালিতলা, ঝাউতলা এলাকা হয়ে শহরের ২ নম্বর রেলগেট, থানা মোড় থেকে সাতমাথা পর্যন্ত পুরো এলাকা সর্বস্তরের মানুষে পরিপূর্ণ। পাকসেনারা মাটিডালি, বৃন্দাবনপাড়া এবং ফুলবাড়ী গ্রামের কিছু বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। শহরে ঢোকার পর তারা রাস্তার মাঝখান বাদ দিয়ে রাস্তার দু'দিকে লাইনে করে এগুতে লাগল। পাক হানাদারেরা ফুলবাড়ির সুবিল পুলের ওপর এলেই আড়ালে অবস্থান নেয়া ছাত্র-জনতার রোষের মুখে পড়ে। এতে হানাদারেরা কিছুটা বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু তা কাটিয়ে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে শহরময় আতংকের সৃষ্টি করে এগিয়ে যেতে থাকে। ছুনু ও হিটলুকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের দু জনকে মাটিডালি নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

পাকসেনারা যখন বগুড়া শহরের ২নং রেল ঘুমটির কাছে আসে তখনই আজাদ রেস্ট হাউসের ছাদে আগেই থেকেই অবস্থান নেয়া দারোগা নিজাম উদ্দিন, দারোগা নুরুল ইসলাম এবং তাদের সহযোগীদের ৩০৩ রাইফেল গর্জে ওঠে। সামনে পিছনে এগিয়ে যাওয়া পাকসেনারা হকচকিয়ে যায়। এমন সময় বড়গোলার মোড়ে ইউনাইটেড ব্যাংকের বন্দুক নিয়ে অবস্থান করা তিনজনের তিনটি বন্দুক গর্জে ওঠে। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে টিটু নামের একজন দশম শ্রেণীর ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ইউনাইটেড ব্যাংকের ছাদে দাঁড়িয়ে শত্রু সেনাদের গতিরোধের চেষ্টা করছিলেন তারা কয়েকজন। দু'জন পাকসেনা জখম হয় গুরুতর। পাকসেনারা দ্রুত ব্যাংক ভবনটি ঘিরে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধে নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষ এগিয়ে আসে। সাধারণ মানুষের একাংশ জয়পুর হাটের পাঁচবিবি এলাকা থেকে আদিবাসী সাঁওতালরা তীর ধনুক নিয়ে দেশ রক্ষায় বেড়িয়ে পড়ে। বগুড়ার ফুলবাড়ি এলাকায় এসে এলোপাতাড়ি তীর ছুড়তে থাকে পাকসেনাদের লক্ষ্য করে। পাকসেনারা সাতমাথার তাসানী গম্বুজ ও পশু হাসপাতাল মর্টার শেলের আঘাতে উড়িয়ে দেয়। এতে বেশকিছু লোক হতাহত হয়। এর কিছুদূরে হাবীব ম্যাচ ফ্যাকটরির মধ্যে অবস্থান নেয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার রহমান আলীর নেতৃত্বে ছাত্ররা পাক হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালালে দুজন শত্রুসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা শহরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আজাদ বম্বে সাইকেল স্টোরের ছাদে তার রাইফেলটি নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করছিল। তার গুলিতে একজন পাকসেনা নিহত হয়। হঠাৎ একজন পাকসেনার গুলি আজাদের মাথায় বিদ্ধ হয়। আজাদের খুলি উড়ে যায়। আজাদ শহীদ হন।

বগুড়ার সশস্ত্র জনতা তোপের মুখে লড়াই চালায়। একসময় পিছু হটে তারা। আশ্রয় নেয় সুবিলের উত্তর পারে পূর্ব বিভাগের ডাকবাংলা এবং মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজে। রাতভর তারা গুলি চালায়। মূহুমূর্হ গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয় বগুড়াসহ তার চারপাশ। থেমে নেই বাঙ্গালি। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ লাইনের পুলিশ বাহিনী ও থানার পুলিশরা। পাকসেনারা বিভিন্ন স্থানে আরও অজানা প্রায় অর্ধশত মানুষকে হত্যা করে। একসময় বগুড়া বাসীর প্রতিরোধের মুখে পাকহানাদারেরা পালিয়ে যায়।

এদিকে ২৬ মার্চের বিকেলে বগুড়ার উত্তাল জনতা বগুড়ায়। জীবন মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যায়। একপাতার একটি বুলেটি তৈরি করে তারা। সন্ধ্যায় তা বিলি করা হয় শহরে। হেডলাইন ছিল "প্রথম দিনের যুদ্ধে বগুড়াবাসীদের জয়লাভ। পাঁচজন পাকসেনা নিহত।" এই বুলেটিনটি তৈরি করেন ভাষা সৈনিক ও রাজনীতিবিদ গাজীউল হক। এই বুলেটিনে আরও একটি সংবাদ ছিল, আর তা হল এক সর্বাত্মক যুদ্ধের আহ্বান। সবশেষে বুলেটিনটির পাতায় ছিল শেষ পাতে দৈ দেবার মত খবর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ। যে নির্দেশটি ছিল এরকম- 'এটি আমার শেষ নির্দেশ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। শত্রু সৈন্য আমাদের আক্রমণ করেছে। বাংলার মানুষ তোমরা যে যেখানে আছ, যার হাতে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও। হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চুড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। 'এ বুলেটিন প্রচার হয়ে ছিল ২৬ মার্চ '৭১ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রতিদিন এ বুলেটিন প্রচার হত দশদিনের যুদ্ধের খবরাখবর দিয়ে।

বগুড়ায় ২৬ মার্চ প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্থানীয় প্রধান জনাব লুৎফর রহমান শহরে সাইরেন বাজান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে দামাল ছেলেদের ২০০ লোহার শিরস্ত্রাণ বিতরণ করেন তরুণদের সাহসী পদক্ষেপ নেবার জন্য।

হানাদার পাকসেনারা মাটিডালির মহিলা কলেজ ও আমবাগানে যখন তাদের ঘাঁটি করেছিল তখন তারা শহরে নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। রাজাকারদের সহায়তায় পাকসেনারা আওয়ামী লীগের মাফুজার রহমান বাবুর বাসায় আক্রমণ চালায়। ওখানে বাড়ির বাসিন্দাদের না পেয়ে অতিথি তার ভাতিজা ডাবলুকে বেয়নেটের খোঁচায় হত্যা করে এবং তার বৃদ্ধ দাদা ডা. ছহির উদ্দিকে বন্দুক দিয়ে আঘাত করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ২৭ মার্চর বগুড়ায় কলেজ রোডের পাশে ছিল সাবেক মুসলিম লীগের মন্ত্রী জনাব ফজলুল বারী। রাজাকারদের তথ্যমতে ওখানে হানা দেয় পাকসেনারা। পাকসেনারা ফজলুল বারী বাড়ি এবং জুবিলি স্কুলের শিক্ষক আব্দুল হামিদকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।

২৭ মার্চ বগুড়া শহরসহ চারপাশে থমথমে অবস্থা। বিকেলে হানাদারেরা রকেট লাঞ্চার ও মর্টার শেল চালানো শুরু করে। শুরু হয় উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি গুলাগুলি দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করার যোগাড়যন্ত্র। মুক্তিযোদ্ধা সংগঠিত হচ্ছে। দল গঠন হচ্ছে। অসীম সাহসী কয়েকজন তরুণ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ শুনে তাদের জীবন উৎসর্গে বদ্ধপরিকর

হয়ে ওঠে। ২৬ মার্চ গাজীউল হকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি হাই কমান্ড দল গঠন করে। ২৭ মার্চ সকালে সুবিলের উত্তর পাড়ে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের গুলির জবাব দেয় কয়েজন তরুণ। এদিনে ঝন্টু, মাহমুদ, মাসুদ, গোলাম রসুল, গুলাব, লাল সুফিয়ান সহ অনেকে যুদ্ধে অংশ নেয়। ডা. জাহিদুর রহমান পুলিশবাহিনীর ৬০ জনকে নিয়ে আসে। পুলিশদল ও তরুণেরা একসঙ্গে ৩০৩ রাইফেল নিয়ে পশাপাশি অবস্থানে যুদ্ধ করে। হানাদার বাহিনী বগুড়া শহরের উত্তর দিকে এগিয়ে এসে কটন মিল বেদখল করে। এটি বগুড়া শহরের উত্তর সীমার প্রান্তে ছিল। পুলিশ বাহিনী ও তরুণ ছাত্রদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে শহরের ভিতরে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না হানাদারেরা। পাকিস্তানি হানাদারেরা মার্চের যুদ্ধে ব্যবহার করে ভারী মেশিনগান। মর্টারের গোলা বর্ষণও করে। দিনভর চলে যুদ্ধ গুলি পাল্টা গুলি। ২৭ মার্চ বিকেল ৩টায় মর্টার শেলের আঘাতে শহীদ হয় দশম শ্রেণীর ছাত্র তারেক। ২৭ মার্চ রাতে শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল আগের মতই। এদিন কয়েকজন মুক্তিসেনা ও রাজনীতিবিদ শহরের বাদুড়তলায় একটি খাদ্য ক্যাম্প বসায়। পাশাপাশি একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রও খোলা হয়। খাদ্য ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালিন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আমজাদ হোসেন। সহকারী হিসেবে মোশারফ হোসেন মন্ডল, আবু মিয়া, মজিবর রহমান সহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এদের কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করাও খাদ্য সরবরাহ করা। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র বা এর সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডা. কসির উদ্দিন তালুকদার। তার বাদুড়তলাস্থ হোয়াইট হাউস নামক বাড়িটিতে। তিনি বগুড়া শাখা ডাক্তার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হত। ২৭ মার্চ ১৯৭১ রাতে জানা গেলে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেছেন।

২৮ মার্চ কটন মিলের গেস্ট হাউসের ছাদে পাকসেনারা মেশিনগান বসিয়েছে। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। তপন নামের একটি ছেলে। দুজন পাকসেনা দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গর্জে উঠল তপনের রাইফেল। অব্যর্থ লক্ষ্য। ছাদের উপর থেকে পাক সেনাটি ছিটকে পড়ল মাটিতে। শুরু হলো গোলাবৃষ্টি। প্রায় শ'খানেক মুক্তিসেনা বগুড়া শহরে যুদ্ধ করল। প্রচন্ড প্রতিরোধ স্বত্ত্বেও ভারী মেশিনগানের গুলি ও মর্টার শেলের গোলার আড়ালে পাকসেনারা ক্রল করে শহরে ঢুকতে শুরু করল। তখন বেলা সাড়ে তিনটা। হতাশ হয়ে পড়ে মুক্তিসেনারা। যেভাবেই হোক রুখতে হবে অপশক্তিকে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুক্তিসেনাদের। যুদ্ধ চলতেই আলীর নেতৃত্বে ৩৯ জন ই. পি. আর.-এর একটি দল নওগাঁ থেকে বগুড়ায় পৌছে। অস্ত্র বলতে তাদের দৃঢ়তা আর রাইফেল, কয়েকটি গ্রেনেড ও তিনটি এল. এম. জি। তারা স্থানীয় পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সহায়তায় একটি অপারেশন পরিচালনা করে ২৩ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি E. P. R পুলিশ ও ছাত্র জনতার পূর্ববর্তী অভিযানের সাফল্য বগুড়াসহ তার চারপাশের মানুষদের জাগ্রত করে ও মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

২৯ মার্চ। সকালে কটন মিলের গেস্টহাউস ফাঁকা দেখা যায়। রাতের অন্ধকারে হানাদার পাকসেনারা এই ঘাঁটি ছেড়ে সুবিলে ফিরে গেছে। সকাল ৯ টায় সুবেদার আকবর আলী ও মাসুদ চারপাশটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়ে আসে। কয়েকজন E. P. R সদস্য একটি L.M.G কটন মিলের ছাদের ওপর বসালেন। বেলা আনুমানিক ১২ টায় হানাদার পাকসেনারা বৃন্দাবন পাড়া প্রাইমারি স্কুলের ঘাটি থেকে আক্রমণ শুরু করে। মর্টারের শেল আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। সারাদিন চলে সন্ধ্যার দিকে যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। এদিকে যুদ্ধের খবরাখবর প্রতিদিন বুলেটিন আকারে বের করে একরামুল হক স্বপন, চন্দন, কেরামত আলী ও ধরু নামের কয়েকজন দেশপ্রেমিক। বগুড়াবাসী নিশ্চিত হয়, আতঙ্কিত হয় পাশাপাশি। হানাদার পাকসেনারা বৃন্দাবনপাড়ায় হামলা চালায়। সেখান থেকে তারা চাল, ডাল, হাঁস মুরগী, খাসী, গরু লুটপাট করে। লুটপাট শেষে বাড়ি. ঘরে আগুন দিয়ে আদিম উল্লাসে মত্ত হয়। নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

৩০ মার্চ ১৯৭১ বগুড়ায় যুদ্ধ চলতে থাকে আগের মতই। হানাদার পাকসেনারা চারদিকে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। কটন মিলের রেস্ট হাউজ থেকে পাক হানাদারেরা বোমা, মর্টার, শেল ও রকেট ল্যান্সার ছুড়ে বগুড়া শহরের নানান জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটায় ও জনমনে আতংক সৃষ্টি করে। এতে কিছু নিরীহ মানুষ মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশল আর অস্ত্রের দাপটে ফিকে হতে থাকে হানাদারদের রণ কৌশল। বগুড়ায় মুক্তিসেনাদের অসীম সাহসিকতায় প্রায় ৪০ জন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

৩১ মার্চ। হানাদার পাকসেনারা নীরব। বগুড়ার মুক্তিকামী সেনারাও চুপচাপ। মুক্তিসেনারা গাজীউল হকের নেতৃত্বে রয়েছে। তারা খবর পেল ক্যাপ্টেন আনোয়ার এবং ক্যাপ্টেন আশরাফের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে। তারা ঘোড়াঘাটে অবস্থান করছে। আবার জেগে ওঠে বগুড়ার দামালরা। সুবেদার আকবর আলীর নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজে অবস্থানরত হানাদার পাকবাহিনীর ঘাটিতে গ্রেনেড চার্চ করে। পেট্রোলভর্তি ড্রামে ধরিয়ে দেয়া হয় আগুন। প্রজ্জ্বলিত পেট্রোলের ড্রামটি গড়িয়ে দেয়া হয় পাক সেনাদের ঘাটিতে। দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে লক্ষ্যবিহীন গুলি ছুঁড়তে থাকে পাক সেনারা। রাতের অন্ধকারে ঘাঁটি থেকে আসা গুলির শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দেয়। অন্ধকারে শোনা যায় মোটর, কনভয়ের শব্দ। রাত শেষ হয়। মহিলা কলেজে অবস্থারত হানাদার পাকসেনারা ভীতসন্তস্ত্র হয়ে বগুড়া ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যেই রংপুরের দিকে চলে যায়। বগুড়া মুক্ত হয়। ২৮ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত বগুড়া শত্রুমুক্ত থাকে।

পাকসেনারা যখন রংপুরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন কাটাখালি ব্রিজ পার হবার সময় স্থানীয় ছাত্ররা হানাদার পাকবাহিনীর ওপর চড়াও হবার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের মিশন ছিল পুলটাকে ভেঙ্গে ফেলা। কিন্তু সময়াভাবে ছাত্ররা সে কাজটি শেষ করতে পারেনি। যদি করত তবে আজকে তার ইতিহাস অন্যরকম হত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসে ২০ হাজার করে ৬০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এছাড়া নিয়মিত বাহিনীর জন্যও আলাদা ৩টি ব্যাটালিয়ন খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী যুদ্ধ দেশ মাতৃকার জন্য পরিচালিত হয়। একমাত্র এ দেশের মুক্তিযুদ্ধেই সামরিক অফিসার ও সৈন্যরা সাধারণ এবং রাজনীতি সচেতন ছাত্র-যুবকদের কাধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। দলীয় ও নির্দলীয় মুক্তিবাহিনীর ইউনিটসমূহ দেশের অভ্যন্তরে আরো হাজার হাজার ছাত্র-যুবককে ট্রেনিং দিয়ে তাদের দলসমূহে যুক্ত করে নেয়। ফলে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও দেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধোদের সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ। ভিন্নসূত্রে জানা যায় বগুড়াসহ সারা দেশে প্রায় দুই আড়াই লক্ষ স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-যুবকরা সীমান্ত পার হয়ে মুক্তি বাহিনীতে লড়াইয়ের জন্য ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক পরিবার থেকে আসা সাধারণ জনতাই ছিল বেশি।

১ এপ্রিল। বগুড়াবাসী অনেকটাই স্বতঃস্ফুর্ত। কারণ সকালেই শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল হানাদার পাক সেনারা পালিয়েছে। আনন্দের ঢেউ শহরের অলিতে-গলিতে, আনাচে কানাচে। এপ্রিলের প্রথম দিকে পাকিস্তানি ২টি স্যাবারজেট বগুড়া শহরে বোমা নিক্ষেপ করে। এতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে বগুড়াবাসী। কিন্তু বগুড়ার পুলিশ বাহিনী ও মুক্তিসেনারা স্যাবারজেটের ওপর গুলি করে দেশের মাটিতে দাড়িয়েই। ২ টি স্যাবারজেট সমতে পাকসেনারা পালিয়ে যায় বগুড়ার আকাশ থেকে। ১ এপ্রিল বগুড়া শহরে শোনা গেল মাঝিড়া (আড়িয়া বাজার) ক্যান্টনমেন্টে বেশকিছু বাঙ্গালী সেনাকে বন্দি করে নির্যাতন করছে। নায়েক সুবেদার আকবর আলীর নেতৃত্বে ৩৯ জন E. P. R, ৫০ জন পুলিশ বাহিনীর লোক এবং ২০ জন মুক্তিসেনা, বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আড়িয়া বাজার ক্যান্টমেন্ট উত্তর- পূর্ব এবং পশ্চিম এই তিনদিক ঘেরাও করে আক্রমণ করে। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গোলাগুলি। প্রায় আড়াই ঘন্টা যুদ্ধ চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকসেনাদের। এরই মধ্যে আকাশ পথে জঙ্গি বিমানও আসে এবং বোমা আক্রমণ চালায়। এত কিছুর পরেও সেখান থেকে পিছু হটেনি মুক্তিগামী জনতা। সবকিছু উপেক্ষা করে আশেপাশের গ্রামের হাজ্যর হাজার উত্তাল জনতা টিনের ক্যানেস্তারা পেটাতে শুরু করে। ক্যান্টনমেন্টের পাকসেনাদের জব্দ করার জন্য বগুড়ার মুক্তি সেনারা কিছু কৌশল অবলম্বন করে। গ্রামের লোকদের অনুরোধে জানায় দক্ষিণ দিক থেকে মরিচের গুড়া ছিটানো সম্ভব কি না। জনতা নিমেষেই বুঝে যায় তাদের কি করণীয়। তারা মরিচের গুড়া ছিটিয়ে দেয়। সেদিন ছিল দক্ষিণে জোর হাওয়া। মুক্তিসেনাদের অনুকূলে ছিল সে বাতাস। হানাদার পাকসেনারা কিছুক্ষণের জন্য কাবু হয়ে পড়ে। বেলা আড়াইটা নাগাদ আড়িয়া ক্যান্টনমেন্টে একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন সহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এদের মধ্যে পাঞ্জাবী সৈন্য ছিল ২১ জন্য। মুক্তি সেনাদের তীব্র আক্রমণের মুখে ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। আড়িয়া বাজার মুক্তিবাহিনীর হাতে চলে আসে। জয় হয় বগুড়ার মুক্তিসেনাদের। সাদা পতাকা গুড়ানো হয় আড়িয়া বাজার ক্যান্টনমেন্টে। যদিও এ যুদ্ধে

বহুলোক হতাহত হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শহীদ মাসুদ আহমেদ। যুদ্ধ জয় করে যখন সবাই উল্লসিত সে সময় আনন্দের আতিশয্যে রাইফেল হাতে লাফিয়ে উঠলো এই অসীম সাহসী যোদ্ধা মাসুদ। শত্রুর নিক্ষিপ্ত শেষ বুলেটটি ছুটে যায় তার দিকে। মাসুদের আত্মার শান্তিতে তাকে সম্মান জানাতে সেদিনের বীরযোদ্ধারা তার নামে ঘোষণা করে আড়িয়া বাজার (মাঝিড়া) নাম হবে মাসুদ নগর। যুদ্ধ শেষে বিপুল গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রহ করে। এভাবে ১ এপ্রিল বগুড়া সদর অঞ্চল সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

মুক্তিকামী মুক্তিসেনারাই নয় সাধারণ জনতাও হানাদার পাকসেনাদের হাতের কাছে পেতে চায়, প্রতিশোধপরায়ন হয়ে ওঠে তারাও। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আড়িয়া বাজারের আত্মসমর্পণ করা পাক সৈন্যরা জনতার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। উন্মুক্ত জনতা জেলখানার তালা ভেঙ্গে ওদের বের করে নিয়ে কুড়াল ও বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

এদিকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও যুদ্ধের জন্য পরবর্তী কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয় খোলা হয় স্থানীয় জিন্নাহ হলে। বগুড়ার সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাহমুদুল হাসান খান, এবং এ. কে মজিবুর রহমান, এ পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন ভাষাসৈনিক ও রাজনীতিবিদ গাজীউল হক, ডা. জাহেদুর রহমান, মকলেছুর রহমান, আব্দুল লতিফ প্রমুখ। হানাদার পাকসেনাদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনা ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে স্থান বাছাই করা হয় করোনেশন স্কুল, মালতিনগর, সেউজগাড়ী, গাবতলী, সেন্ট্রাল স্কুল, বোবা স্কুল, ভেলুর পাড়া, সুখানপুকুর, তালোড়া, শিবগঞ্জ, সোনাতলা, সান্তাহার, সারিয়াকান্দি ও হাট শেরপুর। এটা ছিল ২ এপ্রিলের কথা। পাকবাহিনীর পরবর্তী সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট, E. P R. পুলিশ ও ছাত্র-জনতা সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল বগুড়া থেকে নগরবাড়ী পর্যন্ত এবং অন্যদলটি রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার কাটাখালি ব্রিজ পর্যন্ত অবস্থান নেয়। ৪ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা কাটাখালি ব্রিজের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে। সফল হয় না সময়ভাবে। পাক হানাদারেরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়। চলতে আরম্ভ করে রংপুরের দিকে। কিন্তু কাটাখালি ব্রিজ পার হবার পর কিছুদূরে গোবিন্দগঞ্জ নামক স্থানে ছাত্র-জনতার আক্রমণের মুখে পড়ে। যার যা ছিল তা নিয়ে অর্থাৎ লাঠিসোটা, বর্শা, বললম ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। পাকসেনাদের মেশিনগানের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র নিয়ে সাহসী বীরযোদ্ধারা দাঁড়াতে পেরেছিল শুধুমাত্র তাদের অদম্য দুঃসাহসের কারণেই।

৪ এপ্রিল '৭১ হানাদার পাকসেনাদের যাবার পথ গোবিন্দগঞ্জে কাটাখালি ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলার বীর সেনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তরিকুল আলম, খাজা ছামিয়ান, বেঙ্গল রেজিমেন্টের রহমান আলী মাইন ও ডিনামাইট নিয়ে উপস্থিত হন। ব্রিজটি ধ্বংসের প্রস্তুতি কিছুটা নিলে জনসাধারণের বাধার মুখে আংশিক ক্ষতি করে ফিরে আসে তারা বগুড়ায়।

৯ এপ্রিল পাকসেনারা ঢাকা থেকে যমুনা নদী পার হয়ে উত্তরবঙ্গের দিকে আসছে এমন খবর প্রচার হলে মুক্তিবাহিনীর একটি দল সুবেদার মতিউর রহমানের নেতৃত্বে নগরবাড়ি অভিমুখে রওনা হয়। পাবনার বেড়া নামক স্থানে হানাদার পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কয়েকজন E. P. R সদস্য শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধারা এই যুদ্ধে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে বগুড়ায় ফিরে আসে। ১১ এপ্রিল মতান্তরে ১৪ এপ্রিল রাতে সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি দল নগরবাড়ি প্রতিরক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পাইকার হাটে পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য অতর্কিত হামলা চালায় মুক্তিসেনারা। এতে ২৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২০ জন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হন এসময়। পরদিন অপর একটি দল নগরবাড়ি সড়কে গেরিলা যুদ্ধে পাকসেনাদের মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর হয়। এখানে পাকসেনাদের সতর্ক থাকার দরুন মুক্তিসেনারা হালকা যুদ্ধ শেষে ১৬ এপ্রিল বগুড়া অভিমুখে রওনা হয়। অন্যদিকে পাক সেনাবাহিনীর দ্বিতীয়বার অগ্রসর হবার খবর পাওয়া যায়। ১৫ এপ্রিল বগুড়াসহ আশেপাশের মুক্তিসেনারা রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার কাটাখালি ব্রিজটি গোলার আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয় এবং পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে।

১১ এপ্রিল ২ ট্রাক ভর্তি E. P. R ও পুলিশ বাহিনী নগরবাড়ি অভিমুখে আবার যাত্রা করে। পাবনার বেড়া থানার কাছে হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সম্মুখযুদ্ধ হয়। এতে ২৮ জন পাকসেনা এবং ২০ জন E. P. R নিহত হয়। ১২ এপ্রিল আতাউর রহমান, আব্দুল জলিল, মুকুল, তোজাম্মেল হোসেন, রাজু, ফজলুর রহমান, আবু নাইম, বুলবুল, বিমান, দুলু নগরবাড়িতে পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যান। ফিরে আসেন ১৬ এপ্রিল।

বগুড়ার যুদ্ধে সাধারণ জনতা-আবালবৃদ্ধবণিতা জীবনকে বাঁচাতে ছুটে চলেছেন নানা জায়গায়। ভয় আর বিভীষিকার আতঙ্ক তাদের তাড়িয়ে নিয়েছে। এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনও অংশেই কোনো দেশের চেয়ে কম নয়।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কিছু মুক্তিসেনা বগুড়া শহরে অবস্থিত স্টেট ব্যাংক লুট করে। প্রায় ২ ট্রাক টাকা বোঝাই ছিল। তাদের ওপর হাই কমান্ডের নির্দেশ ছিল এ টাকা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যয় হবে। কিন্তু তা হয়নি। ব্যাংক লুটের টাকা নিয়ে তারা কাহালুর আদমদীঘী হয়ে ভারতে চলে যায়। টাকার একটা অংশ মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে ব্যাংকে জমা দেয়।

[**তথ্যসূত্র** দুই শতাব্দীর বুকে– এ. জে. এম সামছুদ্দীন তরফদার এবং রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা– এ. কে মুজিবুর রহমান]

১৮ এপ্রিল বগুড়া শহরে অরাজকতা দেখা দেয়। ছাত্র জনতার একটি অংশ বগুড়ায় অবস্থিত স্টেট ব্যাংক লুট করে বিপুল পরিমান টাকা মুক্তিযুদ্ধে খরচ করার উদ্দেশ্য নিয়ে শহর ত্যাগ করে। এর মধ্যে স্বপন, তপন, ডিউক, বাটুল ও মিঠুসহ অনেকেই জড়িত

ছিলেন। এই স্টেট ব্যাংক লুটের বিষয়টি নানা মিশ্র আলোচনার জন্ম দেয়। যুদ্ধরত অনেকেই বিষয়টি মেনে নিতে পাবেন না। শহরময় উত্তেজনা ও চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ২৩ এপ্রিল পাকহানাদার বাহিনী শহরের দক্ষিন দিক থেকে আবার আক্রমণ চালায়। এবার হানাদাররা ব্যবহার করে ট্যাঙ্ক বহর। আকাশ পথে বিমান। বগুড়ার স্থানীয় বিহারীদের সহায়তায় পাকসেনারা ত্রাস সৃষ্টি করে। লুটপাট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ শুরু হয় নানা স্থানে। পাকসেনাদের গণ্ডগ্রামের, দালালদের সহযোগিতায় শহরের চকলোকমান, চকফরিদ, ঠনঠনিয়া, মালতিনগর, গণ্ডগ্রাম, মালগ্রাম সহ অনেক জায়গায় হত্যা ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চালায় গ্রামের পর গ্রাম। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় 'শ দেড়েক স্থানীয় নিরীহ সাধারণ মানুষ এদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পাকসেনাদের অত্যাচার ক্রমেই বাড়তে থাকে। চলে গণহত্যা। পুরো বগুড়া তখন লাশের শহর। বগুড়া শহরের প্রতিটি বাড়িতে হানা দিয়ে পাকসেনারা ও বিহারীরা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসের বিভীয়িকায় পরিণত করে বগুড়া শহর। ২৩ এপ্রিল পাকসেনাদের হাতে শহীদ হন জাহেদুর রহমান (রঞ্জু), এ. এম. এম. রায়হান, আকবর হোসেনসহ অনেকে। হানাদার পাকসেনাদের হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ক্রমে বাড়তে থাকে। হানাদারেরা বগুড়া শহর থেকে ১ কিলোমিটার দূরে মুলতানগঞ্জ পাড়ায় মোফাজ্জল বারী কে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। দীর্ঘ একমাস বগুড়াকে মুক্ত রাখতে ২৫ ও ২৬ মার্চ ৭১ যুদ্ধে মোফাজ্জল বারী সহ আরো অনেকেই শহিদ হন। ফুলবাড়ি এলাকার ৭০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে নরপিশাচরা। তাদের মধ্যে চুন্নু, খোকন, হিটলু, সাইফুল, খোকন, আজাদ, মাসুদসহ রয়েছে অনেকেই।

একমাস বগুড়া অবমুক্ত থাকার পর হানাদার পাকসেনারা বগুড়াকে দখল করে। ২২ এপ্রিল বগুড়া শহরের পতন ঘটে। বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধারা হতদ্যাম হয় না। আবার উজ্জীবিত হয় তারা, নতুন উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ে। বগুড়া জেলার শহর-গ্রামের তরুণরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পাড়ি জমায় সীমান্তে এবং সেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে তারা প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে জেলার বিভিন্ন স্থানে হানাদার পাকসেনা। বিহারীরিও বাঙ্গালীর একাংশ মিলে তৈরি হয় রাজাকার। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নানা স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে স্মরণকালের যে হত্যাযজ্ঞটি সংঘটিত হয়েছিল তা রানীর হাটের অদূরে সংঘটিত "বাবুর পুকুরে" ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর। তখন চলছিল রমজান মাস। দেশ স্বাধীনতার মাত্র ৩৫ দিন আগে বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া ও খান্দার এলাকা থেকে একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধাসহ ২১ জনকে সেহেরি খাওয়া অবস্থা থেকে রাজাকার ও হানাদার পাকসেনারা তুলে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে ১৪ জনকে ঐ রাতেই বাবুর পুকুর পাড়ে (নাটোর রোড সংলগ্ন) সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন সকালে স্থানীয় জনসাধারণ সেই স্থানেই তাদের পাশাপাশি কবর দেন। এছাড়াও বগুড়ার নানা স্থানে রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, আলশামসরা যে সব স্থানে নিরীহ বাঙ্গালীদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বগুড়া

রেল স্টেশন। এছাড়া S. D. O বাংলা, মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, সেউজগাড়ীর S. P.R আম বাগানসহ আরও কয়েকটি স্থান।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে বগুড়া মুক্ত করার অভিযান শুরু হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনী বগুড়ায় বোমা ফেলতে শুরু করে। অন্যদিকে ভারতীয় বাহিনীর ৬৪ মাউন্ট রেজিমেন্টের সৈন্যরা ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিং- এর নেতৃত্বে স্থল পথে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হয় আর এক পর্যায়ে বগুড়া শহর হতে দুই মাইল উত্তরে নওদাপাড়া ও ঠেঙ্গামারার মাঝামাঝি লাঠিগাড়ি মাঠসংলগ্ন বগুড়া, রংপুর মহাসড়কে অবস্থান নেয়। সে সময় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের মুক্তিসেনারাও অংশগ্রহন করে। ভারতীয় বাহিনীর গুর্খা সৈন্যের একটি দল ট্রাক বহর নিয়ে বগুড়া শহরের পূর্বদিক ধরে মাদলা গ্রাম হয়ে শাহজাহানপুরের পূর্বের মাঝিড়া গ্রামের দিকে অবস্থান নেয়া। অপর একটি মিত্রবাহিনীর দল বগুড়া শহরে প্রবেশ করে। বগুড়ায় ১৯৭১ সালের ১১ ও ১২ ডিসেম্বর তুমুল যুদ্ধের পরে পাকিস্তানী হানাদারেরা অস্ত্রসহ আত্মমর্পণ করে ১৩ ই ডিসেম্বর। বগুড়া মুক্ত করার সম্মুখযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যরাও শহীদ হন। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর বগুড়া সদর হানাদার পাকসেনামুক্ত হয়। আক্টোবরে পূর্বে পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও জামায়েত নেতা আব্বাস আলী খান বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এক জনসভায় বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তিনি আরও বলেন, বর্তমান যুবসমাজ দ্বি-জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পাকিস্তানের পবিত্র মাটি থেকে দুষ্কৃতিকারীদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার জন্য তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

(দৈনিক পাকিস্তান ১১ অক্টোবর, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত)

তথ্যসূত্র :

১। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধপর্ব।

২। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ৮ম ও ৯ম খণ্ড। ঢাকা ১৯৮৪ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। এ. কে. এম সামসুদ্দিন তরফদার। দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়ার ইতিহাস) বগুড়া, ১৯৭০)

৪। আজিজার রহমান তার মল্লিকা-২০০৮

৫। রাজিব ব্যানার্জী–প্রতিস্রোত সংকলন

৬। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব এবং মাহমুদ, লে. জে. এরশাদের প্রতি খোলাচিঠি।

বগুড়ার গণহত্যা

বাবুর পুকুর ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর। ভোররাত। চলছে সেহেরি খাওয়ার আয়োজন। সেহেরি খাওয়ার অবস্থান বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া, খান্দার এলাকা থেকে ২১ জন বাঙ্গালিকে স্থানীয় রাজাকার ও হানাদার পাকসেনা ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে ৭ জনকে ছেড়ে দেয়া হয় বাকী ১৭ জনকে ঐ রাতেই বাবুর পুকুর নামক স্থানে (নাটোর রোড সংলগ্ন) সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে। বাবুর পুকুর হত্যাকাণ্ডের শহীদরা হলেন –

১। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মান্নান পশারী।
২। হান্নান পশারী
৩। মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম।
৪। ন্যাপ কর্মী ওয়াজেদুল রহমান টুকু
৫। জালাল মন্ডল।
৬। মন্টু মন্ডল
৭। আব্দুস সবুর (ভোলা)
৮। আলতাফ আলী
৯। বাদশা শেখ
১০। বাচ্চু শেখ
১১। ফজলুর হক খান
১২। আবুল হোসেন
১৩। নূরজাহান বেগম (লক্ষ্মী) এবং
১৪। অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি।

স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর হলেও বগুড়ার বাবুর পুকুর বধ্যভূমিতে আজও গড়ে ওঠেনি কোনো স্মৃতিসৌধ। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর পাক হানাদাররা বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া শহীদ নগর এলাকা থেকে এক মহিলাসহ ১৪ জনকে তুলে নিয়ে গিয়ে বগুড়ার শাহজাহানপুর (মাঝিড়া) উপজেলার খরনা ইউনিয়নের টেংগা মাগুর হাটের উত্তরে বাবুর পুকুর নামক স্থানে সারিবদ্ধভাবে ব্রাসফায়ার করে হত্যা করে। সেই সব শহীদ পরিবার আজও প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ৩৭ বছর পরেও এই শহীদদের স্মরণে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করা হয়নি। ১৯৭৯ সালে বগুড়া প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ১৪ জন শহীদের কবরগুলো পাকা করা হয়েছিল। সংস্কারের অভাবে এবং অযত্ন অবহেলায় তা এখন ভগ্নদশা প্রায়। ১৯৯২ সালে তৎকালীন বগুড়া জেলা প্রশাসক সাজ্জাদ হোসেন বাবুর পুকুরে একটি স্মৃতিসৌধ ও বাস স্টপেজ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে সময় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য কিছু টাকাও সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। শহীদ সাইফুলের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে বগুড়া

পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মরহুম মোশারফ হোসেন মন্ডলের সময়ে গোহাইল রোডের নামকরণ করা হয় সাইফুল ইসলাম সড়ক।

এছাড়াও বাবুর পুকুরের গণহত্যায় শহীদ মান্নান ও হান্নানের নামে ঠনঠনিয়ার বাসার সামনের গলিটার নাম রাখে। কিন্তু শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে এলাকাবাসীরে এ দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। বিবির পুকুরের গণহত্যার ১৪ জন শহীদের এলাকা শাহ্পাড়া, হাজীপাড়া, মন্ডলপাড়া, তেতুঁলতলা, '৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর পরই এলাকাবাসী শহীদনগর গ্রাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ঠনঠনিয়ার এ মহল্লাকে শহীদনগর হিসেবে অনুমোদন করেছে।

বগুড়াসহ কয়েকটি থানার মুক্তিযোদ্ধা দলনেতার তালিকা

বগুড়া জেলার বেশ কয়েকটি গেরিলা দল মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তারা হলেন–

১। আব্দুর রাজ্জাক খোকনের দল।

২। সাইফুল ইসলামের দল।

৩। হারুনুর রশীদের দল।

৪। আহসান হাবীব (ওয়ালেস) এর দল।

৫। আব্দুল হাসিম বাবলুর দল।

এই সব বীর সন্তানেরা সোনাতলা, গাবতলী, সারিয়াকান্দি, ধুনট এবং বগুড়া শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশকিছু সফল অভিযান চালায়। তাঁরা বিভিন্ন রেলওয়ে ব্রিজ, কালর্ভাট, পাকসেনাদের সামরিক ট্রেন, ট্রাক ও লঞ্চ মাইন রকেট লাঞ্চার দিয়ে ধ্বংস করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বগুড়া পাওয়ার হাউস ধ্বংস করার অভিযানে ব্যর্থ হয়ে গেরিলা কামান্ডার সাইফুল ইসলাম শহীদ হন। বগুড়া জেলার মুক্তিযোদ্ধারা জয়পুরহাট, হিলিসহ নানা সীমান্তে ও সম্মুখযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

তথ্যসূত্র : রাজীব ব্যানার্জী প্রতিস্রোত সংকলন।

মুক্তিযুদ্ধে শেরপুর

'৭১ এর মুক্তির বাতাস দেশের সব শ্রেণীর সব জায়গায় বইছিল। শহর গ্রাম গঞ্জ সব জায়গাতে তখন একটাই কথা যে কোনো মূল্যেই হোক এ দেশকে বাঁচাতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের মার্চের এই জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সারা দেশের মত বগুড়ার শেরপুরেও শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। শেরপুরের বিপ্লবী ছাত্রনেতা-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শহওেরর অলিতে গলিতে। তারা বিক্ষোভের সুরে শ্লোগান দেয় "ভুট্টোর" বুকে লাথি মার বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। শেরপুরে তৎকালীন ছাত্রনেতা মজিবর রহমান মজনু এবং আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে গঠন

করা হয় ছাত্র পরিষদ। দেশের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সারাদেশের মানুষের মত শেরপুরবাসীকেও উত্তেজিত করে রাখে। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ শনিবার সকালে খানসেনারা শেরপুর শহরে ঢুকে পড়ে। মর্টার শেলের আঘাতে ধ্বংস করতে করতে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে। শহরটি তখন জনশূন্য। আতংকে দিশেহারা মানুষ পালিয়েছে এদিক সেদিক। একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে গুটি কয়েক লোক দাঁড়িয়েছিল অলিতে গলিতে। হানাদার পাক সেনারা তাদের নিষ্ঠুরতার অত্যাচারের নজির দেখাতে শুরু করে। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় নিরীহ নিরাপরাধ মানুষের বুক।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেরপুরের অবস্থা ছিল চরম অস্বস্তিকর ও শাসরুদ্ধকর। হানাদার পাকসেনারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে তাদের দোসর হিসাবে গড়ে ওঠা রাজাকার বাহিনীকে সঙ্গী করে অত্যাচার চালায় সাধারণ মানুষের ওপর। সাময়িক নেতৃত্বশূন্যতার সুযোগে হানাদার পাকসেনা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। এই স্বৈরাচারী মনোভাবে সাধারণ জনতা ফুঁসে উঠতে তাকে। হানাদার পাক সেনাদের সমুচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হয় মুক্তি সেনারা। হানাদার পাকসেনারা ভারী ভারী গোলা দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে শেরপুরে। তদনীন্তন হাবিব ব্যাংক ও ন্যাশানাল ব্যাংক যা বগুড়ার শেরপুরে ছিল, তা দুটি শেলের আঘাতে উড়ে যায়। দোকান-পাট, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় হানাদারেরা। শেরপুর কলেজটিও পুড়িয়ে দেয়া হয়। এদিন কলেজ কম্পাউন্ডে ১১ জনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। বাঘড়া কলোনীর ২৯ জন নিরীহ মানুষকেও হানাদার পাকসেনারা হত্যা করে ব্রাশফায়ারে। এভাবে মেরপুরের মাকড়খোলা ও ঘোঘা ব্রিজের কাছেও হত্যাযজ্ঞ হয়। গণহত্যার এই ভয়াবহতায় শেরপুর শহরসহ আসে পাশের গ্রামের লোকজন বাঁচার তাগিদে পালিয়ে যায়।

শেরপুর কলেজের যে ঘরটিতে বিজ্ঞানের সরঞ্জাম আর মূল্যবান বই-পত্র রাখা ছিল, হানাদার পাক সেনারা সেই ঘরটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল মর্টারের আঘাতে। কলেজের দাপ্তরিক কাজকর্ম হত সেই কক্ষটিতেও আগুন ধরিয়ে দেয় সে সময়। এরপর হানাদারেরা মার্চ করতে করতে এগিয়ে যান বাঘড়া কলোনীতে। কলোনীর উত্তরদিকে একটি ইটভাটার কাছে আবালবৃদ্ধ মিলে ২৬ জনকে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। এ ঘটনার পর বাঘড়া কলোনীটি পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। শেরপুরে এ ঘটনার পর সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এদিকে এই অরাজকতা রোধ করতে শেরপুরে হোসেন গঠন করেন শান্তি কমিটি। ইচ্ছায় বিরুদ্ধে অনেকেকেই শান্তি কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেন। আবার দেখা যায় এক শ্রেণীর সুধী মানুষ শান্তি কমিটিতে নাম অন্তর্ভূক্তি করতে চাচ্ছেন। শান্তি কমিটি আশাবাদী হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা গঠনমূলক কাজ হাতে নেয়। লুণ্ঠনরোধ, জনশূন্য পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি সংরক্ষণের চেষ্টা করতে কিছু হানাদার বাহিনীর সদস্য প্রশাসনিক নিয়ম অগ্রাহ্য করে তাদের কাজ করতে থাকে। শান্তিকামী সাধারণ জনতা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। শেরপুরের মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শেরপুরের হানাদার পাকসেনা ও রাজাকারদের শায়েস্তা করতে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসে। শেরপুরের মুক্তিযোদ্ধারাও জীবনবাজি রেখেছিল দেশ মাতৃকার কাছে।

মুক্তিযুদ্ধে সারিয়াকান্দি

দেশের অন্যান্য এলাকার মত সারিয়াকান্দিতেও হানাদার বাহিনী শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। সারিয়াকান্দি ৭নং সেক্টরের অধীনে ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের শুরুতেই বগুড়ার মত সারিয়াকান্দিতে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বালিয়ারতাইরের মমতাজ উদ্দিন, নূর আহমেদসহ সচেতন অনেকেই সাধারণ ছাত্র জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে এনে তাদের ট্রেনিং দেয়া হত। ট্রেনিং দিতেন তৎকালীন নায়েক সুবেদার জালাল উদ্দিন ও আব্দুল সাজেদ। সারিয়াকান্দি থানা থেকে ধার করে রাইফেল এনে সারিয়াকান্দি হাইস্কুল মাঠে মমতাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে শুরু করে। পাক হানাদারেরা ২১ এপ্রিল বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে হামলা করলে সারিয়াকান্দি থানা হানাদার পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। দেশের মুক্তিকামী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অনুভব করে সারিয়াকান্দির ছাত্র-জনতা। মুক্তিবাহিনীর অনেকে আত্মগোপন করে এবং পরবর্তীতে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ভারত চলে যায়। দেশের ভৌগলিক দিক থেকে সারিয়াকান্দি উপজেলা যমুনা নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি অবস্থিত। সে সময় ভারতে যাবার অনেক সহজ পথ ছিল। সে সারিয়াকান্দির চন্দনবাইশা মথুরাপাড়া, পাকুল্লা, বোহাইল, কাজলা, চালুয়াবাড়ির মত বিভিন্ন জায়গা দিয়ে নৌকা দিয়ে ভারতের মানিকচরে যাওয়া আসা করা যেত। যদিও এভাবে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না। তবুও সহজ ও সুবিধাজনক ছিল এ জয়গা। অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ জায়গা দিয়ে ভারতে যাতায়াত করত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। হানাদার পাকবাহিনী হাটশেরপুর, সারিয়াকান্দি ও চন্দনবাইশাতে ক্যাম্প গেড়ে বসে। তৈরি হয় রাজাকার। মুক্তিবাহিনীর ভারতে যাওয়ার পথ আর সুগম থাকে না। তখন সারিয়াকান্দির মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকসেনাদের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর হয়।

সারিয়াকান্দিতে মূল যুদ্ধ শুরু হয় ৭১ এর আগস্টে। মাঝামাঝি সময়ে গেরিলা আক্রমণের মধ্য দিয়ে আগস্ট মাসের মধ্যে গেরিলা বাহিনী বগুড়া সারিয়াকান্দি রাস্তার লাঠিমার ঘোন গ্রামের কাছাকাছি ব্রিজটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। এর ফলে লাটিমারঘোন, কালু ডাঙ্গা, শাহাবাজপুর ও সাত টিকরী গ্রামে হানাদারেরা চরম বর্বরতা চালায়। ১৬ আগস্ট ১৯৭১ এ সৈয়দ ফজলুল আহসান দিপুর নেতৃত্বে একদল মুক্তিাবাহিনীর সাথে সারিয়াকান্দি থানার নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে হানাদারা পাকবাহিনীর এক সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ময়নুল নামে সারিয়াকান্দি থানার এক দারোগা, ৫ জন পাকসেনা ও কয়েকজন রাজাকার সেদিন নিহত করে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে গেরিলা দল বগুড়া সারিয়াকান্দি রাস্তার একটি ব্রিজ এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং পাক হানাদারদের হত্যা করে। এতে একজন পাক অফিসারসহ ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২০ আগস্ট মাসুদ হোসেন আলমগীর, নোবেলের দল সারিয়াকান্দির আওলাকান্দি গ্রামের পূর্বে যমুনা নদীতে একটি পাকসেনাদের ব্যবহৃত লঞ্চ রকেট ছুঁড়ে ধ্বংস করে দেয়। ৪ সেপ্টেম্বর ৬

জন পাকসেনা খাবার নিয়ে বগুড়া থেকে সারিয়াকান্দি আসার পথে ফুলবাড়ি ঘাটে খেয়া নৌকার ওপর গেরিলা হামলা চালায় মুক্তিযোদ্ধারা। এতে দুইজন পাক সেনাকে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী। অন্য চারজন পালানোর সময় ধরা পড়ে। পরে তাদের মুক্তিযোদ্ধারা পিটিয়ে হত্যা কলে। ১৯৭১ এর ১৯ সেপ্টেম্বর গেরিলা বাহিনী রমীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে সারিয়াকান্দি থানার তাজুরপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়া একদল হানাদার সেনাকে ঘেরাও করে। শুরু হয় গোলাগুলি। প্রচন্ড গোলাগুলিতে ঘটনাস্থলেই শত্রুপক্ষের কয়েকজন সেন্য নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায় দিকবিদিক শূন্য হয়ে।

সারিয়াকান্দিতে রাজাকার ও পাক হানাদারেরা গ্রামের ভেতর লুটতরাজ চালাতে থাকে। মা-বোনের ইজ্জত লুটতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে প্রতিশোধের স্পৃহা বাড়তে থাকে এরই পরিক্ষিতে ২০ অক্টোবর সায়িকান্দির নারচী ও গণকপাড়া গ্রামে হানদার পাক সেনাদের সাথে গেরিলা বাহিনীর চারটি দলের সঙ্গে এক সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ শুরু হয় সকাল ৭ টায় চয়ে প্রায় ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ পরের দিন সকাল পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের দলটির দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দ ছিল তোফাজ্জল হোসেন মকবুল, আব্দুল হামিদ, মোকরানা ফজলুর আহসান দিপু, আঃ সালাম ও রেজাউল করিম মন্টু। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বল রাইফেল ছিল প্রাচীন ধরনের আর পাকসেনারা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ চালায় মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। মুক্তিযোদ্ধারা আচমকা এ আক্রমণে কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। তারা পিছু হটে যায়। হানাদার পাকসেনারা গ্রামে ঢুকে পড়ে। এলোপাতাড়ি আক্রমণে কয়েকজন লোককে হত্যা করে। বহু বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা দমে না। তারা সংঘটিতে হতে আব্দুল হামিদ শোকরানার দলসহ অন্যান্যরা সারিয়াকান্দির টেউরপাড়া গ্রামরে দিকে এগিয়ে যুদ্ধের জন্য পজিশন নেয়। ধাওয়া পাল্টাধাওয়া গোলাগুলি চলে মুক্তিযোদ্ধ ও পাক হানাদারদের সঙ্গে। ঐ সময় হানাদার পাক সেনারা টিউরপাড়া গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ১২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেনসহ ৯ জনকে হত্যা করে মুক্তি সেনারা। বাঁশগাড়ি ও নারচীতে রাতভর গোলাগুলি চলে মুক্তিযোদ্ধা ও হানাদার পাক সেনাদের। ভোরের দিকে পাকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। ২৩ অক্টোবর হানাদারবাহিনী আবার নারচী গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামের বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়।

১০ নভেম্বর নারচী গ্রামের আব্দুল হাসিমের নেতৃত্বে বগুড়া হতে সারিয়াকান্দি থানায় আসার পথে বাইগুনী গ্রামে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কর্নেলসহ ৫ জন পাকসেনাকে খতম করে। পাক হানাদারদের প্রতিহত করতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম মুকুলের নেতৃত্বে তাহসীম, আমিনুল ও আনসার আলী যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল ও রোডম্যাপ তৈরি করেন। ২১ নভেম্বর রাত বারোটায় সারিয়াকান্দি রামচন্দ্রপুর প্রাইমারি স্কুলে উপস্থিত হয়। তখন সেখানে প্রায় ১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের দশ ভাগে ভাগ করা হয়। বগুড়া শহর থেকে যেন হানাদার পাকবাহিনী আসতে না পারে সে জন্য রামনগরের পিছনে বগুড়া সারিয়াকান্দি সড়কে মাইন পুঁতে রাখা হয়। সিরাজগঞ্জ হতে পাকসেনারা যাতে আসতে না পারে সেজন্য মথুরাপাড়ার ওয়াপদা বাঁধের ওপর মাইন পুঁতে রাখা হয়। উত্তর দাক্ষিণ ও পূর্বপাশে এভাবে মাইন পুঁতে রাখার পর মুক্তিবাহিনী

কৌশল করে পশ্চিম দিকের বাঙ্গালি নদীর পশ্চিমতীরে পজিশন নেয়। প্রতি দিকে ২৫ জনের একটি করে দল থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের। কাটআপ করার জন্য পরিকল্পনামাফিক সকল মুক্তিযোদ্ধা রাত ৩ টার দিকে যার যে স্থান সেখানে অবস্থান নেয়। এদিকে পাকহানাদাররা নিজেদের ঘাটিতে অবস্থান করছে। ঘন কুয়াশা পড়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ স্থগিত করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধা আনছার আলীর ভাষ্য মতে, ২২ নভেম্বর ৭১ সালের নির্দিষ্ট দিনে ঘন কুয়াশা আর ভোর হওয়ায় রাজাকারেরা বর্তমানে হাসপাতাল এলাকার (তখন হাসপাতাল ছিল না) নিরাপত্তার কারণে ব্যবহৃত গাছের ডালে লটকানো হারিকেন গুলো নিভিয়ে ও গুছিয়ে নিচ্ছে। যদিও তারা বোঝেনি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দিকে আক্রমণের প্রস্তৃতি সম্পন্ন করেছে। ২৩ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয় এবং হানাদার পাকসেনাদের প্রতিহত করার সকল প্রস্তুতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। ২৪ নভেম্বর সূর্য ওঠার পর উত্তর দিকের মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেলগুলো একে একে গর্জে ওঠে। হানাদার পাকবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এভাবে শুরু হয় মুক্তিসেনা ও হানাদারদের সম্মুখযুদ্ধ। সারিয়াকান্দির উত্তর পশ্চিম নানা কৌশলে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রাণের ভয়ে বেশ কিছু রাজাকার দৌড়ে সারিয়াকান্দির উত্তর-পশ্চিম দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। উত্তর দিকের অবস্থিত মুক্তি যোদ্ধারাও যুদ্ধ চালাতে থাকে। রফিকুল নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে পাক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সহচর রফিকের লাশ নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। এতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই সুযোগ পাকসেনারা এগিয়ে এসে মুক্তিসেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। চলে সম্মুখযুদ্ধ।

২৫ নভেম্বর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রণকৌশলে উদ্দীপ্ত হয়ে সারিয়াকান্দির রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাট পার হওয়ার উদ্দেশ্যে খেয়া নৌকায় উঠে বসেছিল। একপর্যায়ে ২ জন পাকসেনা বেরিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। এসময় আরও ১৭ জন পাকসেনা এসে যোগ দেয়। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ নিরীহ জনতা সহ১৩ খান সেনা নিহত হয়।

সারিয়াকান্দির নবাদরি চরের প্রায় দেড়-দুই হাজার নিরীহ সাধারণ জনতা লাঠি-সোটা নিয়ে একজন পুলিশ ও ২ জন রাজাকারকে ঘিরে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশ মাতৃকার জন্য সাধারণ জনতার সাহায়তার ব্রাশ ফায়ার করে এবং ওদের আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়। রাজাকার ও পশ্চিমা পুলিশটি আত্মসমর্পণ করে রাইফেলসহ। যদিও তাদের রাইফেল তখন গুলিশুন্য ছিল। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আনছার আলী। তিনি শত্রুপক্ষের রাইফেলগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে শত্রুদের দলকে বেঁধে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প রামচন্দ্রপুরের দিকে রওনা দেন।

২৮ নভেম্বর সারিয়কান্দি থানা আক্রমণ করা হয়। এ আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় নারচী গ্রামের আব্দুল হাসিম বাবলু, আব্দুর রশিদ, চর হরিনার তোফাজ্জল হোসেন মকবুল, হুয়াকুয়ার, আব্দুর রাজ্জাক, রামচন্দ্রপুরের মহসিন, মৌরের চরের সরুজ্জামান ও কুতুবপুরের আনছার আলী। ৭নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা দল ও গেরিলা বাহিনী

পাকহানাদারের ওপর প্রবল গোলাবর্ষণ করে। হানাদারবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে দুইজন মুক্তিসেনা নিহত হয়।

২৯ নভেম্ব সকাল ৮ টায় গেরিলা বাহিনী সারিয়াকান্দি থানা আবার আক্রমণ করে। এতে বেশ করেকজন রাজাকার নিহত হয়। থানার অফিসার ইনচার্জসহ ১৮ জন পাক সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা ৩ জন শহীদ হন এদিন। সারিয়াকান্দির মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হানাদার পাকসেনাদের কিছু সংখ্যক পালিয়ে যায়, অন্যারা আত্নসমর্পণ করে। সারিয়াকান্দির মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে ও হানাদার পাকসেনাদের আত্নসমর্পনের দিনে যে ৩ জন শহীদ হয় তারা হচ্ছেন মমতাজ উদ্দিন, মোজাম্মেল হক ও আব্দুল জলিল। ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সালে সারিয়াকান্দি হানাদারমুক্ত হয়। এদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ৫৩ জন রাজাকার ও ১৯ জন পাকসেনা বন্দী হয় '৭১ এর সারিয়াকান্দির থানার নিজ-তিতপরল গ্রামের চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেনের বাড়িতে। ১৯ জন রাজাকারকে মৃত্যুদণ্ড দেয় যমুনা নদীর তীরে। গ্রামবাসী ও মুক্তযোদ্ধারা। অন্য রাজাকারদের নাকে খত দেয়ার মাধ্যমে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র : মোহাম্মদ জাকির সুলতান সোনা রচিত সারিয়াকান্দির ইতিবৃত্ত ও তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র', দশম খণ্ড অনুযায়ী সারিয়াকান্দি হানাদার মুক্তির তারিখ ২৮ নভেম্বর এবং মুক্তিযোদ্ধা মো. আনছার আলীর যুদ্ধের স্মৃতিকথায় তা ২৫ নভেম্বর।

আলবদর (বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের অভিশাপ)

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনাবাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল রাজাকার, আলবদররা। এখানকার আলবদররা ভারতে গিয়ে গেরিলা ট্রেনিং করে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নিধন করতে তারা হাত মিলিয়েছিল পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে শুধুমাত্র বগুড়া সদরে ৩৯ জন আলবদরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিল। তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

মুক্তিযুদ্ধে সোনাতলা

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সোনাতলার জনতা দেশমাতৃকার টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধে বগুড়াসহ আশেপাশের বিভিন্ন থানায় যেমন গড়ে উঠে ছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম তেমন সোনাতলায়ও নানা জায়গায় গড়ে ওঠে সশস্ত্র সংগ্রাম। পাকসেনাদের মোকাবেলা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সোনাতলা হাই স্কুল মাঠে দেওয়া হয় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ। স্থানীয় কিছু যুবক আব্দুল জোব্বারের নেতৃত্বে কামারপাড়ার জঙ্গলে ট্রেনিং নেয়। পরবর্তীতে সোনাতলার মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতের শিলিগুঁড়ির পানিঘাটা ক্যাম্প এবং দার্জিলিং এর মূর্তি পাহাড়ের ক্যাম্পে ট্রেনিং নেয়। কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজিবপুর ক্যাম্পে

প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা সোনাতলা সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদার বাহিনীর সঙ্গে মাগুরা রেল ব্রিজের পাশে সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে মুক্তিসেনারা জয়ী হয়। মুক্তিযোদ্ধারা রেলগাড়ি চলাচলের রেল ব্রিজটি মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা টেলিফোন একচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া পাকসেনারা নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর নানা রকম লুটতরাজ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়। পাকসেনারা রাজাকারদের সহায়তায় ঘোড়াপীরের তাকিয়ায় ২/৩ জনকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় পাকসেনারা সোনাতলায় প্রবেশ করে এবং ঘোড়াপীর মেলায় এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। কখনও কখনও পাকসেনাদের অত্যাচারের শিকার হতো রাজনৈতিক নেতারা। পাকসেনারা রাজাকার-আলবদরের সাহায্যে মানুষকে ধরে এনে ক্যাম্পে রেখে নির্যাতন চালাত ও পরে হত্যা করে। সোনাতলায় পি টি. আই মোড়ে পাকিস্তানী হানাদারদের একটি ক্যাম্প ছিল। সেখানে শিশুসহ নানা বয়সী নারীদের ওপর পাশাবিক নির্যাতন চালায়। সোনাতলার স্থানীয় অনেক জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহায়তা করে। চিকিৎসা সেবা, খাবার সরবরাহসহ নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

যদিও সোনাতলায় সম্মুখযুদ্ধ হয়েছে তবুও এ এলাকাতে অন্য সকল থানা থেকে হত্যা, লুটতরাজ ও নির্যাতন কম হয়েছে তুলনামূলক। যুদ্ধের সময় এখানে দু'একটা বাড়ি ভস্মীভূত হয়। মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম মণ্টুর বাড়িটি ৩ বার রাজাকার ও পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১৪ ডিসেম্বর সোনাতলা হানাদারমুক্ত হয় পাকসেনাদের ও রাজাকারদের কবল থেকে।

মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট

সারাদেশের মুক্তিকামী মানুষের চাওয়া মুক্তিযুদ্ধের আঁচড় বগুড়া জেলার আশেপাশেও লেগেছিল। তখন জয়পুরহাট জেলা হয়ে ওঠেনি। মহকুমা শহর। ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই জয়পুরহাটে স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। ১ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত জয়পুরহাটে হরতাল, মিটিং ও মিছিল চলতে থাকে। স্থানীয় শ্রমিকরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের দামামা জয়পুরহাটের জনতার বুকেও ধাক্কা দেয়। নানা পেশা-শ্রেণীর মানুষ জেগে ওঠে। 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এ ভাষণে জয়পুরহাটের একাংশ আলোড়িত হয়। প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। '৭১ এর ৮ মার্চ সকাল থেকেই শহর জুড়ে চলে নীরবতা। কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ ও অফিস ছেড়ে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্টের দিকে জয়পুরহাটসহ গোটা পশ্চিম বগুড়ার যুদ্ধের কারণে পাকিস্তানীরা পশ্চিম বগুড়ার বর্ডার বন্ধ করে দেয়। চোরাগুপ্তা হামলার রাস্তা ছিল জয়পুরহাট। জয়পুরহাট ও বগুড়ার দামাল ছেলেরা প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে চলে যায়। ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসে দেশকে বাঁচানোর লক্ষ্যে। জয়পুরহাটের পুরো

অঞ্চলটার তিনভাগের দুই ভাগ ছিল রাজাকার অধ্যুষিত। এখানে নারী পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন লুণ্ঠন ও ধর্ষণ চলে। পাকসেনারা তাদের আক্রোশ পূরণ করে যুবক ও প্রতিবাদী মানুষকে দিয়ে। রাজাকারদের সহায়তায় নিরীহ মুক্তিযোদ্ধা ও যুবকদের হত্যা করত পাকসেনারা।

জয়পুরহাটে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ক্যাপটেন ইদ্রিস এবং শাকিল উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতেন। এ সময় কিছু সচেতন লোক দেশকে রক্ষা করতে কিছু সংগ্রামী ছেলেদের নিয়ে গঠন করে সংগ্রাম পরিষদ। এ সময় সকল থানা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সুগঠিত করে গড়ে তোলেন। সমাজের সকল স্তরের লোক জয়পুরহাটের মুক্তিযুদ্ধকে তরান্বিত করতে, অস্ত্র ও লোকবল দিয়ে সংগ্রাম কমিটিতে সহায়তা করেন। জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রবেশ করে হানাদার পাকসেনারা। এ দিন ছিল পাঁচবিবিহাটের দিন। লোকে লোকারণ্য। হাটের মানুষ যখন বেচা কেনায় ব্যস্ত। হাটে পৌঁছার আগে হানাদাররা কুসুম্বা ইউনিয়নের ফিচকার ঘাটে খেজুরপাড়া ও সাড়ারপাড়ার কয়েকজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। পাকিস্তানী হানাদারদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয় দামোদরপুরের ৫/৬ জন্য দড়িব্যবসায়ীসহ ব্যবসায়ী ননী গোপাল কুণ্ডু, ছাত্র নজরুল ইসলাম। নিখোঁজ হন আয়মারসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক বিমল কুমার কুণ্ডু। হানাদারেরা এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের সহায়তাকারী রাজাকার-আলবদররা উস্‌কে দিল নরপশুদের। এদের হাতে শহীদ হন চিরকুমার কামাল উদ্দীন মণ্ডল, মীর আকবর আলী, নওদা গ্রামের তিনজন আপন ভাই ইউসুফ সরদার, ডা. ইলিয়াস উদ্দিন সরদার ও ইউনুস আলী সরদার ময়েজ উদ্দিন ফকির, দমদমা গ্রামের কাদের বক্‌স মণ্ডল, বজলার রহমান চৌধুরী, জমির উদ্দিন, লোকমান আলী ও মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান আলী সহ অনেকেই। জয়পুরহাটে পাকসেনারা (২০ এপ্রিল-১৩ ডিসেম্বর) এ রকম আরও হত্যাকাণ্ড ঘটায়। জয়পুরহাট জেলা ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা ও রাজাকাররা ব্যাপক হারে এ এলাকায় মানুষ হত্যা করে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস ধরে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার প্রায় আট মাস হিংস্র পশুদের থাবা থেকে বাঁচেনি নিরীহ সাধারণ মানুষ।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জয়পুরহাট সদর থানা, আক্কেলপুর এলাকায় পাকসেনারা অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। রাজকার-আলবদর অধ্যুষিত এ অঞ্চলের সদর থানার কড়ইকাদিপুর গ্রামে রাজাকার ও পাকসেনারা ঢুকে একই সঙ্গে ৩শ' ৬১ জন নিরীহ মানুষকে একত্র করে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে এ ঘটনাও এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। আক্কেলপুর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার খোকন পাইকাড়সহ ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে হানাদার পাকসেনারা আক্কেলপুর রেল স্টেশনের উত্তরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

জয়পুরহাট জেলার (তখন মহাকুমা ছিল) ধলাহার ইউনিয়নের পাগলাদেওয়ান গ্রামে চলে স্মরণকালের সৃষ্ট সবচেয়ে বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড। ভারত সীমান্ত কাছাকাছি হওয়ায়, পাকসেনারা এখানে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে হানাদার

পাকসেনাদের কয়েক দফা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাগলাদেওয়ান গ্রামে পাকসেনারা ও বিহারী রাজাকাররা মিলে দশ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।

পাকসেনারা এত বর্বর ও নরপিশাচ ছিল যে, তারা ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকেও নিস্তার দেয়নি। জয়পুরহাটের হিলি বর্ডারে পাকসেনারা একটি বড় বাংকার গড়ে তোলে। এ বাংকারে ১০/১২ টি জিপসহ অন্যান্য গাড়ি রাখতে পারত। এ বাংকারে চলত নানা নির্যাতন। বিভিন্ন বয়সী নারীদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করত। দেশ স্বাধীন হবার পর পাকসেনাদের বাংকারে ফায়ার ব্রিগেডের হোস্ পাইপ দিয়ে গরম পানি ঢেলে পাকসেনাদের বের করতে হয়েছে। বাংকারটি এতই গভীর ছিল যে এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংকারের ভিতরে গিয়ে পাকসেনাদের হত্যা করে। সেই বাংকারে মেয়েদের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, চুড়ি ও চুল পাওয়া গিয়েছিল।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি মানুষ নির্যাতিত হয় জয়পুরহাটসহ আশেপাশের এলাকায়। জয়পুরহাটের মুক্তিযুদ্ধে আলবদর-রাজাকার আব্দুল আলীমের নেতৃত্বে জ্যান্ত মুক্তিযোদ্ধাকে পুড়িয়ে মারা হয়। আবু সুফিয়ান নামের একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পায়ে ও হাতের তালুতে পেরেক বসিয়ে চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে হত্যা করেছে। ২৫ মার্চের পর জয়পুরহাটের সংগ্রাম কমিটি আ. কাদের চৌধুরী ও হামিদুর রহমান নান্নুকে ভারতে পাঠান অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। ডা. কাদের ভারতের আকাশবাণীতে জয়পুরহাটে সংঘটিত পাকসেনাদের বর্বরতার বর্ণনা দেন। তার সেই বর্ণনা শুনে সারাবিশ্বে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর জয়পুরহাট হানাদারমুক্ত হয়। ২৩৮ দিন হানাদার পাকসেনাবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ থাকা জয়পুরহাটবাসী মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার খন্দকার আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে রক্তে রাঙানো পতাকা উত্তোলন করে। দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা পাঁচবিবি থানার বাগজানা ইউনিয়নের ভূঁইডোবা গ্রামে প্রবেশ করে। পাঁচবিবি থানার ভিতর উচ্ছ্বসিত বীর সেনারা পতাকা উত্তোলন করেন। বাঙালির জয়ের একেকটি দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে এভাবেই।

তথ্যসূত্র : ১। মুক্তির সংগ্রামে বাংলা– আসাদুজ্জামান আসাদ ২। সাংবাদিক নন্দকিশোর আগরওয়ালা। জয়পুরহাট।

জয়পুরহাট

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমর্থনে গঠিত হয় “মালেক মন্ত্রিসভা”। ‘মালেক’ মন্ত্রিসভার সদস্যদের স্বাধীনতার পর গ্রেফতার করা হয়। মালেক মন্ত্রীসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর গ্রেফতার হন তিনি। আব্বাস আলী খান (বেঁচে নেই।) ’৭১ এর ১৪ আগস্ট “আজাদী দিবসে’ জয়পুরহাটে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর সম্মিলিত কুচকাওয়াজে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, ‘রাজাকাররা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে জান কোরবান করতে বদ্ধপরিকার।’

তথ্যসূত্র ৭৫২ যুদ্ধাপরাধীর সাজা হয়েছিল দালাল আইন বাতিলের পর মুক্ত (প্রথম আলো) ২৬ মার্চ ২০০৮।

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানায় হানাদার পাকসেনারা প্রবেশ করে। সেদিন তাদের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল এমন কয়েকজন–

১। মফিজ উদ্দিন }	দুই সহোদর চিরলা গ্রাম।
২। গইমুদ্দিন	
৩। আনেস আলী মণ্ডল	চরবরকত গ্রাম।
৪। মফিজ উদ্দিন	ঐ
৫। বাহার উদ্দিন	ঐ
৬। মমতাজ আলী	ঐ
৭। নিঝুম সর্দার	ঐ
৮। নাজির উদ্দিন	পাহুনন্দা
৯। সিরাজুল	নিধি
১০। ইয়াকুর আলী	চিরলা
১১। আজমুদ্দিন	
১২। মোহাম্মদ আলী	
১৩। মতিয়ার রহমান	
১৪। জায়মুদ্দিন	,,
১৫। গানা সরদাব	পাহুনন্দা
১৬। নাজির উদ্দিন	
১৭। কছিম উদ্দিন	

পাগলা দেওয়ানের গণহত্যা ও বধ্যভূমি

হাজারো শহীদের বধ্যভূমি জয়পুরহাটের পাগলা দেওয়ান। জয়পুরহাট জেলার পশ্চিমে ভারত সীমান্তের কাছাকাছি এক অজগ্রাম পাগলাদেওয়ান। জয়পুরহাট জেলা সদর থেকে ১৫ কি. মি দূরের এ জায়গায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ভারতগামী হাজার হাজার অসহায় শরণার্থীদের। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দেওয়া তথ্যসূত্রে জানা যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাগলা দেওয়ানে প্রায় দশ হাজার বাঙালিকে হত্যা করে। এ নির্যাতনের শিকার শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। এ ছাড়া ১৯৭১ এর ১৮ জুন শুক্রবার একসঙ্গে ২৮ জনকে হত্যা করা হয়। বাংলা ১৩৭৮ সালের ৪ আষাঢ়, শুক্রবার আযান দেওয়া হয়েছে। গ্রামের পুরুষেরা জুম্মার নামাজ আদায় করছে মসজিদে। নামাজ তখনো শেষ হয়নি। সবাই যখন নামাজে মনোযোগী তখনই হঠাৎ খ্‌ট খট্ শব্দে চমকে ওঠে নামাজিরা।

পাকিস্তানি সৈন্যরা মসজিদের চারপাশ ঘিরে ফেলে। খাকি পোষাক আর বুট জুতা নিয়ে তারা ঢুকে পড়ে মসজিদে। সকল নামাজীকে ধরে নিয়ে যায়। সময়টা ছিল আষাঢ় মাস, পথঘাট বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল। হানাদারদের একটা জিপ গাড়ি মল্লিকপুর রাস্তায়

আটকে ছিল। গাড়িটি খানা-খন্দ থেকে তুলতে হুকুম করে নীরিহ জনতাকে। মসজিদের সবাই অনেক কষ্টে গাড়িটা তোলে। সবাই ছুটি চায়। পাকসেনারা ছুটি না দিয়ে ৩০০ লোককে (কয়েকজনকে ছেড়ে দেয়) দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে রাখে। কিছু লোককে দিয়ে বড় বড় গর্ত খুড়ে রাখা হয় (পোড়াবাড়িতে)। ওখানে কাঁটা-খুড়ার (এক ধরনের কাঁটার গাছ) উপর দিয়ে সবাইকে খালি পায় হাঁটতে বাধ্য করে। পায়ের পাতায় কাঁটা ফুটে রক্ত ঝরতে থাকে, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। কাঁটার ভিতর কেউ হাঁটা বন্ধ করলে তাকে লাঠি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। তখন বিকেল ৪/৫ টা হবে। অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে নিয়ে হোলি খেলায় মেতে ওঠে হানাদারেরা। মাগরিবের নামাজের পর শুরু হয় মানুষ কাটা। ধারাল দা দিয়ে ঘাড়ে কোপ দেওয়া হয় এবং প্রতিটি মানুষকে গর্তে ফেলা হয়। এভাবে নওপাড়, ভুটিয়াপাড়া, চিরলা, পাওনান্দা, চক পাহুনন্দা, চকবরকত ও পাগলাদেওয়ান গ্রামের তিন'শ মানুষকে ধরে এমন নিধন যজ্ঞ চালায়। পাগলা দেওয়ান মাদ্রাসার কাছে রাস্তার পাশে দেশ স্বাধীন হবার প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত কোনও মানুষ মৃত দেহের গন্ধে থাকতে পারত না। বাতাসে লাশের গন্ধ ভেসে বেড়াতো। মাদ্রাসার আশেপাশের জমিগুলোতে গণকবর ও বধ্যভূমি। মানুষের হাড়গোড়সহ মাথার খুলি এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। নাটোর, সিংড়া, গয়েশপুর ও বগুড়ার শরণার্থীর দল জীবন বাঁচাতে যখন ভারতে যাচ্ছিল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তখন রাস্তায় ওত পেতে থাকা রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের ধরে অত্যাচার ধর্ষণ ও লুটপাট চালায়। এত মানুষকে এখানে এনে হত্যা করা হয়েছে যে তাদের অধিকাংশ মানুষের কোনও পরিচয় স্থানীয় মানুষেরা জানে না। চক পাহুনন্দা গ্রামের মোজাম্মেল হক জানালেন, 'দেশ স্বাধীনের পর ভারত থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি বাড়ির ঘরে অসংখ্য ছেঁড়া শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ভাঙ্গা মদের বোতল ইত্যাদি। যা নারী নির্যাতনের করুণ চিহ্ন বহন করে। তাদের বাড়িতে ও পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান করতো। বৃদ্ধ আফসার মণ্ডল নিজহাতে ৮টি লাশ সরিয়েছেন তার বাড়ি থেকে।

পাগলাদেওয়ানের পার্শ্ববর্তী পাহুনন্দা গ্রামের রসুনাথ মাহাতো নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পাতকুয়া ভর্তি ছিল মৃত মানুষের মাথায়। জয়পুরহাট ও নঁওগা জেলার উভয় সীমান্তের মধ্যবর্তী ধামইরহাট থানার অন্তগর্ত পাগলাদেওয়ান হাট। ভারত সীমান্তবর্তী পাগলাদেওয়ানে ছিল E. P. R ক্যাম্প। জয়পুরহাট জেলাশহর থেকে ১৫ কি. মি পশ্চিমে ধামুইরহাট উপজেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তের শেষ গ্রাম পাগলাদেওয়ান। এখানে পাগলাপীরের মাজার আছে।

প্রায় ১৫ ইঞ্চি পুরু ছাদবিশিষ্ট পাকসেনাদের ইট সিমেন্টের বাংকার এখনও তাদের পৈশাচিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হানাদারেরা নানা ধরনের নির্যাতন চালাত শারণার্থীদের ওপর। কোনও কোনও জায়গায় নিরীহ মানুষকে হত্যার আগে তাদের পরণের কাপড়-চোপড় খুলতে বাধ্য করা হ'ত। তারপর হাত-পা বেঁধে বেনোয়েট, ছোরা বা রামদার সাহায্যে গলা বা বুকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিত। এবং মুমূর্ষু অবস্থায় লাথি মেরে গর্তের মধ্যে ফেলে দিত। নিষ্ঠুরতার আরেকটি অন্যতম পদ্ধতি ছিল, ধানভাঙ্গা ঢেঁকির গর্তের মধ্যে জীবিত মানুষকে চেপে ধরে মাথাটা ঢেকিতে পাড় দিয়ে

খুলি ভেঙ্গে চুরমার করত। এভাবে পাকহানাদাররা বহুলোক হত্যা করেছে। গণহত্যার পর এসব গ্রামের বাড়ির উঠানে, ঘরের মধ্যে মাটির মেঝেতে কোদালের দু' চারটি কোপ দিলেই গলিত, অর্ধগলিত ডজন ডজন লাশ পাওয়া যেত।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তম বধ্যভূমি পাগলাদেওয়ান গ্রামটি।

তথ্যসূত্র : ১। হাজারো শহীদের বধ্যভূমি পাগলাদেওয়ান – জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, জয়পুরহাট ২। সাংবাদিক নন্দকিশোর আগরওয়ালা, জয়পুরহাট এবং গ্রামবাসীর সাক্ষাৎকার। ৩। আসাদুল ইসলাম জয়পুরহাট প্রতিনিধি (প্রথম আলো)

জয়পুরহাটে রাজাকারদের বর্বরতা : রাজাকার আব্দুল আলীম

মুক্তিযুদ্ধের রাজাকার আলবদরদের দৌরাত্ম্য ছিল বেশি সময়। তাদের বর্বরতার অনেক চিহ্ন মানুষকে শিহরিত করত। রাজাকাররা ও পাকসেনাদের আক্রমণে সাধারণ মানুষেরও বুক্তিসেনাদের জীবনে কি যে ভয়াবহতা নেমে আসত তা যে কোনও মানুষের কল্পনাশক্তিকেও হার মানাত। মুক্তিযোদ্ধাদের শরীরে জ্বলন্ত আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত। হাতে ও পায়ে পেরেক গেঁথে রাখত। শরীরের চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে রাখে হত্যা করত। রাজাকারদের একজন আব্দুল আলীম তা করেছে। তার একটি চাতালে সে এসব হত্যার কাজ পরিচালনা করতো। ওই চাতাল খুঁড়লে এখনও মানুষের হাড়গোড় ও খুলি পাওয়া যাবে। এই রাজাকার জিয়াউর রহমানের আমলে তার মন্ত্রীসভার যোগাযোগ মন্ত্রী ছিল। যুদ্ধের সময় রাজাকারদের এমন বীভৎসতা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

শেরপুর বাগড়াকলোনি হত্যাযজ্ঞ

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখ শনিবার সকাল ১০টার সময় শেরপুরের পশ্চিম দিকের বাগড়াকলোনিতে হানাদার পাকসেনারা আক্রমণ চালায়। গ্রামবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাকআর্মিরা চলে আসে গ্রামে। গ্রামবাসীদের একটা দল মিছিল করছিল। সময় তখন সকাল দশটা। পাকআর্মিরা গ্রামটিতে ঢুকে মিছিলকারীদের প্রত্যেকের লুংগি খুলে দেখে তারা হিন্দু না কি মুসলমান। প্রত্যেককে দেখার পর বলে 'বল পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' – এরপর সবাইকে রাস্তার পাশের খোলা জমিতে যেখানে ইটের ভাটা ছিল সেখানে একত্রে দাঁড় করায়। এরপর সবাইকে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। ২৬ জন নিরীহ সাধারণ গ্রামবাসীকে হত্যা করে পাকসেনারা পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর তারা চলে যায় শেরপুরের দিকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় অনেকেই। সামাদ, সুরুজ বাঙালি, লুৎফর মুন্সী–এরা অন্যদের সঙ্গে গুলি খাবার পরপরই পড়ে যায়।

বাগড়া কলোনিতে ঘটে যাওয়া ২৬ জন নিরীহ মানুষকে যারা হারিয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ তার স্বামীকে হারিয়েছেন কেউবা তার সন্তানকে। এরকম বাবা, শ্বশুর, স্বামী ও ভাইকে হারিয়েছেনও। সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন বলেছেন তাদের কথা।

জোবেদা বেগম (৬০)
স্বামী, শ্বশুর, বাপ, ভাইকে হারিয়েছেন একই দিনে এমন একজন জোবেদা বেগম (৬০)। তার শ্বশুর, স্বামী ও ভাই, বাবাসহ ৪জনই মিছিলে গিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকজন এসেছিল অন্য গ্রাম থেকে তারা এ গ্রামের অন্য লোকদের মিছিলে যেতে বলে দেশ স্বাধীনের জন্য। তার জবানীতে –"আমার শ্বশুর ও স্বামী আমার বাপ ও ভাইকে মিছিলে যাবার জন্য বলে। খানেরা এলে ওদের সবাইকে লুংগি খুলতে বলে। লুংগি খুলে দেখে ওরা মুসলমান কিনা। এরপর সবাইকে ইটের ভাটায় তোলে। সবাইকে পশ্চিম দিকে লাইন করিয়ে বসায়। পাক খানসেনারদের একজন কইছিল গুলি কর। আরেকজন কইছে না পারব না, আমার সাহস হয় না একজন সেনা বলে আয় আমরা পাখি শিকার করি। ওই কথা কইয়া ওরা একজন একজন কইরা মারছে। তখন সকাল দশটা। সবাইরে মাইরা গ্রামে আগুন ধরাই দিছে লুটপাট করেছে। আমার বাপ ভাই স্বামী-শ্বশুর এরা সবাই খেত খামারি করত। আমার বাবা আয়েজ মণ্ডল, ভাইর নাম আলী আকবর, স্বামীর নাম সাত্তার মণ্ডল ও শ্বশুরের নাম আজিজার মণ্ডল। পাকিস্তানিরা আমাগোর গ্রামের সব পুরুষগুলারে কইছিল। বল পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ওরা বলছিল তোমরা হিন্দু না মুসলমান। নিজেদের বাঁচাবার জন্য সবাই কইছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' এরপরও ছাড়ে নাই ওদেরকে। ২৬ জনকে রেখে বাকি ৩-৪ জনকে বাইর করে দিছে আর্মীরা। পাক আর্মীরা গেলে পরে আমরা সবার লাশ দাফন করি।

লুৎফর রহমান শেখ (বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসী)
তখনতো অল্প বয়সী ছিলাম। ২৫ কি ২৬ বছর। দ্যাশের জন্য যুদ্ধ হইছিল, গ্রামেও পশ্চিমা লোক আইছে। আমাগো পরীক্ষা করল লুংগি খুইল্লা। সুন্নত হইছে কি না দেখছে। আমরা হিন্দু না কি মুসলমান পরীক্ষা করল। এরপর আমাগো পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে বলে। আমরা ভয়ে জোরে সবাই শ্লোগান দেই। আমাগো এরপর ধাক্কা দিয়ে ঘেরাত (ইটের ভাটা) নিল। হুকুম করল। একজনের পর একজন ডাকছিল। আমাগোর সামনে মেশিনগান ফিট করল। আমরা ভয়ে দোয়া দুরুদ পড়ছিলাম। ওরা সবাইরে পশ্চিম দিকে মুখ কইরা বসায়। আল্লাই সাথে ছিল। আমি আয়তুল কুরসি পড়ছিলাম। গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথে আমি শুয়ে পড়লাম। গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথে ২৯ জন লোক শ্যাষ হইয়া গেল। আমার বেয়াই কাদের বক্স, লুৎফুর মুন্সী, সুরুজ, সামাদ, ও আমি মৃত্যুর হাত থাইকা বাইচা যাই। সুরুজের মাথায় পেটে গুলি লাগে। মোট ৩৩জনকে ঘেরাত দাঁড় করাইছিল। বাগড়া কলোনিতে যুদ্ধের সময় অনেক মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে পশ্চিমা সেনারা চলে গেছে। ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। যাদের ঘেরাত মাইরা পশ্চিমারা চলে গেল তাদের অনেকেই ভয়ে ভয়ে ঘেরাত যায়। গিয়ে দেখে অনেকেই কাতরাচ্ছে একটু পানির জন্য। কেউ দিতে পারেনি ভয়ে।

আব্দুল খালেক (৫০) (প্রত্যক্ষদর্শী)
মিছিল নিয়া বারাছিল, দিনের বেলা, সকাল দশটা হবে, আমি শেরপুর থেইকে এলাম। শুনলাম লোকজন কচ্ছে তোগো গ্রামে কোনো লোক নাই। গ্রামে এসে দেখি লোকজন পইড়ে আছে। কেউ রক্ত খাইচ্ছে, কেউ পানি চাইচ্ছে। টানাটানি কইরে বাইত নে গেলাম। কেউ বাইচল, কেউ মইরে গেল। ৩/৪ জন মানুষ বাঁচছিল। লুৎফর মুন্সীক আরও সবার সাথে দাঁড় কইরছিল, গুলির শব্দে সেও পইড়ে যায়। তখনও বোঝেনি মইরে আছে না বাইচে। রক্তমাখা শরীরে পড়ে থাকছিল। সেইই আমাদের এসে খবর দিছিল, ভিটের ঘটনার কথা।

বাগড়া কলোনির পাশের পাড়া ছিল বাড়ইপাড়া। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাটি রাজাকাররা দেখিয়ে দেয় পাকসেনাদের। গ্রামবাসীদের বক্তব্য ওরা বাড়ইপাড়া না গিয়ে ভুলে বাগড়া পাড়ায় এসে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে শিবগঞ্জ
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শিবগঞ্জেও যুদ্ধ হয়েছে ব্যাপক। রাজাকারদের দৌরাত্ম্য এ এলাকায় বেশি .ছিল বলে এখানকার যুবক শ্রেণীর বেশিরভাগই গ্রামগুলো ছেড়ে পালিয়েছিল। তবে দেশ মাতৃকাকে বাঁচাতে এদের বৃহৎ অংশ ভারতে গিয়ে ট্রেনিং দিয়ে দেশে ফিরে এসে যুদ্ধ করে। লুটতরাজ, হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া অন্যসব এলাকার মতো এখানেও হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকবাহিনীর সেনাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। এতে নিরীহ গ্রামবাসীসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে দুপঁচাচিয়া
বগুড়ার অন্যান্য থানার মতো দুপঁচাচিয়াতেও মুক্তিযুদ্ধের আঁচ পড়ে। এখানেও সম্মুখযুদ্ধ হয় বেশি কয়েকবার। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের তল্লাশী করা, হত্যা, ধর্ষণের ঘটনাও এখানে ঘটেছিল। পেটের দায়ে এখানকার গরিব লোকেরা রাজাকারদের সদস্য ছিল। তাদের কাজ ছিল ব্রিজ ও রাস্তাঘাট পাহারা দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি-ঘরের খোঁজ নেওয়া, পাকসেনাদের খাবারের যোগান দেওয়ার জন্য গ্রামেগঞ্জে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করার কাজে তারা ব্যবহৃত হতো। এদের অস্ত্র বলতে ট্রেনিং দিয়ে একটি করে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দেওয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধের শেষে দেশ স্বাধীন হবার পর রাজাকাররা পালিয়ে যায় এখান থেকে।

শিবগঞ্জের মজুমদার পাড়া বধ্যভূমি

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শিবগঞ্জের মজুমদার পাড়ায় পাকিস্তানী সেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে নিরীহ লোকদের ধরে এনে দাঁড় করিয়ে একসঙ্গে হত্যা করে। শিবগঞ্জ উপজেলা সদর হতে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে ময়দানহাট ইউনিয়নের একটি গ্রামে এই মজুমদার পাড়া। মুক্তিযোদ্ধারা বামাচরণ মজুমদার নামের একজন ভূস্বামীর বাড়িতে একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। এ অঞ্চলে এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হতো। মুক্তিসেনাদের যুদ্ধ কলা-কৌশল ও প্রশিক্ষণ দক্ষতায় প্রতিরোধ যুদ্ধে তারা অসামান্য-কৃতিত্ব দেখিয়ে শত্রুদের পর্যুদস্ত করে। ১৯৭১ এর ৪ এপ্রিল শিবগঞ্জের বিভীষিকাময় দিন। গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালি ব্রিজের কাছ থেকে প্রায় দেড়হাজার পাকসেনাবাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মজুমদার পাড়ায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত আবুল হোসেন রামাচরণ মজুমদারের বাড়িটি চিনিয়ে দেয় পাকসেনাদের। পাকসেনারা প্রথমেই এই ক্যাম্পের কমান্ডারসহ ১৮ জনকে একসঙ্গে লাইনে দাঁড় করিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। শুক্রবার পাকসেনারা ঐ বাড়িটিতে আক্রমণ শুরু করে এবং শনিবার অপারেশন শেষ করে। ২টা লরি ও ১টা জিপ ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তারা আক্রমণ শুরু করে। ঐ বাড়ির মালিক বামাচরণ মজুমদার ও তার একছেলেসহ অনেকেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। সেদিনের ঘটনায় বেঁচে যায় অন্তত ১৫জন ব্যক্তি। পাকসেনারা ক্যাম্প দখলের ও নির্যাতনের সময় তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে দৌড়ে পালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা বামাচরণ মজুমদার নগ্ন অবস্থায় পালিয়ে প্রাণরক্ষা পান। তার কয়েকজন সন্তানও এ নিষ্ঠুরতায় জীবন দেন। তার একমাত্র ছোট ছেলেটি অদূরের কুয়ায় লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করে।

পাকসেনারা বামাচরণের বাড়িটি মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত করে। প্রায় ৩হাজার বিঘা জমির মালিক বামাচরণের ধানের গোলা গ্রামবাসীদের দিয়ে লুট করায় পাকসেনারা। গরু-ছাগলগুলো কিছু হত্যা করে, কিছু লুট করে নিয়ে যায়। ঘরের দরজা, জানালা, সব গ্রামবাসীদের দিয়ে লুট করানো হয়। শতশত মন ধান পাকহানাদারেরা গ্রামবাসীদের লুট করতে দেবার পরও তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার জন্য তার দুজন নেপালী গার্ড সহ সবাইকে নৃশংসতার স্বাক্ষর বহন করতে হয়। এ ঘটনার পর মজুমদার পাড়াটি মানুষশূন্য হয়ে পড়ে।

পাকসেনাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞে সেদিন যারা শহীদ হয়েছিল তারা হলেন–

(১) আব্দুস সাত্তার (যোদ্ধা কমান্ডার)
(২) তুষার কান্তি মজুমদার (২৪)
(৩) অরুণ কান্তি (২২)
(৪) পাঁচ কড়ি (২২)
(৫) সুরেশা (৫০)
(৬) দিপু ঘোষ (২০)
(৭) চেরু ঘোষ (২৮)
(৮) রমেনা (৪৫)

(৯) করুন কান্তি (২৭)
(১০) বন বাহাদুর (২৮)
(১১) কালিপদ (৪০)
(১২) ললিত সোনার (৩০)
(১৩) নরেশ (৩৫)
(১৪) কফিল (১৮)
(১৫) মোস্তাফা (২৮)
(১৬) আব্দুল জোব্বার (৩০)
(১৭) আব্দুল বারী (২০) ও
(১৮) পরেশ (৩০)

পাক সেনাবাহিনীর নৃশংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া ১৫ জন হলেন–
(১) হাতেম আলী মণ্ডল
(২) রমজান মুন্সী
(৩) নজের আলী
(৪) কছির উদ্দিন
(৫) অছির উদ্দিন
(৬) মোহাম্মদ আলী
(৭) রমজান আলী সরদার
(৮) জমসেদ মেম্বার
(৯) অজ্ঞাত
(১০) অজ্ঞাত
(১১) অজ্ঞাত
(১২) অজ্ঞাত
(১৩) অজ্ঞাত
(১৪) অজ্ঞাত
(১৫) অজ্ঞাত

মজুমদার পাড়ার বধ্যভূমিতে পরবর্তীতে পাকসেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ গর্ত করে ফেলে মাটিচাপা দিত। এখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্মম অত্যাচার চলে এসময়। গলিত লাশের তীব্র দুর্গন্ধের কারণে চারপাশের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। পাকসেনারা হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজের পর চলে গেলে নিহতদের আত্মীয়– স্বজন গর্ত খুঁড়ে আপনজনদের মৃতদেহ বের করার চেষ্টা করলে গলিত লাশের তীব্র গন্ধ, হাড়গোড় আর মাথার খুলির স্তূপ পাওয়া যায়। নিহত কালিপদর চশমা ও নরেশের পরিচয়পত্র পাওয়া যায়।

শিবগঞ্জের এই বড় বধ্যভূমিটি মুক্তিযুদ্ধের নৃশংসতার স্বাক্ষর বহন করছে বিভীষিকার মতো।

মুক্তিযুদ্ধে নন্দীগ্রাম

একাত্তরের মার্চের প্রথম থেকেই দেশব্যাপী এক অজানা শংকা তাড়া করে ফিরছিল। আবাল-বৃদ্ধবণিতা প্রাণ ভয়ে ছুটে বেড়ায় এদিক সেদিক গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। অন্যগ্রামে মত নন্দীগ্রামের ট্যাংক, লরী সহ সেনারা আক্রমণ করে। পাড়া গ্রামে হানা দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। নিরীহ মানুষ দ্বিকবিদিক ছুটে। যুদ্ধের শুরুতে মুক্তিসেনারা শহরের বিভিন্ন থানা লুট করতে বদ্ধপরিকর হয়। অস্ত্রের প্রয়োজন, তাই থানাগুলোতে চলে আক্রমণ। মুক্তিসেনারা থানায় ব্যবহারের জন্য দু'একটি অস্ত্র রেখে বাকি অস্ত্র নিয়ে আসত। মুক্তিসেনা ও পাকসেনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলে, হতাহত হয় অনেকেই। পাকসেনাদের হত্যাযজ্ঞের বলি হয় অনেক নিরপরাধ মানুষ। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে পাকসেনারা হানা দিয়ে বহুলোককে গুলি করে হত্যা করে। সেদিন এক ব্যক্তি পাকসেনাদের আসার অস্তিত্ব টের পেয়ে জঙ্গলে দৌড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচায়। পাকসেনাদের নজর এড়িয়ে এমন অনেক প্রাণই বেঁচে যায়, পাশাপাশি অনেক মানুষ নানা চাতুরির আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েও মৃত্যুবরণ করে। একজন মুচি প্রাণভয়ে একটি জলাশয়ের কাছে পায়খানা করার ভান করে বসেছিল কিন্তু পাকসেনারা তার ভান বুঝতে পেরে বসা অবস্থায়ই ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে। মো. কমরউদ্দিন শাহ যুদ্ধের বীভৎসতার পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, গ্রামটির দুইজন যুবক আত্মরক্ষা করার জন্য পাতার মধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতেও তাদের প্রাণ রক্ষা হয়নি। গাছের শুকনো পাতার নড়াচড়া লক্ষ করে তাতে পাকসেনারা গুলি চালিয়েছিল। ফলে যুবকটি মারা পড়ে। অন্যজন গুলি থেকে বেঁচে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল।

এমন লোমহর্ষক অনেক বর্বরতা আমি নিজ চখে দেখেছি। সে সময় বর্বর সেনাবাহিনী যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল সে চিত্র মনে ভেসে উঠলে আজও আমার গা ভয়ে শিউরে ওঠে। মুখ ও জিহবা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। D. C সহ আমি পরিবার পরিজন নিয়ে শহর থেকে বহুদুরের এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম।' সেনাবাহিনীর আগমনে – 'আমি দৌড়ে এক জঙ্গলে ঢুকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।'

নন্দীগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষদের নানা কৌশলে পাকসেনারা একসময় যুদ্ধে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। প্রায় বিনা প্রতিরোধে নন্দীগ্রাম থানা মুক্ত হয়, পাকসেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ধুনট

ধুনট থানায় ১৯৭১ সালের ১২ জুন পাকহানাদার সেনারা আক্রমণ করে। ধুনটে ঢুকতে তারা প্রথমেই এলাঙ্গী ইউনিয়নের মাধাইচন্দ্র ও হারান প্রা-কে গুলি করে হত্যা করে।

তাদের লক্ষটাকার একটা দোকান লুট করে দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে যায়। তারপর ধুনটের বিভিন্ন গ্রামে পাকসেনারা ঢুকে লুটতরাজসহ হত্যা করে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত নিরীহ ৭ জনকে জননী রাইচ মিলের দক্ষিণ দিকে বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়।

তথ্যসূত্র : '৭১ এর বিজয় – শেখ সবুজ উদ্দিন (সম্পাদক ও প্রকাশক)

মাদলা হত্যাকাণ্ড মাদলা বধ্যভূমি

৯ নভেম্বর ১৯৭১ সালে রাজাকার মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ও নজমুলের নেতৃত্বে (শাহজাহানপুর) মাঝিড়া উপজেলার মাদলা চাঁচাইতারা হিন্দুপাড়া ঘেরাও করে ১৩ জনকে ধরে ইউনিয়ন পরিষদের পাশের খালি জায়গায় লাইন করে পাকসেনারা তাদের ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। ১৬ জনের দলটির ৪ জন বেঁচে যান অলৌকিকভাবে, রতন কর্মকার, রাজ বল্লভ, প্রাণেন্দ্র ও শশীভূষণ।

লিচুতলার বধ্যভূমি (বগুড়া সদর)

বগুড়া-শেরপুর মহাসড়কের পশ্চিম দিকে লিচুতলায় একটি বাড়িতে পাকসেনারা হত্যাযজ্ঞ চালায়। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষদের হত্যা করে এ বাড়িটিতে লাশ স্তুপ করে রাখা হ'ত।

আড়িয়া বাজার (মাসুদ নগর) বগুড়া সদর হত্যাকাণ্ড (বধ্যভূমি)

১৯৭১ সালের ১৫ মে শনিবার আড়িয়া পালপাড়ায় হানাদার পাকসেনাদের আক্রমণে নিহত হয় ৬ জন। সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয় তারা। রাজাকার আলবদরদের সহায়তায় পাকসেনারা ফনিন্দ্রনাথ দেব, তপনপাল, সুরেশ পাল, খোকা বৈরাগী, মুনির সহ অজ্ঞাত একজনের লাশ আড়িয়া বাজারের দক্ষিণ দিকে রাস্তার পাশে ফেলে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় আরও অনেক লাশ যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়।

তথ্যসূত্র : রাজীবুল ইসলাম। ('৭১-এর বিজয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংকলন)

২৩ এপ্রিল – ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার অংশবিশেষ

২৩ এপ্রিল পাকসেনারা যখন দ্বিতীয়বারের মতো বগুড়া শহরে প্রবেশ করে তখন স্থানীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ দিন পাকবাহিনীর সদস্যদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন অনেকেই। স্থানীয় বিহারীদের তাণ্ডবতা আর নৃশংসতার শিকার হয় অনেকেই। পুরো শহর জুড়ে চলে হত্যা, লুটপাট আর অগ্নিকাণ্ড। এদিন পাকসেনাদের হাতে শহীদ হন জাহেদুর রহমান রঞ্জু, আকবর হোসেন বকুল, ফজলুল বারী, এস. এম রায়হান সহ আরও অনেকে। পাকসেনারা বগুড়া শহরসহ আশেপাশের এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করতে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে পাকিস্তানি দোসর বিহারীদের সহায়তায়। পাকসেনারা

ফুলবাড়ী এলাকায় এদিন হামলা চালায়। নীরিহ ৭০ জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন ফয়েজ আহমেদ, ছিলেন আজিজুলহক, মমতাজ উদ্দিন। ফয়েজ আহমেদ ছিলেন আজিজুল হক কলেজের লাইব্রেরিয়ান এবং একই কলেজের হেডক্লার্ক ছিলেন মমতাজ উদ্দিন। এ ছাড়াও তমিজ উদ্দিন মণ্ডল, শমসের আলী, রোস্তম আলীসহ আরও অনেকে।

২৪ এপ্রিল ১৯৭১। এদিন পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের প্ররোচনায় হত্যাযজ্ঞসহ লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়। বগুড়া শহরের চকলোকমান, লতিফপুর কলোনী, চক ফরিদ, ঠনঠনিয়া, মালগ্রাম, গণ্ডগ্রাম, মালতিনগরসহ বিভিন্ন স্থানে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালায়। ২৩ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল এই ৮ দিনে পাকসেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রায় দুইশ' নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। বগুড়ার এমন ভয়াবহ অবস্থায় স্থানীয় ছেলেরা ও মুক্তিকামী দামাল সন্তানেরা বয়স, পেশা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় উপেক্ষা করে দেশের জন্য বিজয় আনতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধকৌশল জানার জন্য ভারতে চলে যান এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে বগুড়ায় এসে জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর 'বগুড়া মুক্ত' করার অভিযান শুরু হয়। ভারতীয় বাহিনীয় ৬৪ মাউন্ট রেজিমেন্টের বিগ্রেডিয়ার প্রেম সিং এর নেতৃত্বে সৈন্যরা স্থল পথে বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে অন্যদিকে মিত্রবাহিনীর বিমান বাহিনী বগুড়া অঞ্চলে বোম্বিং শুরু করে। বগুড়া শহর থেকে দুই মাইল উত্তরে 'নওদা পাড়া ও ঠেঙ্গামারার মাঝামাঝি 'লাঠি গাড়ি' নামের স্থানে মাঠ সংলগ্ন বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে অবস্থান দেয় মিত্রবাহিনী। ৯ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় বাহিনী ওখানে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয়। বাংকার খনন করে দূর ও মাঝারী পাল্লার কামান ও মর্টার নিক্ষেপের যন্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করে। গুর্খাবাহিনীর সৈন্যরা একটি দল নিয়ে (ট্রোক বহর) করতোয়া নদীর পূর্বতীর ধরে এগিয়ে মাদলা হয়ে মাঝিড়ার দিকে অবস্থান নেয়। অপর একটি মিত্রবাহিনীর দল বগুড়া শহরে এগিয়ে আসে। ১১ ও ১২ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাসহ মিত্রবাহিনী ও পাকসেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ হয়। এতে নিহত হয় দু'পক্ষের অনেকেই।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ বগুড়া শহর হানাদারমুক্ত হয়। সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল, ৩ দিন ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকসেনারা। ১৬ ডিসেম্বর যদিও জেনারেল নিয়াজী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেছিল তবুও বগুড়া জেলা মুক্ত বলে মনে হয়নি। কাগজে কলমে বগুড়া তখন শত্রু কবলিত ছিল। কারণ ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বগুড়াতে পাকসেনারা বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ চালায়। ১৮ ডিসেম্বর বগুড়ার ওয়াপদা ডাক বাংলোর মাঠে অফিসিয়ালি পাকিস্তান আর্মী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিও সি) মেজর জেনারেল শাহকে তার হেড কোয়ার্টার নাটোর থেকে নিয়ে আসা হয়। মিত্রবাহিনীর ২০ মাউনটেইন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লচমন সিংও উপস্থিত থাকেন। পরে ১৮ ডিসেম্বর '৭১ বগুড়া জেলার ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষর হয় পাকবাহিনীর কমাণ্ডিং

অফিসার মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ মিত্র বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল লচমন সিং এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২০ মাউন্টেইন ডিভিশনের অনেক অফিসারও, মুক্ত হয় বগুড়া, বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধও শেষ হয় এদিন।

তথ্যসূত্র : বীরবিক্রম হামিদ হোসেন তারেক, জলছবি' ৭১

রাজাকার ওসমান গণি

১৯৭১ সালে বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদারদের দোসর হিসেবে পরিচিত ওসমান বিহারী ছিল একজন কুখ্যাত রাজাকার। হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ এর মতো নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে সে জড়িত ছিল। ১৯৭১ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানি আর্মিরা যতক্ষণ পর্যন্ত বগুড়ায় আক্রমণ না করেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ওসমান বিহারী ছিল একজন সাধারণ মানুষ। বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বগুড়ার বড়বাজার নামে খ্যাত রাজাবাজারে সে দখল করে একটি বাড়ি। এরপর মাড়োয়ারি ও হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ও বাড়িঘর লুট করে সে তাদের কাছ থেকে লুট করা সামগ্রী, সোনা, টাকা পয়সা কাঁসার থালাবাসনসহ অন্যান্য জিনিসপত্র রাখত কাটনারপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে। ১৯৭১ সালে বগুড়া শহরের বড় ইলেকট্রনিক্সের দোকান মোমিন রেডিও হাউসের' মালিক আব্দুল মোমিন শেখের দোকানে ওসমানগণির নেতৃত্বে তার ভাতিজা আনোয়ার হোসেন, দুই ছেলে আসলাম হোসেন ও ইকবাল হোসেনকে নিয়ে তার দোকান লুট করে। থানা রোডে অবস্থিত দোকানটি লুট করার সময় বাধা দিলে দোকান মালিক মোমিন শেখ ও তার ১৩ বছর বয়সী নাতি গুলজারকে ওসমান বিহারী রিভালবার দিয়ে গুলি করে। এতে মোমিন শেখ গুলিবিদ্ধ হয় এবং তার ভাগ্নে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মোমিন শেখের স্ত্রী লাইলী বেগম বলেন, ওসমান বিহারী আমার সোনার সংসার শেষ করে দিয়েছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে দ্রুত ঢাকায় পাঠানোর কারণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। তিনি শরীরে গুলি নিয়ে বেঁচে ছিলেন ১৬ বছর। ডাক্তাররা তার শরীর থেকে গুলি বের করতে পারেনি। মোমিন শেখের ছেলে বাবুল শেখ বলেন, ওসমান বিহারী তার ভাতিজা আনোয়ার হোসেন ও দুই ছেলে আসলাম হোসেন এবং ইকবাল হোসেন পিস্তল দিয়ে আমার বাবা মোমিন শেখকে গুলি করে। তার শরীরের চারটি জায়গা গুলিবিদ্ধ হয়। আমার বাবাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে আমার ভাগ্নে তেরো বছর বয়সী গোলজার হোসেন। ওসমান বিহারীর ছেলে আসলাম হোসেন গোলজারকে লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে দেয়। এরপর তাকে লক্ষ করে ওসমান বিহারী ও আসলাম হোসেন গুলি করে। এতে গোলজার মারা যায়। ওসমান বিহারী আমার ভাগ্নের লাশটি গুম করে।'

এছাড়াও ওসমান বিহারী পাকসেনাদের সহায়তায় লতিফপুরসহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে। সুন্দরী হিন্দু বাঙালি মেয়েদের ধরে এনে তার বাড়িতে বা ক্যাম্পে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিত। ওসমান বিহারীর ভয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কেউ মুখ খুলত না। কোনও বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা থাকলে তার খোঁজ খবর জানিয়ে কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশে নিরীহ মানুষদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দিত। ওসমান বিহারীর অত্যাচারে অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ ভয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে থাকত বিভিন্ন স্থানে। রাজাকার ওসমান বিহারী শুধু বগুড়া শহরেই তার অত্যাচার ও নির্যাতনের স্বাক্ষর রাখেনি সে আশে পাশেও তার নির্যাতনের স্বাক্ষর রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল পাকবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বাঙালি নিধনের অভিযানে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সান্তাহার রেলওয়ে জংশন এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রেখেছিল এ দেশের মুক্তিপাগল দামাল ছেলেদের একাংশ। ২৩ এপ্রিলে ট্রেনভর্তি পাকসেনারা এলে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে পাকসেনাবাহিনীর জয় হয়। রেলওয়ের তৎকালীন দুই পরিচালক এম. আই গার্ড, হাশমি গার্ড ও তাদের সহযোগী মাছুয়া গুণ্ডার নেতৃত্বে বাঙালি হত্যাযজ্ঞের অভিযানে অস্ত্র ও অর্থের জোগানাদার ছিল ওসমান বিহারী।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় ৪/৫ বছর রাজাকার খ্যাত ওসমান বিহারী আত্মগোপন করে ছিল। ওই সময় ওসমান বিহারী সৈয়দপুর ও ভারতে পালিয়ে ছিল। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সে বগুড়া শহরে ফিরে আসে।

মানিক চৌধুরী (একই পরিবারের ৫ জনকে হারিয়েছেন)

৯ নভেম্বর ১৯৭১। বগুড়ায় যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পাক আর্মিরা আছে এ ভয়ে মানুষ আতংকিত। মাদলা গ্রাম আক্রমণ করে স্বাধীনতার ২৪ দিন আগে। চাঁচাই তাড়ার পুরোটাই হিন্দুপাড়া। আমরা এক বিভীষিকার মধ্যে বাস করছি। ভোররাত থেকেই এখানে লুটপাট ও ধরপাকড় চলতে থাকে। আমার বাবা দাদারা সবাই বাড়িতে। পাকআর্মিরা পুরো বাড়ি রেড দেয়। আমার বাবা ডা. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৭৫) আমার চাচা ডা. শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী (৫৮) ভাই অমরেন্দ্র (৬০) ও কলেজ পড়ুয়া কাকাত ভাই প্রদীপ কুমার চৌধুরী (১৯)। এদেরকে ধরে নিয়ে যায়। আমার দাদা খোকা পুকুরে চান করতে গিয়েছিল। কাকাত ভাই প্রদীপ পাকআর্মিদের দেখে বাড়ির প্রাচীর টপকে পালাতে গেলে তাকেও ধরে নিয়ে যায়। এদের সহ গ্রামের অন্যবাড়িগুলো থেকে আরও নানা বয়সী মানুষদের ধরে নিয়ে মাদলা ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে আগে নিচু জলাভূমি ছিল সেখানে নিয়ে মোট ২১ জনকে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে রাখে। একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখে ৫ জন ছাড়া সবাইকে। এরপর একসঙ্গে ব্রাশফায়ার করা হয়। আমার বাবা ও কাকাকে আরও তিনজনের সঙ্গে শহরের দিকে নিয়ে যায়। আমার বড় ভাই ও কাকাত ভাইকে একত্রে হাত বেঁধে একই সঙ্গে ব্রাশফায়ার করে।

যেদিন এ হত্যাকাণ্ড ঘটে তার আগেরদিন আমাদের বাড়িতে খোট্টাপাড়া গ্রামের মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ট মাওলানা সিরাজুল ইসলাম আসে। তিনি দেশ নিয়ে, ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে নানা কথা বলেন। যাবার সময় চা-পান খেয়ে বিদায় হন। কার্তিক মাসের দিন। আমরা শুনলাম আমাদের বাড়িঘর পাক আর্মিরা ঘিরে ফেলেছে। বাবা কাকাদের বলে কাপড় খুলতে। পাক আর্মিরা দেখে তারপর কিছু না বলে ওদের ধরে। হত্যাকাণ্ডের পর পাক আর্মিরা বাকী জীবিতদের ধরে নিয়ে যায় বগুড়া শহরের দিকে। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানরা আমাদের ভাইদের মৃতদেহগুলো নিয়ে আসে। পরে আমাদের বাড়ির শশ্মানে গর্ত করে তাদের মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। যুদ্ধের শুরুতেই আমাদের বাড়িটা লুট হয়ে যায়। আমার মাস্টার কাকা গনেশ চন্দ্র চৌধুরী অবিবাহিত এবং ধনী ছিলেন। আমাদের পুরো পরিবার নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় ছিল। আমার বাবা কাকাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় তা আজ অবধি আর খুঁজে পাইনি।

স্বাধীনতার পর আমরা আবার বাড়িতে ফিরে আসি। একটা জিনিসপত্র ফেরত পাইনি। নতুন করে সবকিছু কিনতে হয়েছে। আমার মৃত দাদার ৪টি ছোট সন্তান ছিল। তাদের নিয়ে মেঝেতে খড় পেতে শুয়েছি, খেয়েছি। চট গায়ে দিতাম। পাতায় খেতাম। বিনা কারণে আমাদের জীবনে এ দুর্ঘটনা নেমে এল। আমার মাস্টার কাকা যেহেতু ধনী ছিল তার কাছ থেকে মাওলানা অনেক টাকা নিয়েছিল। পরবর্তীতে আর ফেরৎ দেয়নি। মাওলানার শ্যালক কালাম বাবুও সেদিন পাক আর্মিদের সঙ্গে ছিল। স্বাধীনতার পরে কালাম বাবু আমাদের খোঁজ খবর নিতে আসে আমার সামনে। আমরা দুজন একই কলেজের সহপাঠি ছিলাম, সে আমাকে বলে মানিক কেমন আছিস। আমি জবাবে বলেছিলাম তুই আর তোর দুলাভাই যেমন রেখেছিস। লজ্জা করে না এ কথা জিজ্ঞেস করতে। বলেছিলাম কুকুর! তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না। স্বাধীনতার পর মাওলানা সিরাজুল ইসলাম পালিয়ে ছিল। অনেক দিন পর আবার এলাকায় ফিরে আসে।

আমরা আমাদের পরিবারের হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের কথা ভুলতে পারি না। আমার মার চোখের পানি শুকাতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধে কাহালু

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী কাহালুতে প্রবেশ করে। নির্যাতন, হত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে এখানে। হানাদাররা কাহালুতে গ্রামবাসীদের ধরে হত্যা করত নির্বিচারে। রাজাকারদের দৌরাত্ম্য আর সহযোগিতায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধরে এনে ১৪ জন নীরিহ গ্রামবাসীকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে একটি পুকুরপাড়ে নিয়ে। কাহালু থানায় গজিয়ে ওঠা আলবদর ও রাজাকারদের পদচারণায় গ্রামগুলোয় অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন চলে। আলবদর মোমিন হাজী তার নিজ গ্রাম মুরইল সহ প্রত্যেক গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে যুবক ছেলে ও যুবতী মেয়েদের নিয়ে আসত। কাহালু থানার মুরইল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পাকসেনারা রাজাকারদের সহায়তায়

মাদ্রাসার দপ্তরী মুকুল বাহারকে পশুর মতো নির্মমভাবে গুলি করে। হত্যার পর তার লাশ মাদ্রাসার পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। আলবদর বাহিনীর কমান্ডার মোমিন হাজী ও খোরশেদ তালুকদারের প্ররোচনায় আমেনা বেগম নামের এক মহিলাকে পাকসেনারা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। দীর্ঘ দিন অত্যাচারের পর গর্ভবতী আমেনাকে ক্যাম্প থেকে বের করে ছেড়ে দেয়া হয় গ্রামে। পাকসেনাদের নির্মমতার আরেক উদাহরণ কাহালুর জামিদার কালী মজুমদারের বাড়িতে হানা দেওয়া। কালী মজুমদারসহ বাড়ির অন্যান্যদের হত্যা করে বাড়িটিতে লুটতরাজ ও নির্যাতন চালানো হয়।

নভেম্বরের শেষের দিকে পাকসেনারা বুঝতে পারে মুক্তিযোদ্ধাদের নানামুখী যুদ্ধ কৌশল তাদের পরাজয় নিশ্চিত করছে। এরই ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে বিনা প্রতিরোধে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কাহালু থানা মুক্ত হয়।

বগুড়ায় দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত তিন ভাই এর কথা

দেশ স্বাধীন হবার পরে দালাল আইনে বগুড়ায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে রাজাকার তিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে এক ভাইকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এবং অপর দু'ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এরা হলেন, বগুড়ার ধুনট উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়নের সরুগ্রামের আয়েজ মণ্ডলের তিন পুত্র যথাক্রমে আলহাজ মোখলেছুর রহমান (৬৩) ওরফে খোকা মিয়া, মফিজুর রহমান (৫৮) ওরফে চাঁনমিয়া, মশিউর রহমান (৫৫) ওরফে লালমিয়া।

এদের মধ্যে মফিজুর রহমান চাঁনমিয়াকে মৃত্যুদণ্ড ও অপর দুই ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করলে আদালত চাঁনমিয়াকে মৃত্যুদণ্ডের বদলে ২০ বছর সাজার রায় ঘোষণা করেন এবং অপর দুই ভাইয়ের যাবজ্জীবন থেকে কমিয়ে প্রত্যেকের ১০ বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। এই রায় ঘোষণার পর আবার তারা তিন ভাই আদালতে আপিল করে। কিন্তু এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু দালাল আইনে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে তারা ঐ আপিলের শুনানীর আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যায়।

রাজাকার তিন ভাই সেদিনের ঘটনার জন্য অনুতপ্ত। সেদিন তারা ভুল করেছিল একথা অকপটে স্বীকার করলেন। খোকা মিয়া ও চাঁনমিয়া ৩৬ বছর আগের ঘটনার কথা জানতে চাইলে প্রথমে মুখ খুলতে চাননি। তারা বলেন, এতোদিন পরে এসে আমাদের আর লজ্জা দিবেন না। আমরা অনুতপ্ত সে দিনের কাজের জন্য। চাঁন মিয়া বলেন, তাদের চাচা ভুলু মণ্ডল সে সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তার মাধ্যমেই তারা তিন ভাই রাজাকারে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে ধুনট উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়নের নান্দিয়ারপাড়া গ্রামের নুরুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় তাদের কারাগারে যেতে হয়। ২৪ মাস জেলে থাকার পর বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমায় বেরিয়ে আসেন। পরে দীর্ঘ দিন বিদেশে ছিলেন। এখন তারা ছোট খাট ব্যবসা ও বাড়িতে কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ওসমান বিহারী (রাকাজার)

২৫ বছর আগে রাজাকার ওসমান বিহারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার দ্বিতীয় ঘরের সন্তানরা। অপরাধ তাদের পিতা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যা, লুটপাট ও ধর্ষণে নিয়োজিত ছিল। পাকহানাদারদের অন্যতম দোসর ছিল। বগুড়া শহরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি হত্যাযজ্ঞে মেতে ছিল এ রাজাকার। তার সন্তানরা ওসমান বিহারীকে প্রথম সারির রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে। যুদ্ধের সময় ওসমান বিহারি তার ভাতিজা আনোয়ার হোসেন ও দুই ছেলে আসলাম হোসেন ও ইকবাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে শহরে ত্রাস সৃষ্টি করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ওসমান বিহারির হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদেরও পিতার অপকর্মের ব্যাপারে বিচার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে বলেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের কথাও জানায় তার সন্তানরা। ওসমান বিহারীর কন্যা শবনম খান বলেন, "একজন যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী – এটা ভেবেই ঘৃণায় পঁচিশ বছর যাবৎ বাবার সঙ্গে আমরা কোনও সম্পর্ক রাখিনি। ৩৭ বছর পর যখন সারাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠেছে ঠিক তখন আমরা জনগণের মুখোমুখি হয়েছি বিচারের জন্য।" শবনম খান তার বাবার বিচার প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও গ্রেফতারে যদি সাংবিধানিক জটিলতা থেকেও থাকে তবে সাম্প্রতিক কালের সন্ত্রাসী হামলার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সেই যুদ্ধাপরাধী ওসমান বিহারীকে গ্রেফতার ও বিচারের কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়।'

স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও ওসমান বিহারীর মানসিকতার পরিবর্তন এতটুকু হয়নি। তিনি নিজেকে রাজাকার বা যুদ্ধপরাধী হিসেবে মানেন না, তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন মহান ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে।

মুক্তিযুদ্ধে ধুনট

'৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদারেরা জুন মাসে ধুনট আক্রমণ করে। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটে এখানে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। গ্রামের নিরীহ মানুষেরা পাকসেনাদের ভয়ে ভীত হয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাজাকারদের দৌরাত্ম্য ছিল জয়পুরহাটের মতোই। ধুনটের রাজাকাররা ভারতে গিয়ে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে আসে। সরু গ্রামটি পুরোটাই ছিল রাজাকারদের গ্রাম। রাজাকাররা ব্যক্তিগত আক্রোশে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ধরে নির্যাতন চালাত। ৪ নভেম্বর ধুনট উপজেলার রক্তাক্ত অধ্যায়। আড়

কাটিয়ার গ্রামে কালাইপাড়া ইউনিয়নে সম্মুখযুদ্ধ হয়। এতে মুক্তিসেনাদের গুলিতে ২জন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে পাকসেনাদের তাড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা পালিয়ে যায়। স্বাধীনতার কিছু আগে পাকসেনাদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে। ধুনটে শান্তিবাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি কমিটি গঠন করে। তাদের অনেকেই রাজাকারে পরিণত হয়। মুক্তিকামী শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষদের অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। হানাদারদের সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হয়ে অনেক গ্রামবাসী মৃত্যুবরণ করে। পাকসেনাদের অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামবাসীদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা। নানা জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা সারাদিনব্যাপী (৪ নভেম্বর) পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। গভীর রাত পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলে, শত্রুদের পরাজিত করে মুক্তিসেনারা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ছিল। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা তখন নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিল। রমজান মাসের ৪ রোজা চলছিল। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্থানীয় রাজাকার ও আলবদররা পাকসেনাদের গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়। পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে রাজাকারদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে হানা দেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় ২২জন মুক্তিযোদ্ধাকে আটক করে ধুনট সদরে নিয়ে যায়। ২২জন মুক্তিযোদ্ধার একজন নূরুল ইসলাম কৌশলে পাকসেনাদের কবল থেকে বেঁচে যান। ২১জন মুক্তিযোদ্ধার ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। রাতভর এ নির্যাতন চলে। পরের দিন নভেম্বরের ৫ তারিখ ভোরে ২১জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ব্রাশফয়ারে হত্যা করে একটি গর্তে লাশগুলো একসঙ্গে মাটিচাপা দেওয়া হয় জালাল মণ্ডলের জমির ওপর। এই হত্যাযজ্ঞটি কুঠিবাড়ীর গণহত্যা নামে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। ধুনটে নারীধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পাকসেনারা অল্পবয়সী সুন্দরী নারীদের ধরে নিয়ে যেত। ধুনটের অনেকেই বাধ্য হয়ে জান-মাল বাঁচানোর জন্য আলবদর ও রাজাকারের খাতায় নাম লেখায়। প্রশিক্ষণের জন্য ভারত যায়। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। ধুনটে রয়েছে রাজাকারের গ্রাম, এ গ্রামের গ্রামবাসী সব রাজাকার। সরুগ্রাম নামের রাজাকার গ্রামের রাজাকাররা প্রকাশ্য দিবালোকে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহায়তাকারীদের নানাভাবে হয়রানি করত। একবার তোজাম্মেল হক নামের একজন যুবককেও নারকেল তেল খেতে বাধ্য করে এ ছাড়া মধুপুর গ্রামের দুজন মহিলাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। দু' দিন পর মুমূর্ষু অবস্থায় ফেরত দেয়। এভাবে গ্রামের রাজাকাররা পাকসেনাদের জন্য উপঢৌকন হিসেবে নারী সংগ্রহের কাজে রত ছিল, ধুনটের বেশি নির্যাতিত ছিল হিন্দু পরিবারগুলো। একবার হানাদাররা খাবার সংগ্রহের জন্য এলাঙ্গী ইউনিয়নে ঢুকে পড়ে, যেদিন ২৬জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামবাসী ৬জন বিহারীকে নিয়ে চিকাবালা নদীর পানিতে চুবিয়ে হত্যা করে। তারাকান্দী, ফকিরপাতা ও সরুবাড়ির জনগণ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ এভাবেই নিয়েছিল।

২৬ নভেম্বর ১৯৭১ ধুনটের পাকসেনারা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তারা নিশ্চিত যে বাংলার দামাল সাহসী ছেলেরা তাদের বাঁচতে দেবে না, পাকিস্তানীরা লুকিয়ে চলে যাচ্ছিল নানা পথ ধরে।

তথ্যসূত্র : '৭১ এর বিজয়- শেখ সবুজ উদ্দিন (সম্পাদক)

তিন রাজাকারের গল্প

রাজাকার মজুর উদ্দিন ছুতার : রাজাকার মজুর উদ্দিন। পেশায় ছুতার। **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সে তার গ্রামসহ ধুনট থানার অন্য গ্রামগুলোয় অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ করতো। একই পরিবারে তিন জন রাজাকার ছিল। মজুরউদ্দিন ছুতারের দুই ছেলে পলান ও ইব্রাহিম বাবার মতো অত্যাচারী ও নিপীড়নকারী ছিল। তাদের ভয়ে গ্রামের বৌ-মেয়েরা পালিয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে। গ্রামের কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিত। লুটপাট চালাত, গ্রামের লোকজন অতিষ্ঠ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই এদের নির্মমতার শিকার হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি গিয়ে কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের কখনো তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসে নির্যাতন করত। হত্যা করত, যুদ্ধ পরবর্তী সময় মজুর উদ্দিন ছুতার ও তার দুই ছেলে পলান ও ইব্রাহিমকে কুঠিবাড়িতে, যেখানে ২৬ মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে ওদের একটি গর্ত করে তাতে জীবন্ত সমাধি দেয় মুক্তিযোদ্ধারা।

আহসান আলী মুন্সী : আহসান আলী মুন্সী **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধে ধুনট থানার ত্রাসে পরিণত হয়। তার অত্যাচারে গ্রামের নিরীহ মানুষগুলোকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। নারী নির্যাতন, লুটতরাজ সহ নানা ধরনের পাশবিক অত্যাচার চালাত। রাজাকারদের নেতা ছিল আহসান আলী মুন্সী। মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হলে আহসান আলী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে এখনও জীবিত কিন্তু গ্রামে আর ফিরে আসেনি। দেশ স্বাধীন হবার পর তাকে কেউ ধুনটসহ আশে পাশে কোথাও দেখেনি। সে সরুগ্রামের অধিবাসী ছিল।

আয়েজ উদ্দিন মন্ডল : রাজাকার আয়েজ উদ্দিন মণ্ডল **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার ছিলেন পাকসেনাদের দোসর ছিল রাজাকার আলবদর ও আল শামস। ধুনট উপজেলার কালের পাড়া ইউনিয়নের 'রাজাকার গ্রাম' খ্যাত গ্রামের রাজাকার আয়েজ উদ্দিন মণ্ডল। আয়েজ উদ্দিনের তিন ছেলেও রাজাকার, ধুনট থানাসহ চারপাশের গ্রামগুলো বাপ-ছেলের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। গ্রামের মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে পাকসেনাদের হাতে তুলে দেওয়া, পাকসেনাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়াসহ নানা জঘন্য কাজ করত এরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এরা পালিয়ে বেড়ায়। আয়েজ উদ্দিন মণ্ডলের নৃশংসতা তার ও ছেলের নির্যাতনে গ্রামবাসী ছিল অতিষ্ঠ যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ধুনট উপজেলার নান্দিয়ারপাড়া গ্রামের নুরুল ইসলাম হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। আয়েজ উদ্দিনের ছেলে মফিজুর রহমান ওরফে চান মিয়া, মোখলেছুর রহমান ওরফে খোকা মিয়া ও মশিউর রহমান ওরফে লাল

মিয়া ছিল এ মামলার আসামী।

সারাদেশে ৭৫২ যুদ্ধাপরাধীর সাজা হয়েছিল তাদের মধ্যে ধুনট থানার আয়েজ উদ্দিন মণ্ডল রাজাকারের ৩ ছেলে রাজাকার চান মিয়া, খোকা মিয়া ও লাল মিয়াকে দণ্ড দেওয়া হয়। চান মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড, খোকা মিয়া ও লালমিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। উচ্চ আদালত পরে চান মিয়াকে মৃত্যুদণ্ডের বদলে ১০ বছর কারাদণ্ড দেয়।

(তথ্য : দৈনিক প্রথম আলো।

বেঁচে থাকার জন্য রাজাকার হয়েছি

(আয়েজ উদ্দিন শেখ রাজাকারের জবানবন্দি)

আমরা বয়স তখন ২৮/২৫। পড়াশোনা বেশিদূর করিনি। দশমশ্রেণী পর্যন্ত। চারদিকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। চারদিকে পাক আর্মিরা নানা ধরনের নির্যাতন চালাচ্ছে। ওই সময় দেশটা পাকিস্তানিদের দখলে ছিল। যখন দেশের মধ্যে বিপ্লব সংঘাত সৃষ্টি হলো তখন দেশ যাদের আয়ত্বে ছিল তাদের কারণে আমরা বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। আমাদের এলাকার হিন্দু পরিবারগুলো পালিয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য লড়াই করছে, ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। পাক আর্মিরা আমাদের গ্রামেসহ আশেপাশের গ্রামে অরাজকতা, লুটপাট, ও নির্যাতন শুরু করল। আমরা পরিবার পরিজন, গরু ছাগল নিয়ে এক জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার গ্রামের নাম ভরণশাহী। পাক আর্মিরা তাদের নির্যাতন বাড়িয়ে দিল। যখন শুনতাম পাক আর্মি এসেছে তখন সে যেভাবে পারতাম দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতাম। দেশের চরম অবস্থায় আমরাতো কেউই স্থিতিশীল ছিলাম না। সবার একদিকে ভয়। গ্রামগঞ্জে যারা বাস করে তাদের কোনও উপায় নাই। পাড়াগায়ে আমরা যারা বাস করি তারা পরিবারবর্গ ও মেয়েছেলে নিয়ে বাস করি। সারাদিন লুকিয়ে থাকি। সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরি। ঘরে থাকি। আবার পাক আর্মিদের কথা শুনে দৌড়ে পালাই। এরকম আর কতদিন করা যায়। এ দেশটাতো ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছিল।

পাক আর্মিরা যখন গ্রামে আসত তখন আমাদের গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা এবং যারা আর্মিদের সাথে কথাবার্তা বুঝত ও বলতে পারত তারা দেখা করার চেষ্টা করত। আর্মিরা এ সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল। তারা ঐ প্রবীণ ও অন্যান্যদের জানাল কিছু লোককে তারা রাজাকার বানাতে চায়, মুক্তিযোদ্ধা কারা তাদের খোঁজ খবর ও ধরিয়ে দেবার কাজ করার জন্য। আর্মিরা বলল, কারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের খুঁজে বের করবে রাজাকার দিয়ে। তারা আরও বলল তারা তাদের স্বার্থে একটা লোকাল বাহিনী তৈরি করবে। রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা দু' পক্ষই বাংলাদেশী। মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রোশ করেই রাজাকার তৈরি করতে পিস কমিটি গঠন করা হয়। পিস কমিটির সদস্য হলে নানা সুবিধা পাওয়া যাবে। আর্মিরা ঘোষণা দিল ও প্রচার করল কিছু সদস্য তাদের দরকার। আমি আমাদের গ্রাম বা প্রতিবেশি, গরু ছাগল, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বাঁচানোর জন্য রাজাকার হতে আগ্রহী হলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়। আমাদের গ্রামে যারা পিস

কমিটির সদস্য ছিল তাদের কথাতে জানলাম আর্মিদের সহযোগিতা না করলে, মিলেমিশে না থাকলে আমরা রক্ষা পাব না। আমাদের জান মাল রক্ষা করা যাবে না। আমরা যদি পাকিস্তানি আর্মিদের সহযোগিতা না করি তাহলে তো দেশটাকেও রক্ষা করতে পারব না। আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

মাসটা ছিল ১৯৭১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। আমরা ৮০ জন বিভিন্ন বয়সী মানুষ রাজাকার আলবদরদের ট্রেনিং এর জন্য বর্ডার সীমান্তে চলে গেলাম। চাঁনমারি, বগুড়ার পুলিশ লাইন, দিনাজপুর ও হিলির বন-জঙ্গলে আমাদের ট্রেনিং হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আমরা প্রায় তিন মাস গেরিলা ট্রেনিং নিলাম। সেনাবাহিনীতে যে রকম যুদ্ধ কৌশল শোখানো হয় তেমন সব ধরনের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম। বনে জঙ্গলে গায়ে লতা পাতা জড়িয়ে লুকিয়ে থেকে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয় এবং আকাশে উড়ন্ত বিমান গেলে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় তা আমাদের শেখানো হয়। আমাদের ট্রেনিং দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। আমাদের প্রাথমিক ট্রেনিংটা হয় চাঁনমারিতে। তিনমাসের ট্রেনিং শেষে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম বিভিন্ন জায়গায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনও মানুষের অনিষ্ট করিনি। মানুষকে নির্যাতন, ধর-পাকড়, বা মারামারি এগুলো কোনটাই আমি করিনি। আমাদের অনেকেই নিরীহ মানুষদের নানা হয়রানি করেছে। আমি বাঁচার তাগিদে ও পরিবার রক্ষার জন্য রাজাকার হয়েছি। পরিবারবর্গ যাতে রক্ষা পায় তার জন্য পাকিস্তানি আর্মিদের সহায়তা করেছি। অন্যায় বা অনিষ্ট করার জন্য রাজাকার হইনি। পাকিস্তানিদের বশ্যতার শিকার হয়েছি। আমার সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের অনেকেই রাজাকার হয়েছে। তারা নিরীহ মানুষদের অনেক ক্ষতি করেছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নিরীহ জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা সব রাজাকারদের নির্মম শাস্তি দিয়েছে। আমার সঙ্গি কয়েকজন সরুগ্রামের লালমিয়া, চান মিয়া, খোকামিয়া, শাহাবুদ্দিন, মুজিবর, মন্তাজ এরাসহ অনেকেই রাজাকার ছিল।

দেশ যখন মুক্ত হলো, স্বাধীন হলো তখন আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি। রাজাকারদের যারা পেত তারাই কঠিন শাস্তি দিত। তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। আমাদের ব্যাপারটা অনেকেই বুঝতে চাইত না। এ ব্যাখ্যাটা হয়তো যারা শুনবে তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন কথা বলবে। পিস কমিটির যারা সদস্য ছিল তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারেনি। সঙ্গি-সাথিদের অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসিদের আক্রোশের শিকার হয়েছে। রাজাকারদের গুলি করে, ব্রাশ ফায়ার বা চাকু দিয়ে কেটে লবণ লাগিয়ে হত্যা করেছে।

ধুনট থানার এলাঙ্গীর, শৈলমারী গ্রামের লালুমিয়ার ছেলে মনতাজকে দেশ স্বাধীন হবার পর বিলচাপড়ী ঘাট এলাকায় বালির মধ্যে মাঝামাঝি পর্যন্ত (কোমর পর্যন্ত) পুতে রেখে ব্লেড দিয়ে শরীরের বিভিন্নস্থান কেটে তাতে লবণ লাগিয়ে রাখত। মনতাজ রাজাকারকে এভাবে ৪/৫ দিন নির্যাতনের পর হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধারা।

পাকড়ীহাটার মুজিবরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এভাবে অনেকে যেমন মারা যায় তেমনি বেঁচে যায় অনেকেই। আমার মতো অনেক রাজাকারই বেঁচে আছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। মুজিব সরকার যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তখন আমার মতো অনেক রাজাকার আলবদর বেরিয়ে আসে জনসম্মুখে। আমি বিয়ে করেছি। বিয়ে করতে

সমস্যা হয়নি এ কারণে। সবাই ক্ষমা করেছে। আমার একমাত্র ছেলে, সে জানে না আমি রাজাকার। এ প্রজন্ম এমনই, মুক্তিযুদ্ধকে জানে না। জানতে চায় না।

সাক্ষাৎকার ধুনট থানার পূর্ব ভরনশাহী গ্রামের মৃত গোমর উদ্দিনের ছেলে আয়েজ উদ্দিন শেখ।(তার অগোছালোভাবে বলা কথাগুলো পুরোটাই অবিকৃত রেখে লেখার ও বোঝার স্বার্থে গুছিয়ে লেখা হয়েছে।

ধুনট বধ্যভূমি

২১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দাঁড় করিয়ে হত্যা (ধুনট)

১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর পাকসেনারা রাজাকারদের সহযোগিতায় বগুড়ার ধুনট উপজেলার ২১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে একসঙ্গে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে মানসিক নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করে। পরাধীন দেশকে শত্রুর হানা থেকে রক্ষা করতে মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশের মতো ধুনট উপজেলাকেও মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়। যুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। মুক্তিসেনারা পাকসেনাদের হটাতে ব্যস্ত। এমন সময় ৪ নভেম্বর সারাদিনব্যাপী পাকসেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। গভীররাত পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলে, শত্রুদের পরাজিত করে মুক্তিযোদ্ধারা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত মন নিয়ে জয়ের আনন্দে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে বিশ্রাম করছিল। তখন রমজান মাস ‘ ৪ রমজান’ সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্থানীয় রাজাকার আলবদররা গোপনে তা জানতে পেরে পাকসেনাদের একটি দলকে নিয়ে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি ঘেরাও করে। ঘুমন্ত অবস্থায় ২২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আটক করে ধুনট সদরে নিয়ে যায়। ২২ জন মুক্তিযোদ্ধার একজন শিয়ালী গ্রামের নূরুল ইসলাম পাকসেনাদের কবল থেকে কৌশলে পালিয়ে যান। অন্য ২১ জনের উপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। রাতভর এ নির্যাতন-নিপীড়ন চলতে থাকে। পরের দিন ৫ নভেম্বর ভোরে ২১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে একটি গর্তে লাশগুলো একসঙ্গে মাটি চাপা দেওয়া হয়। থানার পূর্বপাশে মুক্তিযোদ্ধারা এভাবেই নৃশংসতার শিকার হয়। ধুনটের অফিসার পাড়ায় গণকবরে চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদদের ১৪ জনের নাম-ঠিকানা আজও পাওয়া যায়নি। ধুনট সদরের জালাল মণ্ডলের জমির ওপর এই একুশজনকে হত্যা করা হয়।

ধুনটের বধ্যভূমিতে যারা শায়িত আছেন

২১ জন মুক্তিযোদ্ধার কয়েকজনের নামের তালিকা

১। জহির উদ্দিন – অফিসার পাড়া (ধুনট)
২। নয়া মিয়া – কান্ত নগর
৩। আব্দুল লতিফ – চান্দার পাড়া
৪। পর্বত আলী – শিয়ালা

৫। জিল্লুর রহমান সহোদর – শিয়ালা।

৬। ফরহাদ আলী

৭। মোস্তাফিজার রহমান – কান্ত নগর

অন্য ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধার কোনও নাম-পরিচয় জানা যায় নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে মুক্তিযোদ্বারা যুদ্ধ করেছিল এখানে। তাই

৮। ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় – অজ্ঞাত।

বগুড়ায় পাকবাহিনীর গণহত্যা

বগুড়ার পীর পরিবারের শহীদ ৭ সন্তানসহ ১১ জন হত্যা রামশহর

১০৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সোনাবাহিনীর কাছে বাংলাদেশের মু১২২ক্তিযোদ্ধারা ছিল বিষাক্ত বর্শার অযুত ফলার মতো। সাধারণ জনতাও সাধারণ পরিবার রেহাই পায়নি হানাদার পাকবাহিনীর হাত থেকে। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন একটি পরিবার যার একই পরিবারের ১১ জনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

বগুড়া শহর থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরে গোকুল ইউনিয়নে অবস্থিত রামশহর গ্রামটি। এ গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবার হলো বিখ্যাত সুফী ডা. ক্বাহরুল্লাহ্ পীর সাহেবের পরিবার। এই পীর পরিবারের উপরই হামলে পরে হানাদার পাকবাহিনী ও রাজাকাররা। আলবদরদের সহায়তায় এ বাড়িতে হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা। ঘুমন্ত যুবক আব্দুল সালাম লালু, টাইফয়েডের রোগী ও স্কুল শিক্ষক দবিরউদ্দিন (৪৭) ও ৮ম শ্রেণী পড় য়া ছাত্র জাহিদুর রহমান মুকুল (১৫) সহ পীর পরিবারের ৭ সদস্যকে এবং ঐ গ্রামের আরও ৪ জনসহ মোট এগারজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭১ এর সেই দিনটি ছিল নভেম্বরের ১৩ তারিখ। বাংলায় ২৬ কার্তিক 'আর হিজরির ২৩ রমজান' এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে সেদিন ঘটনাক্রমে বেঁচে যাওয়া পীরজাদা তবিবুর রহমান আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। হানাদাররা যে সময় তাদের বাড়ি ঘেরাও করে সেসময় তিনিসহ অন্যান্যরা বাড়িতে সেহেরি খাওয়ার আয়োজন করছিলেন। অনেকে সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। এমন সময় বুটের ভারী শব্দ। প্রথমে মনে হয়েছিল তাদের বাড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে যারা তারা এসেছে। জিল্লুর রহমান জলিল, মাকসুদুর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন জিন্নাহ হয়তো সঙ্গীদের নিয়ে এসেছে খাবার খাওয়ার জন্য। যুদ্ধে যাবার কারণে প্রায়ই তারা এমন সময় আসতেন। কিন্তু বাড়িতে অবস্থানরত লোকদের ভুল ভাঙে নিমেষেই, যখন ঘরের দরজার কাছে চলে আসে হানাদার পাকবাহিনী। তিনি ভয়ে বাড়ির প্রাচীর টপকে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতে পিছন থেকে হাঁক শোনা যায়। "এই ঠায়রো" – এভাবে ডাকতে থাকে হানাদারেরা। তবিবুর রহমান বলেন, ভীত হতাম না – যদি তারা আমার ভাই হাবিবুর রহমানকে পিছমোড়া করে বেঁধে না ফেলত। তাকে বাঁধতে দেখে ভয়ে দৌড়ে প্রাচীর টপকাতে গেলে তাকে লক্ষ করে হানাদারেরা (তবিবুর রহমানকে) গুলি করে। প্রাচীরের

পিছনে ছিল একটি কলাগাছ। সেই কলাগাছ ধরেই দ্রুত নেমে যাওয়ায় গুলি গিয়ে কলাগাছে বিদ্ধ হয়। হাবিবুর রহমান হত্যা করে পাকহানাদাররা যখন চলে যায় তখন কলাগাছের সঙ্গে তবিবুর রহমানকে নিজের উচ্চতার মাপ দিয়ে দেখেছেন, হত্যাকাণ্ডের সময় ভয়ে দ্রুত না নামলে তার মাথার খুলি উড়ে যেতো সেদিন।

'৭১ নভেম্বরের সেই ভয়াল রাতে কারবালার প্রান্তরের মতো পীর বাড়িতে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে হানাদার ও রাজাকাররা। সেদিন সেই বাড়িতে নিহত হন তবিবুর রহমানের আপন দুই ভাই পীরজাদা শহীদ বেলায়েত হোসেন, শহীদ দবিরউদ্দিন ও শহীদ হাবিবুর রহমান। এছাড়া তবিবুর রহমানের ভাতিজা আব্দুল সালাম লালু, খলিলুর রহমান ও জাহিদুর রহমান মুকুল এবং তার ফুফাতো ভাই রংপুরের আসগর আলীও সেদিন শহীদ হন। পীরবাড়ির হত্যাযজ্ঞের পর একই দিনে হানাদার পাক সেনারা এই গ্রামের মুজিবুর রহমান, হায়দার আলী, বুলু মিয়া এবং একই গ্রামের জামাতা মকছেদ আলীকে তুলে এনে পিছমোড়া করে বেঁধে বসিয়ে রেখে একই সঙ্গে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে পীরবাড়ির শহীদ জননী আমেনা বেগম কান্নায় আপ্লুত হয়ে বলেছেন সেদিনের ঘটে যাওয়া নির্মম কাহিনীর কথা। তার ৫ ছেলের মধ্যে জাহিদুর রহমান মুকুল ছিল অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের। লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। ভালো ছাত্র হিসেবে সুনাম ছিল তার। যুদ্ধের সময় তার কোল থেকে হারিয়ে যাওয়া মুকুলের শেষচিহ্ন বলতে আছে কেবল ১৯৭১ সালেরও ৭ বছর আগে তোলা একটি ছবি। মা কাঁদেন নীরবে আর কেউ মুকুল সম্পর্কে জানতে চাইলে ছবি দেখান। স্বামী বিলায়েত হোসেনকেও হারিয়েছেন একই সময়ে। স্বামীর শেষ চিহ্ন রক্ত মাখা চাদর আর জামা। একই প্রাচীর ঘেরা পীরবাড়ির মধ্যে ভাগী-শরীকরা বাস করলেও প্রতিটি পরিবার ছিল আলাদা। প্রতি বাড়ির গৃহকর্তা ব্যবহারের সুবিধার জন্য ব্যবহার করত ভিন্ন ভিন্ন দরজা। রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে সেদিন সেহেরি খাবার সময় তাদের বাড়ীর দরজা দিয়ে হানাদার পাক সেনারা প্রবেশ করে। হানাদার পাকসেনাদের সঙ্গে ছিল বোরকা পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তি। তারা প্রত্যেক ঘরের সদস্যদের নাম বলে পাকসেনাদের বাড়িগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিল। বিলায়েত হোসেন তখন সেহেরি খাচ্ছিল। পাকসেনাদের হৈ-চৈ এ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে রাখেন। স্বামীর এ অবস্থা দেখে আমেনা বেগম তাকে পালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু ভাইকে বেঁধে ফেলায় তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একসময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতে বলেন বিলায়েত। মুকুল তার বালক সুলভ চঞ্চলতায় বাইরের কোলাহল দেখতে ঘরের দরজা ফাঁকা করে। এমনটা সে বার কয়েক করলে একজন পাকসেনা দরজা বরাবর গুলি করে। গুলির শব্দে ভীত হয়ে মুকুল মাটিতে পড়ে যায়। সে সময় মুকুল গুলিবিদ্ধ হয় নি। গুলিটি ঘরের দরজায় বিদ্ধ হয়। মুকুল ভয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে। মুকুলের মা আমেনা বেগম তার ছোট ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ে। বেলায়েত হোসেন হঠাৎ প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। মিলিটারিদের উদ্দেশ্য বলতে থাকে তারা নির্দোষ। তাদের কেন ধরবে, ছেড়ে দেয়া হোক। এমন সময় একজন পাক অফিসারের নির্দেশে পাকসেনারা এসে অন্যদের সঙ্গে

তাকেও বেঁধে ফেলে। এ সময় মুকুলও তার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পাকসেনারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওকেও বেঁধে ফেলে। লালুর ঘরের দরজা তখনো বন্ধ ছিল। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরও সে বাইরে বেরিয়ে না আসায় পাক হানাদারেরা রাজাকারদের সহায়তায় ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে। লালু পাকসেনাদের ভয়ে বিছানায় চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। লালুকে টেনে তোলা হয়। বিছানা তল্লাশী চালায় পাকসেনারা। খুঁজে পাওয়া যায় একটি বড় ছোরা, পাকসেনারা সেই ছোরা দিয়েই খোঁচাতে শুরু করে লালুকে। নভেম্বরের শেষ রাতে লালুর গগণবিদারী চিৎকারে গ্রামবাসীরা জেগে ওঠে। আহত রক্তাক্ত লালুকেও এনে বসানো হয় বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে। পীর বাড়ির যে সকল পুরুষ বর্তমান ছিল তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। মজিবর, হায়দার, বুলু ও মকছেদকে গ্রামের অন্য বাড়িগুলো থেকে ধরে আনা হয়। রাত শেষ হয়ে আসে। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। বন্দি পুরুষদের সারিবদ্ধভাবে পীর সাহেবের পুকুর পাড়ে পূর্বমুখী করে বসিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে পাকসেনারা। চলতে থাকে পীর বাড়িতে লুটতরাজ, রাজাকাররা প্রতিটি ঘর তল্লাশী করে সোনাদানা, টাকা পয়সাসহ বিভিন্ন দামী জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

পীরবাড়ির হত্যাযজ্ঞের কয়েকদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক চিহ্নিত রাজাকারকে মুক্তিসেনারা হত্যা করে। কথিত আছে এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে পীর বাড়িতে ১১ জনের হত্যাকাণ্ড ঘটায় রাজাকাররা, পাকসেনাদের সহযোগিতায়। পীর বাড়ির সকল সন্তানই ছিলেন শিক্ষিত। পীরবাড়ি হলেও কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল না। সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাই দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলিল, ঠাণ্ডু ও জিন্নাহ। ঘটনার রাতে চিহ্নিত রাজাকার মতি (মুক্তিযোদ্ধারা যাকে পরে হত্যা করে) ও তাহের মওলানা বোরখা পরে এসে পাকসেনাদের বাড়ীতে ঢুকতে ও হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সহায়তা করে। মুখরিত বাড়িটি প্রাণবন্ত ছিল। '৭১ এর করাল গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে সেই সজীবতা।

সাক্ষাৎকার শহীদ খলিলের ছোটভাই, আমিনুর রহমান, আত্মীয় ও মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জেল হোসেন। শহীদ জননী ও স্ত্রী আমেনা বেগম।

এস. পির বাগান বধ্যভূমি

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার ইতিহাসে রয়েছে রক্তাক্ত অধ্যায়। হানাদার পাকসেনারা এখানে চালিয়েছে হত্যাযজ্ঞ। শহরে এবং শহরের বাইরে গড়ে উঠেছে তাদের হত্যাযজ্ঞের নিত্য-নতুন ঠিকানা। বগুড়া শহরের পশ্চিম দিকে হানাদাররা বগুড়া কলেজের সামনে ৯ বিঘার ওপর গড়ে ওঠা ফলজ ও বনজ বাগানে হানাদাররা সংঘটিত করে তাদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। বাগানটির মালিক ছিলেন আকবর আলী সরকার নামক একজন এস.পি.। বাগানের একদিকে একটি মাটির ঘর ছিল। সামনে পাতকুঁয়া। কাছেই কলেজ থাকাতে বেশ কয়েকজন ছাত্র এই ঘরটিকে মেস হিসেবে ব্যবহার করত। এস.পির বাগানটি আশেপাশের মানুষের কাছে গাঙ্গুলি বাগান নামে পরিচিত ছিল। ছাত্ররা এই পাতকুয়ার পানি পান করত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাচালে হানাদারেরা এস.পির বাগানে একটি ক্যাম্প গড়ে তোলে। এখানে পাক হানাদারেরা গোলাবারুদ ও খাদ্যের রসদ রাখত। শহর থেকে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গা ছিল সেউজ গাড়ি। বাগানটি শহরের উপকণ্ঠে থাকায় জনসাধারণ খুব একটা যেত না গাঙ্গুলি বাগান বা এস.পি'র বাগানে। যাতায়াতের জন্য ছোট্ট একটি লোহার দরজা ছিল। ছেলে মেয়েরা ওটা ব্যবহার করত। চারপাশটা ঘেরা ছিল। তাই বাগনটা নিরাপদ ও নির্জন। যুদ্ধ শুরু হলে মেসের ছেলেরা পালিয়ে যায়। পাকসেনারা তাদের ঘাঁটিটা আরও মজবুত করে। রাজাকারদের সহায়তায় নিরীহ মানুষদের এখানে ধরে এনে মাটির ঘরটিতে হত্যা করত। মৃতদেহগুলো তারপর পাতকুঁয়ায় ফেলে দিত। নিরীহ মানুষ জবাই করা ছিল তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। জায়গাটা ছিল বিহারী অধ্যুষিত। যুদ্ধের সময় এরা নিষ্ঠুর ও নৃশংস ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ছোট বড় কেউই এদের থেকে রেহাই পায়নি।

কূপের পাশের মাটির ঘরটির মেঝে-দেয়ালে রক্তের দাগ থাকত। মানুষ হত্যা করার সময় নানা রকম চিৎকার ভেসে আসত বাগান থেকে। বাগানের পশ্চিম দিকে ছিল সাধুর আশ্রম। সেখানকার আলামত (গুরুর প্রথম আস্তানা ছিল) দেখিয়ে একজন সাধুবাবা বলেন, 'প্রায় প্রতিদিনই করুণ কান্নার আওয়াজ আমি শুনেছি। একদিন এক ছোট শিশু, বাবা–মা, বাঁচাও-বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। ঐ ছেলেটিকে জবাই করে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। বাগানের ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মানুষের রক্তের ছাপ আর জাঙ্গিয়া, প্যান্ট, শাড়ি, ব্লাউজ দেখেছি আমি। বললেন এলাকাবাসির একজন ফাতেমা বেগম।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির মনোবল ভাঙতে এবং ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে হত্যাকাণ্ডের এক জঘন্য ইতিহাস তৈরি করে পাক হানাদার বাহিনী বিহারী রাজাকারদের সহায়তায়। হাজার হাজার বাঙালির লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এলাকার লোক প্রত্যক্ষ করেছে কুয়ায় অসংখ্য হাতগোড় আর মাথার খুলি। কত নিরপরাধ, নিষ্পাপ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধা যে এখানে নরখাদকদের লালসার শিকার হয়েছে তার ইয়াত্তা নাই।

সাধুর আশ্রম

বগুড়া শহরের অতি প্রাচীন ও সবার পরিচিত আশ্রম, সাধুর আশ্রম নামে পরিচিত ছিল। বগুড়ার সেউজগাড়ি আনন্দ আশ্রম। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাক বাহিনী এই আশ্রমে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ আশ্রমের ৩ জন সাধুকে' বগুড়া রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে তৎকালীন ডিগ্রি কলেজের রাস্তার পাশে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পাকহানাদারদের জঘন্য নৃশংসতার এক নজীরবিহীন উদাহরণ এই আশ্রমটি। ১৯৭১ সালের পাক হানাদার বাহিনী বগুড়া দখল করার পরও আশ্রমের অনেক সাধু ও মাতা প্রাণভয়ে পালিয়ে যান। অনেকে আবার থেকেও যান। আশ্রমে তখন চারজন সাধু ও তিনজন মাতা ছিলেন। হানাদারবাহিনী তিনজন সাধুকে বগুড়া রেলষ্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজের রাস্তার পাশে গুলি করে হত্যা করে। সাধুরা হলেন সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু ও বাদুড়তলার একজন সাধু বৃদ্ধ মুনেন্দ্রনাথ সরকার। আশ্রমের সবচেয়ে বয়স্ক সাধু যুগল কিশোরকে পাকহানাদারেরা হত্যা করেনি। ঐ তিনজন সাধু ছিল যুগল কিশোরের তিন ভাই। সাধুরা যখন খেতে বসেছিল হঠাৎ আশ্রমের বাড়ির ভেতর ঢুকল কয়েকজন অবাঙ্গালি। তারা এসেই ভাইদের হাত বেঁধে ফেলে। বৃদ্ধ যুগল কিশোরের কাকুতি জেগে ওঠে, ওদের মেরো না আমাকে নিয়ে যাও।' পাকহানাদারেরা সে কথায় কর্ণপাত করেনি। তিন সাধুকে নিয়ে যায় শত্রুরা তখন পরে বৃদ্ধ সাধু শুনেছে তিন ভাইকে রাস্তার ধারের গর্তে পুতে রাখা হয়েছে। সাধু ও সাধুমাতারা আশ্রম ছাড়তে চায়নি। তাদের ধারণা ছিল পূণ্যস্থানে শত্রুরা কখনও আক্রমণ করবে না। কিন্তু পিশাচ হানাদার ও তাদের দোসররা কোনও কিছু মানেনি। কাউকে রক্ষা করেনি। মাঝে মাঝে পাকসেনারা এসে নানারকম অন্যায়-অত্যাচার করত। খাবার দাবার নিয়ে যেত, আশ্রমের বাসনপত্রও নিয়ে যেত, কখনও টাকা-পয়সা নিয়ে যেত। টাকা-পয়সা না দিতে চাইলে বড় ছোরা দিয়ে ভয় দেখাত, মারধর করত। একদিন পাকসেনারা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছে। যুগল কিশোরকে নিয়ে যায় ওখানে পাতকুঁয়ার সামনে। বলে বুড্ডা তুম কালেমা পড়।'- মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় বৃদ্ধ সাধু। ঐ কুয়ায় প্রায় প্রতিদিনই করুণ কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। হঠাৎ সব নীরব হয়ে যায়।

যুদ্ধের সময় ভিক্ষাবৃত্তির পেশা নিয়েছিল সাধুরা। না খেয়ে কষ্টেও দিন কেটেছে তাদের। পাকসেনারা তার জমানো পাঁচশত টাকা জোর করে নিয়ে গেছে। মেরে খাবার ছিনিয়ে নিয়েছে হানাদারেরা। সেউজগাড়ির এ আশ্রমের মতো বগুড়ার অনেক ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোও পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্তি পায়নি।

তথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম।

এস.ডিও'র বাংলো বধ্যভূমি

বগুড়া রেলস্টেশনের এস. ডিও'র বাংলোটা সম্পূর্ণভাবে সামরিক দস্যুদের হাতে ছিল। এ বাড়ির দোতলাটি পাকসেনারা ব্যবহার করত কসাইখানা হিসেবে। সাধারণ মানুষকে

রাজাকার ও পাকসেনারা ধরে আনত। তারপর তাদের জবাই করে হত্যা করা হতো। বাংলো সংলগ্ন একটা বড় কূপ ছিল। মানুষ হত্যার পর মৃতদেহগুলো ঐ কূপে ফেলে দেওয়া হতো। তবে বাড়িটার আউট কিচেনে সবচেয়ে বেশি নরহত্যা হতো কারণ কিচেন থেকে কূপটির দূরত্ব ছিল মাত্র ২০ গজ। ঘাস আর জংগলে পূর্ণ এ বাড়িটিতে পাকসেনারা ও তাদের দোসররা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ পেত। নিরীহ মানুষদের আর্তচিৎকার বাড়িটির বাইরে পৌঁছাত না। বগুড়া রেলস্টেশনের সুইপার দাশীন (৭০) বর্ণনা দিলেন সেই দিনকার নরমেধ হত্যাযজ্ঞের। এই বৃদ্ধ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসের ৭টি মাসই কটিয়েছেন হানাদার পাকসেনাদের হত্যা করা লাশগুলো নিয়ে। তিনি S. D. O. র বাংলার হত্যাযজ্ঞের একজন নীরব সাক্ষী। তিনি বলেন, 'আমি পূর্বে আরও মোটাসোটা ছিলাম। আমি লাল টকটকে ছিলাম। কিন্তু বগুড়া স্টেশনের আশেপাশের বাঙালি ভাইদের রক্ত দেখে দেখে আমি খুব রোগা হয়ে গেছি। আমার শরীরে আগের মতো মাংস নাই। একজন মানুষ শত রক্ত মাখা লাশ সরালে আর কি করে বাঁচার আশা রাখে।' দাশীন আরও বলেন, 'আমার হাতেই কমপক্ষে চারশত–পাঁচশত লাশ এই কুয়ায় ফেলেছি। জল্লাদরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো, আমি কি করি। আমি লাশগুলো পুঁতে রাখতে চাইতাম কিন্তু ওরা দেয় নাই। ওরা আমাকে বলতো, 'তু শালা হিন্দু হ্যায়'। পাকসেনারা তাদের দোসরদের সহায়তায় নিরীহ বাঙালিকে ধরে এনে হাত বেঁধে মুখের ভেতর কাপড় ঢুকিয়ে দিত। তারপর তাদের পেটে চাকু ঢুকিয়ে বা জবাই করে হত্যা করত । অনেককে আবার পিছন দিক থেকে ঘাড়ে ছোরা বসিয়ে জবাই করত। তাদের কাউকে কাউকে আবার নানা নির্যাতন করে হত্যা করত। নিরীহ মানুষদের অনুরোধ, কান্নাকাটি কিছুতেই মন গলত না পাকসেনাদের। এস. ডিও'র বাংলোর দোতলা ঘরটি ছিল বর্বরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ঘরটিতে এত নরবলি হয়েছে যে এ ঘরটির দেয়াল ও মেঝেতে ছিল রক্তজমাট। রক্ত জমতে জমতে এতটাই শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোদাল দিয়ে মাটি কাটার মতো করে রক্তগুলো পরিষ্কার করতে হয়েছে। রক্ত দিয়ে হোলি খেলার জন্যই বোধহয় নরপশুরা এমনটি করত। রেলস্টেশন ও S.D.O র বাংলোর আশেপাশে নিরীহ মানুষদের অগণিত লাশ নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর বহন করেছে সে সময়। রেলস্টেশনের পাশের পার্ক রোড সংলগ্ন একটি ড্রেনে বাঙালিদের হত্যা করে ফেলে রাখা হত। S.D.O র বাংলোর পূর্বদিকের মাঠটায়ও অনেক নিরীহ মানুষের লাশ পুঁতে রাখা আছে। এই বাংলোতে প্রতিটি ঘরের দেয়াল ও মেঝেতে মানুষের রক্তে ভেজা কাপড়-জামাসহ ব্যবহার্য অন্যান্য উপকরণ রক্তে লাল হয়েছিল। বগুড়া শত্রুমুক্ত হবার আগ পর্যন্ত S.D.O র বাংলোতে কোনও দেশপ্রেমী বাঙালি তথা মুক্তিসেনারা প্রবেশ করতে পারেনি।

বগুড়া রেলস্টেশন : জল্লাদের কসাইখানা বধ্যভূমি

বাঙালিরা ছিল পাকসেনাদের শত্রু। সাধারণ জনতার ওপর এরা চালাতো অমানুষিক নির্যাতন। নিরীহ বাঙালিদের এরা হত্যা করত নির্বিচারে। সাধারণ মানুষ ও রেলকর্মচারীদের দিয়ে হানাদার পাকসেনারা নানা কাজ করাত। কাজ শেষ হলে মেরে

ফেলতে দ্বিধা করত না। কোনও লোক যদি রেলস্টেশনের আশেপাশে আসত তাকেই তারা হত্যা করত। একদিন একজন নিরীহ বাঙালিকে কয়েকজন পাকসেনা তাদের মালপত্র বহন করে ট্রেনে উঠাতে নির্দেশ দেয়। তারপর সেই ব্যক্তিকে নিয়ে শুরু হয় অত্যাচার। একজন পাকসেনা লোকটিকে ওয়াগনের পিছনে নিয়ে যায়। লোকটির দু'পা সমান করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে তাকে বসে থাকতে বাধ্য করে। এক পর্যায়ে তাকে নিয়ে শুরু হয় পাশবিক খেলা। একজন পাকসেনা প্রথমে লোকটির পিঠের ওপর দাঁড়ায়। জোরে চলতে থাকে ব্যক্তিটির ওপর দাড়ানোর প্রতিযোগিতা। জীবন্ত মানুষটির হাড়গুলো ভেঙ্গে দেয়। লোকটির আর্তচিৎকারের কোনো মূল্যই দেয়নি হানাদারেরা। মুমূর্ষ লোকটিকে পাকসেনারা এরপর হত্যা করে। কোনো নিরীহ ব্যক্তি যদি বগুড়া রেলস্টেশনে বা রেলগাড়িতে চড়তে চাইতো এবং কোনো পাকসেনা যদি সেখানে উপস্থিত থাকত তবে সেই নিরীহ ব্যক্তিটির ওপর চলত হত্যা ও নির্যাতন। নিরীহ মানুষদের ধরে ধরে হত্যা করা হতো। পাকহানাদাররা রেলওয়ে কর্মচারীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল রাজাকারদের সহায়তায়। বগুড়া রেলস্টেশনের আশেপাশে তখন রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছিল হানাদারেরা। এসম্পর্কে মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম পিএসসি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বইটির বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উল্লেখ করেছেন এক লোমহর্ষক ঘটনা– রেলওয়ের একজন পদস্থ বাঙালিকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন হানাদার পাকসেনাদের নির্মমতা সম্পর্কে– "জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ওরা কিছু বলে নাই? উত্তরে তিনি বললেন, "বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বাঙালি কর্মচারীদের ওরা ক্ষমা করে নাই। যারা সরতে পারে নাই তাদের মৃত্যু ছিল ওদের হাতে।" প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, "একদিন মেজর জাকী সামরিক হেডকোয়ার্টারে আমাকে ডাকলো। তারপর পাশের রুম থেকে রক্তমাখা কাপড় পরিহিত একজন বাঙালিকে ডেকে আনা হলো। তার হাত বাঁধা ছিল এবং মুখ ছিল রুমাল দিয়ে বাঁধা। আমাকে মেজর বললো, একে দেখো। এরপর কড়া মেজাজে হুকুম হলো, আভি তোম যাও। আমি মেজর জাকীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রক্তমাখা ভাইটি বেঁচে আছে কিনা জানি না। শেষের দিকে (বগুড়া ছাড়ার পূর্বে) ওরা রেলওয়ে কর্মচারীদের হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। রেলস্টেশনের আশেপাশের নিরীহ বাঙ্গালিদের হত্যা করেও ওদের রক্ত পানের তৃষ্ণা এখনও মেটেনি। বগুড়া ছাড়ার পূর্বে ওদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু রেলস্টেশনের বধ্যভূমিতে হারিয়ে যাওয়া ভাইরা আর আসবে না। রেলস্টেশনের সুইপার দাশীন (৭০) জমাদার সতর্কতার ইঙ্গিত দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধের ৭টি মাস কেটে গেছে স্টেশনের আশেপাশে মৃত বাঙালিদের কবর দিতেই।"

তথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম পিএস. সি।

বগুড়া রেলস্টেশনে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করার পর মাটিচাপা দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল শুক্রবার রেলস্টেশনের রেল কলোনির পুকুর পাড়ে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানিরা গুলি করে হত্যা করে। তাদের নামের তালিকা

১। মো. আব্দুল সাত্তার, বি. এ. এল. এল. বি

২। মো. আব্দুল কাদের (আলিম)

৩। আব্দুল সালাম (আই. কম)
৪। আব্দুল গনি (রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক অডির্টর কো-অপারেটিভ)
৫। মো. মতিন সুজা
৬। পরিচয় পাওয়া যায়নি (অজ্ঞাত)
৭। পরিচয় পাওয়া যায়নি (অজ্ঞাত)

১৯৭১ ইং সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিভিন্নভাবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের তালিকা

১। সর্বাধিনায়ক – জেনারেল এম, এ, জি, ওসমানী
২। চিফ অব স্টাফ – মোহাম্মদ আব্দুর রব
৩। সহ- চিফ অব স্টাফ – এম,এন, এম, নূরুজ্জামান
৪। চিফ অব স্টাফ – এ, টি, এম, হায়দার আলী

সেক্টর কমান্ডারদের তালিকা-

১। মেজর জিয়াউর রহমান/ মেজর রফিকুল ইসলাম
২। মেজর খালেদ মোশারফ/ আবু ছালেক চৌধুরী
৩। মেজর কে,এম, শফিউল্লাহ/ মেজর এম,এন,এম, নূরুজ্জামান
৪। মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত (সি, আর দত্ত)
৫। মেজর মীর শওকত আলী
৬। উইং কমান্ডার এম, কে, বাশার
৭। লে, কর্নেল কাজী নূর উজ্জামান
৮। মেজর আবুল মঞ্জুর/ আবু ওছমান চৌধুরী
৯। মেজর আব্দুল জলিল
১০। নৌ-কমান্ডের অধিনে ছিল।
১১। মেজর আবু তাহের/ স্কোয়াড্রন লিডর এম, হামিদুল্লাহ খান।

দেশের অভ্যন্তরে গঠিত বাহিনী ও দল–

১। আব্দুল কাদের ছিদ্দিকী – কাদেরীয়া বাহিনী
২। সুবেদার হেমায়েত উদ্দিন – হেমায়েত বাহিনী
৩। ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী – হালিম বাহিনী
৪। আফসার উদ্দিনের দল
৫। সুবেদার লুৎফর রহমানের দল
৬। সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের দল

৭। হাবিলদার গিয়াস উদ্দিনের দল
৮। সুবেদার আফতার উদ্দিনের দল
৯। আকবর হোসেনের দল
১০। নেভাল সিরাজ উদ্দিনের দল
১১। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার দল

মুজিব বাহিনী (বি, এল, এফ)

১। জনাব তোফায়েল আহম্মদ – অধিনায়ক পশ্চিমাঞ্চল
জনাব নুরে আলম জিকু – সহ. অধিনায়ক পশ্চিমাঞ্চল
জনাব কাজী আরেফ আহমেদ – সহ. অধিনায়ক পশ্চিমাঞ্চল
২। জনাব সিরাজুল আলম খান– অধিনায়ক উত্তরাঞ্চল
জনাব মনিরুল ইসলাম – সহ. অধিনায়ক উত্তরাঞ্চল
৩। জনাব আব্দুর রাজ্জাক – অধিনায়ক ঢালু অঞ্চল
জনাব সৈয়দ আহম্মেদ – সহ. অধিনায়ক ঢালু অঞ্চল
৪। জনাব শেখ ফজলুল হক মনি – অধিনায়ক পূর্বাঞ্চল
জনাব সৈয়দ রেজাউর রহমান – সহ. অধিনায়ক পূর্বাঞ্চল
জনাব আ, স, ম, আব্দর রব – সহ. অধিনায়ক পূর্বাঞ্চল
জনাব আব্দুল কুদ্দুছ মাখন – সহ. অধিনায়ক পূর্বাঞ্চল

দেশের মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা

১। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, ই, পি, আর, পুলিশ, আনছার, মোজাহিদ, মুক্তিবাহিনী, ছাত্র-জনতা, শ্রমিক-কর্মচারী, ইয়ুথ ক্যাম্প দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ইনফরমার ও কুরিয়ার সহ = ২,৯৬,০০০/-

বগুড়ায় বিভিন্ন সময়ে গেজেটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা–

১। জাতীয় তালিকায় সংখ্যা = ১৫৫৮ – ১৯৮৭ইং সালে
২। ভোটার সুচক তালিকায় সংখ্যা = ৩০০৩ – ১৯৯৪ইং সাল
৩। মুক্তিবার্তা তালিকায় সংখ্যা = ২৭১১ – ২০০০ ইং সাল
৪। সর্বশেষে গেজেটে সংখ্যা = ২৮২৫ – ২০০৬ ইং সাল

বগুড়া জেলায় যুদ্ধকালীন ক্যাম্প-কমান্ডার হিসাবে যাদের নাম পাওয়া গেল

১। শাহ মোখলেছুর রহমান দুলু
২। ফজলুল আহসান দিপু
৩। আব্দুস সবুর সওদার

২২। সিরাজুল ইসলাম
২৩। আলী আজগার
২৪। আব্দুল ওয়ারেছ

৪। হুমায়ন আলম চান্দু
৫। আব্দুর রহিম তোতা
৬। এ,টি,এম, জাকারিয়া
৭। মিছবাহুল মিল্লাত নান্না
৮। মমতাজ উদ্দিন
৯। আমিরুল মোমিন মুক্তা
১০। শেকরানা
১১। শাহনেওয়াজ চুন্নু
১২। শরিফুল ইসলাম জিন্না
১৩। আবুল কাসেম ফকির
১৪। খলিলুর রহমান
১৫। ইউসুফ উদ্দিন
১৬। মোজাম্মেল হক খান
১৭। মোফাজ্জল হোসেন
১৮। শের আলী
১৯। আব্দুল হামিদ
২০। মকবুল হোসেন
২১। আব্দুল হাসিম বাবলু'
২৫। এ, বি, এম, শাহজাহান
২৬। আব্দুর রউফ
২৭। মাহমুদুল হাসান চান্দু
২৮। নজিবুর রহমান
২৯। আবু বককর ছিদিক
৩০। এল,কে,আবুল হোসেন
৩১। ফজহুল হক ইদতারী
৩২। সারোয়ার হোসেন
৩৩। মোসলেম উদ্দিন
৩৪। আলতাব হোসেন
৩৫। রবিউল ইসলাম
৩৬। ছামসুদ্দিন
৩৭। আফতার উদ্দিন
৩৮। বকুল মিয়া
৩৯। কবির হোসেন
৪০। খাদেসুল ইসলাম

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের কিছু তথ্য

কামারপাড়ায় youth Camp ছিল। এর Incharge ছিলেন প্রফেসর আবু সাঈদ। এখানে যুদ্ধের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ হতো। এ প্রশিক্ষণ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এখানে কমিটিতে ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার, মাহমুদুল হাসান খাঁ এবং ডা. জাহেদুর রহমান ও এ. কে. মুজিবুর রহমান। ক্যাম্প দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জয়পুরহাটের কাফেজ উদ্দিন আহমদ। ঐ ক্যাম্পটি কিছুদিন পর মালঞ্চাতে স্থানান্তরিত হয়।

লিচুতলা বধ্যভূমি

বগুড়া-শেরপুর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে লিচুতলা আফসার সরদারের বাড়িটি যুদ্ধের সময় হয়ে ওঠে পাক আর্মিদের নির্যাতনকেন্দ্র। শাহরের বিভিন্ন জায়গা ও তার আশেপাশের জায়গা থেকে নানা বয়সি মানুষদের ধরে এনে এখানে হত্যা করা হতো। আফসার সরদার ও তার ছোট ছেলে জাহাঙ্গীর সরদারকে পাক হানাদারেরা হত্যা করে ফেলে যাওয়ার পর বাড়িটি জনশূন্য হয়ে পড়ায় এখানে বধ্যভূমির স্থানে পরিণত হয়। এ বাড়িটিতে হাজার হাজার মুক্তিকামি মানুষদের হত্যা করে লাশ রাখা হয়েছিল।

আফসার সরদারের নাতি আব্দুস সালাম সরকার ভয়াবহ '৭১ সালে তাদের পরিবারে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে। 'যখন পাক হানাদাররা বগুড়ায় এল, আমার দাদা তখন পর্যন্ত কারো দুশমনীর খাদ্যে পরিণত হয়নি। তিনি এলাকাতে সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এলাকার নানা ধরনের সালিশি ব্যবস্থা করে দিতেন। সহযোগী হিসেবে আমার চাচা থাকতেন। আমার দাদার বয়স তখন প্রায় ৫০ বছর। আমার চাচা ৩০। তারা আফসার কলের মিলে কাজ করতেন দিনভর। সুখী সচ্ছল পরিবার ছিল আমার দাদার। বগুড়ায় যুদ্ধ চলছে। আমরা সবাই ভীত হয়ে পড়েছি। আমার আম্মাসহ অন্যান্য আত্মীয়রা যখন শুনতে পেলেন পাক আর্মিরা আমাদের গ্রামগুলোর দিকে এগিয়ে আসছে তখন আমার দাদা আমাদের পরিবারের সবাইকে দূরের গ্রামের অন্য আত্মীয়দের বাড়িতে পাঠাতে শুরু করলেন। আমার দাদার দুইটি পরিবার থাকায় দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে মরিয়মকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার জন্য লিচুতলার বাড়িতে এসে ছিল। দেশ স্বাধীন হবার আগের দিন সকাল ১০টা কি ১২টা হবে। আমাদের লীচুতলার সামনে এসে কয়েকজন পাক-আর্মি জানতে চায় আমার দাদা আছে কি না। ডাকাডাকিতে আমার দাদা বেরিয়ে আসে। আমার ছোট চাচা বাড়ির ভেতর ছিল। বাড়ির অন্যান্যরা শুনতে পাচ্ছিলো আমার দাদার সঙ্গে কী একটা বিষয় নিয়ে পাক আর্মিদের মতনৈক্য চলছে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে গুলির শব্দ শোনা যায়। আমার চাচা বাড়ির বাইরে এসে দেখে আমার দাদাকে গুলি করছে পাক আর্মি। চাচা দাদার কাছে দৌড়ে এলে লিচুতলাতেই চাচাকেও গুলি করে হত্যা করে পাক আর্মিরা। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে পাক আর্মিরা যখন চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আমাদের বাড়ির সামনে তাদের রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এভাবে পড়ে থাকে ৪/৫ ঘণ্টা। কেউ বাইরে ভয়ে বেরিয়ে আসেনি তখনও। এলাকাবাসীদের কেউ মৃতদেহগুলো আমাদের বাড়ির গোয়ালঘরে কাঠের তক্তার ওপর রেখে যায়। আমার আত্মীয় স্বজনেরা লাশ খুঁজতে খুঁজতে ওখানে পায়। পরবর্তীতে এলাকার কিছু লোকের সহায়তায় আমার দাদার বাগানবাড়িতে গর্ত করে তাদের মাটিচাপা দেওয়া হয়। জানাজা গোসলও হয়নি তাদের। এ ঘটনার পর বাড়ি ছেড়ে সবাই পালিয়ে যায়। পরিত্যাক্ত অবস্থায় বাড়িটি দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। এ বাড়িটিতে পাকআর্মিরা বহু মানুষকে এনে হত্যা করে রাখত। আমরা যুদ্ধের বহুবছর পরও এ বাড়িতে কেউ আসিনি। গত ৭/৮ বছর আগে আমরা বাড়িটি সংস্কার করে এতে বসবাস করতে শুরু করি। কয়েকবছর আগেও এ বাড়িটি পোড়াবাড়ি ছিল।

মাদলা বধ্যভূমির প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন

দিপালী সরকার (৪৫)

তখন চারদিকে যুদ্ধ। প্রাণভয়ে সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়াই আমরা। আমি তখন ছোট। সেদিন সকাল ৮টা। আমার জেঠা আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চাইল। আমাকে বাড়ির বাইরে হাটে নিয়ে যেতে যখন পথে বেরিয়েছে দেখি বগুড়ায় দিক থেকে অনেকগুলো মিলিটারি এখানে আসল। আমার জেঠা আমাকে নিয়ে লুকিয়ে থাকল,

মিলিটারিরা তিনদিকে চলে গেল। একদল মাদলা হাটে এল ও আশেপাশের বাড়ি থেকে অনেকগুলো মানুষকে ধরে নিয়ে এল। পিছনে হাতদুটো বাঁধা। অনেকে কাঁদছে, জেঠা বলল ওদিকে যাবার নয়। দেখলি গুলি করবি। আমরা কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনি, মানুষের চিৎকার শুনি। তারপর সব চুপচাপ। মিলিটারিরা কয়েকজনকে বেঁধে নিয়ে বগুড়ার দিকে চলে যায়। আমাদের আশেপাশের অনেক লোক এতে ছিল।

স্বামীকে হারিয়েছেন শান্তিবালা (৪৫)
আমার স্বামী সকালে খাবার খাইয়ে ভোরবেলা হাট কুড়াতে গেছে। ওখান থেকে আমার স্বামী শশী মোহন্ত (৪৫) কে মিলিটারিরা ধরে আনে। আমার স্বামীর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। আমার স্বামীকে তারপর চাচাইতাড়ায় আরও অনেকের সাথে বইন্ধ্যে থুছিল। লোকজন সেদিন আরও অনেক ধরেছে। তারপর একটা পানি ভরা নিচু জমিতে সবাইকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে ব্রাসফায়ার করে। গুলির শব্দ শুনেছি, আসপার পারি নাই। মিলিটারি আছে শুনি হামরা একটা মুসলমানগের গ্রামে দৌড়ে পালাই। প্রায় এক মাইল। পরে শুনি হামার স্বামী মারা গেছে। দেখতেও আসতি পারি নাই। গুলি করার পর মিলিটারিরা চলে গেলে হামরা ভয়ে ভয়ে আবার গ্রামেত ফিরে আসি। শুনি হামার স্বামী লাশের নিচে চাপা পইড়ে ছিল। বাম বুকে গুলি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। মুসলমান ভাইরা (প্রতিবেশি) তাক সহ আরও গোটা দুইজনকে বগুড়া হাসাপাতালত ভর্তি কইরছে। তিন মাস পর স্বামী ফিরে আইসল। দেশ তখন স্বাধীন হচে, এরপর স্বামী আরও ছ'মাস বেঁচে ছিল। হামার স্বামী লই (চিনি দিয়ে তৈরি এক ধরনের সস্তা মিষ্টান্ন/ কটকটি) বেচত। নিরীহ মানুষ ছিল। স্বামীর কাছে শুইনছি 'মিলিটারিরা এটি আসল' বলল এই তুই মালাউন। তুই হিন্দু না মুসলমান? হামার স্বামী বলে আমি হিন্দু বাবা। মিলিটারিরা তাকে উলংগ করে। তাকে বলে তুই মুসলমান না। তারপর সবাইকে উলংগ করে দেখে। তারপর সবারে একসাথি হাত বান্ধি গুলি করে। হামার স্বামীরে আমি সেদিন কোনো সেবা কত্তি পারি নাই গো। ধুকে ধুকে মইরল।

শতদল দাস (৬০)
আমাদের গ্রামে মিলিটারিরা সকাল ৮টার দিকে আসে। আমরা সবাই ছুটে পালাই যে যেদিকে পারে। আমরা অনেক দূরে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পাই। মিলিটারিরা চলে গেলে ফিরে আসি। দেখি এখন যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ তার পাশে খালি জায়গা ছিল তাতে অনেক লাশ পড়ে আছে। সবার হাত পিছনে বাঁধা। এরা সব আমাদের গায়েরই আশেপাশের লোক। সবাই গরিব। কেউ কামারি করত। কেউ মিষ্টি তৈরির কারিগর। কেউ কেউ খালপা বানাত। সকালবেলা যাকে পেয়েছে তাকেই ধরেছে। যখন উলংগ করে হিন্দু দেখেছে তখনই তাদের মালাউনের বাচ্চা বলে। তারপর এদের একসাথে গুলি করে মারে। তারপর তাদের মাটি চাপা দিয়ে রাখে। সেদিন

মাটিচাপা লাশের তলা থেকে শশীমোহন্ত, রাজ বল্লব ও প্রাণেন্দ্র বেঁচে যায় আহত হয়ে। আমি এখন সেই লাশের জমির ওপর বাড়ি করেছি। এ ঘরের নিচে এখনও খুড়লে মানুষের হাড়গোড় পাওয়া যাবে। অদূরে সজনে গাছ দেখিয়ে বধ্যভূমির সীমানা দেখান শতদল দাস।

ননীগোপাল (৩৮) মাছ ব্যবসায়ী

আমি যে জায়গায় জমি কিনে বাড়ি করেছি। সে জায়গাই বধ্যভূমির একটা অংশ। আমার ঘরটা যে জায়গায় সেখানে অনেক মানুষ হত্যা করে গর্ত করে তাতে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিল। আমার বাড়িতে একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান দাওয়াত খেতে এসেছিল। তিনি মারা গেছেন। তো সেদিন চেয়ারম্যান সাহেব দুঃখ করে বলেছিলেন আমার ঘরের একদিকের কোনা দেখিয়ে, "ননীগোপাল এখানে তুমি ঘর বানিয়েছ অথচ এখানে প্রায় ৭২–৭৩টার মতো মানুষের মাথার খুলি পাওয়া যাবে। এখানে মানুষের অনেক মাথা পাওয়া গেছে, শরীর পাওয়া যায়নি। '৭১ এর মাদলাতে যত মানুষ হত্যা করেছে পাকসেনারা তাদের সবাইকে এই জায়গায় এসে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়েছে।'– আমরা কয়েক গেরস্ত এখানে ইউনিয়ন পরিষদের পেছনে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২১ শতক জায়গা কিনে তিন পরিবার বাস করি। শুনেছি এই ২১ শতকের পুরোটাই মানুষের লাশ আর হাড়গোড়ে ভর্তি ছিল।

চকলোকমান বধ্যভূমি

রফিকুল ইসলাম (প্রত্যক্ষদর্শী)   বেজোড়া ঘাটের দক্ষিণে রয়েছে একটি গণকবর। পাকহানাদার বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডবতার একটি নির্দশন। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে নানা বয়সি ২৩ জনকে একসঙ্গে হত্যা করে। এদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি শুধুমাত্র একজন ছাড়া। আর হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালবেলা সর্বপ্রথম যে ছেলেটি এই ঘটনার সাক্ষী তিনি এখন ৫০ বছরের একজন মানুষ। তিনি জানালেন কী ঘটেছিল সেই ২৩ জনের জীবনে।

রফিকুল ইসলাম : তখন যুদ্ধ শেষের দিকে। আমাদের গ্রামের ১০গজ দূরে একটি মাঠ। এ মাঠ ঈদগাহ মাঠ হিসেবেই পরিচিত। এখানে যুদ্ধের সময় পাক আর্মিরা ক্যাম্প করে। প্রায়ই ক্যাম্প থেকে নানা মানুষের চিৎকার ভেসে আসে। আমরা ভয়ে থাকি। সারাদিন গ্রামে কেউ থাকে না। দূরের কোনও গ্রামে সবাই লুকিয়ে থাকি। আমরা যারা ছোট তারা গরু ছাগল ও জমির কাজ করতে বাইরে বের হই। এভাবেই আমাদের ভয়াবহ জীবন ছিল। সারাক্ষণ ভয়ে থাকতাম পাক আর্মিরা কখন আমাদের ধরে নিয়ে যায়।

সেদিন সবাই রাতে অনেক গুলির শব্দ আর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। উৎকণ্ঠা আর ভয়ে সবাই চুপচাপ রাত পার করেছিল। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার বয়স তখন

১৩ বছর। মাঠের কাজ করি। সকালে মাঠে কাজ করতে গিয়ে দেখি আগের সকালগুলোর মতোই সব স্বাভাবিক নীরব। আমাদের জমিতে একটা জালা ছিল। তাতে খড় গাদা (জমা) করে রেখেছিলাম। জালাটা (ড্রেন) পানি নামার জন্য ব্যবহৃত হতো। ওখানে খড় না পেয়ে একটু ঘোরা-ঘুরি করতেই দেখি আমাদের জমির পাশে আরেকটা জমিতে খড়গুলো জমা করে রাখা হয়েছে। খড় তুলতেই মানুষের মাথা আর পা দেখতে পেলাম। একটি, দুটি নয় অনেকগুলো লাশ স্তূপ করে রাখা। আমি দেখে ভয়ে দৌড় দিলাম। আশেপাশে কেউ নাই। বাড়ি গিয়ে ঘটনাটা সবাইকে বললাম। আমি কৌতূহলি হয়ে আবার ফিরে আসি জমিতে। যেখানে ২৩ জনের লাশ পড়ে আছে। লাশগুলো নানা বয়সি। হিন্দু মুসলমান সবাই ছিল তার মধ্যে। একজনের লাশের পকেটে একটা আইডি কার্ড পেলাম। নাম লেখা ধানেশ। বগুড়া কটন মিলের ক্যাশিয়ার। এসব দেখে বাড়ি চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর আমি লতিফপুর বিহারী কলোনির দিকে যাচ্ছিলাম তখন দেখি একটা ব্লেডমটর (মাটি তোলার গাড়ি) নিয়ে কয়েকজন মানুষ এল। তারা পাশের জমি থেকে মাটি নিয়ে পাশের জলা জমিতে রাখা স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে চলে গেল।

স্বাধীনের পর একজন লোক এসে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাড়গোড় একত্র করে জানাজা করে ঐ জমিটি কিনে ঘিরে গণকবর নাম দিয়ে যায়। পরে শোনা যায় মাদলা গ্রামের ও তার আশেপাশের মানুষদের ধরে এনেছিল। এ জমিতে যুদ্ধের একদিন আগে ৭২ জনকে একসঙ্গে রেখে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করেছিল। যে ব্যক্তি এ জমিটি ঘিরে পাকা করেছিল সে ছিল ধানেশ-এর উত্তরাধিকারদের একজন।

নাজনীন খান, ওসমান বিহারীর স্ত্রী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ায় যে ক'জন পাকবাহিনীর দোসর বগুড়া শহরে নানারকম হত্যা, খুন, রাহাজানি, গুম ও ধর্ষণের নায়ক তার মধ্যে অন্যতম ওসমান বিহারী। তার সম্পর্কে তার স্ত্রী নাজনীন খানমের বক্তব্য–

"মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়ায় কর্মরত অবাঙালি এক পুলিশ কর্মকর্তার মেয়ে আমি নাজনীন খানম। আমাকে বিয়ে করার কয়েক মাস পরই জানতে পারি সে বিবাহিত। ওসমান বিহারী ভারত থেকে তার প্রথম স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসে। সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সবকিছু মেনে নিয়ে সতীনের সঙ্গে ঘর করতে রাজি হলেও ওসমান আমাকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ওসমান তার প্রথম স্ত্রী ও সন্তানদের শহরের রাজাবাজারে দখল করা একটি বাড়িতে এনে রাখে। পরবর্তীতে আমার বাবা–মার চাপের মুখে ওসমান কিছুদিন ওই বাড়িতে আমাকে থাকতে দেয়। তখনই ওই বাড়িতে পাকসেনাদের আনাগোনা ছিল। মাড়োয়ারি ও হিন্দু ব্যবসায়িদের প্রতিষ্ঠান আর বাড়ি-ঘর লুট করে আনা বহু সিন্দুক আমি দেখেছি। শহরের রাজাবাজারে কাঁসার থালা–বাসনের যেসব দোকান ছিল সেগুলোও লুটপাটের নায়ক ছিল ওসমান আর তার প্রথম পক্ষের ছেলে ইকবাল। লুটে নেওয়া মালামালগুলো রাখা হতো শহরের কাটনার পাড়া এলাকার একটি বাড়িতে। ওসমান ছিল একজন লম্পট। ১৯৮৫ সালে বড় মেয়ে শবনমকে বিয়ে দেওয়ার ৪০ দিনের মাথায় বাবা হয়েও সে বিবাহিত কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। সেদিন তার কবল থেকে মেয়েকে উদ্ধার করার পর রাগে অপমানে স্বামীর মুখে থুতু দিয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসি। মুক্তিযুদ্ধের সময় লুটপাটে

বাধা দেওয়ায় সে আমাদের অনেক অত্যাচার করেছে। মোমিন রেডিও হাউসের মালিক হত্যা মামলার আসামি হিসেবে ওসমানকে কিছুদিন কারাগারে থাকতে হয়েছিল। ওসমানের ঘরে আমার ছয়টি সন্তান রয়েছে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী কাঙ্কিনারা এলাকার কাপড়ের ফেরিওয়ালা ওসমান বিহারী ষাটের দশকে বগুড়ায় আসে। ব্যবসা করার এক পর্যায়ে কলকাতায় তার বাড়ির সঙ্গে বগুড়া শহরের রাজাবাজার এলাকার এক হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়ির মালিকানা রদবদল করে বসবাস শুরু করে।

বগুড়ায় প্রথম শহীদ এক রিক্সাচালক

এস. এম. রফিকুল ইসলাম লাল

মূলত ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর থেকেই বাঙালি আন্দোলনমুখী। বগুড়াও সেই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে ছিল না। আমরা বগুড়ার ছাত্রসমাজ সারাদেশের মত মনে করেছিলাম এবারের আন্দোলনে একটা কিছু হবে, আন্দোলন হবে দীর্ঘ। তাই আমরা ১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে গঠন করি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্রলীগ থেকে ৪ জন মমতাজউদ্দিন, মাহবুবুর রহমান রাজা, আব্দুল মোত্তালেব, খাদেমুল ইসলাম, এবং ছাত্র ইউনিয়ন থেকে মুস্তাফিজার রহমান ফিজু, হায়দার আলী, মাহফুজার রহমান মান্নান ও আব্দুর রাজ্জাক, এই ৮ জনের ছাত্র সংগ্রাম কমিটি যা আমার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সহযোগিতায় জেলার প্রতিটি স্কুল-কলেজে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে আন্দেলনকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিস্তার করা সম্ভব হয় যাতে অতি অল্প সময়ে আন্দোলন তীব্র করা যায়। সংবাদ মাধ্যম সজাগ রাখা হয়। আন্দোলন চলছে ঐক্যবদ্ধভাবে ৬ দফা, ১১ দফার, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র -জনতা ঐক্যবদ্ধ। রাজনৈতিক দলগুলো এ্যাকশন কমিটি গঠন করে যেখানে মাহমুদুল হাসান খান, ডা. জাহেদুর রহমান এমপি, আব্দুল লতিফ, মোখলেছুর রহমান, মোশারফ হোসেন মন্ডল, গাজীউল হক এবং এম আর আখতার মুকুল ছিলেন। এই এ্যাকশন কমিটির নির্দেশেই বগুড়ার আন্দোলন পরিচালিত হয়।

ছাত্র সংগ্রাম কমিটি প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় কমিটি গঠন করে রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা করে, যাতে কোনো খারাপ লোক কারো কোনো ক্ষতি করতে না পারে। মিছিল মিটিং চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বগুড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল কি না, আমার মনে পড়ে না, তবে ফুড অফিসের সামনে বিশাল ছাত্র-জনতার মিছিলে (সেখানে বগুড়ার স্থানীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন) প্রথম শ্লোগান উচ্চারিত হল তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। বগুড়া শহর ছিল মিছিলের শহর। ছাত্র ইউনিয়ন তৈরি করে ছাত্র ব্রিগেড। জেলা স্কুল, করনেশন ইনস্টিটিউশন এবং আনসার ক্লাবে চলে ছাত্রদের ট্রেনিং। জেলা স্কুলে ট্রেনিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মোশারফ হোসেন মন্ডলের ছেলে হেলাল। সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু-এর করনেশন ইনস্টিটিউশন। দায়িত্বে ছিল এস এম সোহরাব। সোহরাব প্রাক্তন আগরতলা মামলার আসামী এবং তৎকালীন বিমান বাহিনীর কর্মচারী, আনসার ক্লাবে নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন। টি এম মুসা পেস্তাসহ

তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে ডামি রাইফেল দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করার কাজে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছিল।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণের পর সারা বাংলাদেশের সঙ্গে বগুড়ার আন্দোলনে নুতুন মাত্র যোগ হয়। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পথে-প্রান্তরে রাস্তায়-দোকানে সর্বত্র স্বাধীনতার কথা। তৌফিকুল আলম টিপুর নেতৃত্বে গণসঙ্গীত, ট্রাকে করে শহর-গ্রাম স্বাধীনতার গান, বিপ্লবী গানের মঞ্চ থেকেও মানুষকে উৎসাহিত করতে থাকে শিল্পী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ। আন্দোলন, মিছিল-মিটিং চলতে থাকে, রাত্রে গণপাহারার কাজ ও চলতে থাকে। ইত্যবসরে আমাদের কয়েকজনকে : হায়দার আলী, মাহফুজুর রহমান মান্না, কামরুল হুদা টুটু, শুকদের ঘোষ, দিলীপ বকঈ, স্বপন কুমার গুহ রায় ও আমাকে জনতা জেলখানা হতে বাইরে নিয়ে আসে। সামরিক আইন করে আমাদের গ্রেফতার করা হবে জেনে দারোগাকে বলি সকালে থানায় যাব, রাতে পাহারার কাজটুকু করতে দেন। তখন দারোগা সাহেব বলেন, কোনো গ্রেফতার নয়, রংপুর থেকে 'পাক আর্মি' বগুড়ার দিকে দ্রুত মার্চ করছে। কিছু করার থাকলে তাড়াতাড়ি করেন। হুইসেল দিয়ে প্রতিটি মহল্লার পাহারার বন্ধুদের ডাকা হল। এমনিভাবে শহরের প্রতিটি মহল্লায় একযোগে বাঁশির মাধ্যমে স্ব-স্ব মহল্লার বন্ধুগণও একত্রিত হন। ওসি ও পুলিশ ইন্সপেক্টরও দ্রুত মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে পাক আর্মির বিষয়টি জানায়। স্ব-স্ব এলাকার পাহারাদারগণ লোকজনকে নিয়ে কেউ রাস্তায় বেরিকেড, কেউ অস্ত্রশস্ত্র কালেকশন করতে বেরিয়ে পড়েন। এমনিভাবে পাক আর্মি যখন বগুড়ায় প্রবেশ করে তখন প্রথমে মাটিডালীতে এক রিক্সাচালক রাস্তায় গাছের ডাল কেটে বেরিকেড দেওয়ার সময় গুলিতে শহীন হন। তৎপর কালিতলা হাটে পাকসেনা এলে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ। বড়গোলা টু কালিতলাহাট তপনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রের সাথে টেকা যায় না। পাকসেনারা আসে রেললাইন পর্যন্ত, সেখানে রেললাইনের উপরে কিছু গরীব দোকানদারকে গুলি করে হত্যা করে। বড়গোলায় আজাদ ভাইকে গুলি করে হত্যা করে। রেলগেটে প্রথম শক্ত বাধা পায় পাকসেনারা, ট্রেনের বগি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকসেনাদের গাড়ি আর রাস্তা পার হতে না পারায় তারা থমকে দাড়ায়, মুক্তিযোদ্ধা এবং পুলিশবাহিনীর সদস্যবৃন্দ ৩০৩ রাইফেই, টুটুবোর রাইফেল এবং বন্দুক দিয়ে পাকসেনাদের প্রতিহত করে ভোর ৪টা থেকে সকাল ১০/১১ টা পর্যন্ত। পাকসেনারা আস্তে আস্তে পিছনে যেতে থাকে এবং মহিলা কলেজের পিছনে গিয়ে শক্ত প্রস্তুতি নেয়। বড়গোলা থেকে পিছনে যাওয়ার সময় পাকসেনারা তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের ছাদ হতে যুদ্ধ করার সময়ে গুলি শেষ হওয়ার কারণে মোস্তাফিজার রহমান চুন্নু ও টিটুকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে এবং হিটলুকে ধরে নিয়ে যায়, পরবর্তীতে হত্যা করে লাশ গুম করে। এরাই প্রথম শহীদ। তৎপর সুবিল থেকে পাকদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে একজন অবাঙালি মারা যায়।

মার্চের শেষে এয়ার এ্যাটাক হওয়ায় বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ এলোমেলো হয়ে যায়। আগস্ট

পর্যন্ত বগুড়া শহর ও শহরতলী আমাদের দখলে ছিল। এয়ার এ্যাটাকের পর অনেকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মাটিতে যায়। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালিত হয় কার্নেল ওসমানীর নির্দেশ এবং কেস্টর কমান্ডারগণের নিয়ন্ত্রণে। আমি ১১ নং সেক্টরে কর্নেল তাহেরে অধীনে যুদ্ধ করেছি। চারদিকে জয় বাংলা শ্লোগান সারাদেশ এক ঐতিহাসিক সন্ধিকণে। ৯ মার্চ আমি ট্রেনের বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

আমাদের গ্রামের নাম হারুন, যা বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানাধীন ২২টি পাড়া নিয়ে গঠিত।

গ্রামে গ্রামে তখন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হচ্ছে। আমাদের একটা সংগ্রাম কমিটি হল। আমার ফুফাত ভাই তোজাম্মেল হোসেন সভাপতি আর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল সম্পাদকের। আমার কাজ ঘরে ঘরে বাংলাদেশের নতুন পতাকা তোলা, গ্রামের ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ মেটানো। গ্রামের কমিটির ক্ষমতা পুলিশের চেয়েও বেশি কিন্তু ২৫ মার্চের কয়েকদিন পরেই পরিস্থিতির দ্রুত পবির্তন হল। মিলিটারি ও পুলিশ সারা এলাকায় কৃর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার আগেই হিন্দু পরিবারের লোকজন দলে দলে গ্রাম ত্যাগ করে। বাড়িঘর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যায় যার যার ঘনিষ্ঠ মুসলামন পরিবারে কাছে। আমাদের গ্রামের শফিউল আলম গোপাল ডাক্তারের পরিবারে সাথে ভারতে পাড়ি জমান।

কয়েকদিনের মধ্যে পাকসেনারা আমাদের গ্রামে আসে। অবশিষ্ট হিন্দু পরিবারের লোকজনের মধ্যে বাদল ও তার ভাতিজী মিনা'র স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। জয়পুরহাটে পাকসেনারা ওদেরকে গুলি করে মেরেছিল সেই খবর আমরা লোকমুখে শুনতে পাই। বাকিলা গ্রামের দাদার ছেলেকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। সেও আর ফিরে আসেনি। পলিগাথির কাব মামা, বগুড়া কলেজের ছাত্র ও গোবিন্দগঞ্জের লতিফকে সেনারা গুলি করে মেরেছিল।

যুদ্ধের দিনগুলোতে রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তাই আমার মামা লাইলী খালাকে নিয়ে গ্রামে আসতে পারেননি। আমার নানী ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ছোট মেয়ের সাথে আর হয়তো কোনদিন তার দেখা হবে না। আমি সাথে করে নিয়ে যাই ঢাকায়, সেজন্য সবসময় একটা অপরাধী অনুভূতি। সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া নানীকে আর কিছু বলতে পারিনি। আমার নানা মানিকউদ্দীন সরকার খুব সাহসী লোক ছিলেন। হয়তো ছোট মেয়ের কথা ভেবে দুঃখ পেতেন, কিন্তু মুখ ফুটে আমাদের কিছু বলেননি।

সবার মত যুদ্ধের মাসগুলোতে আমাদের ১২ জনের পরিবারে অর্থনৈতিক দুর্দশা নেমে আসে। আমাদের মাসুমভাই ৬০ টাকা দিয়ে দিছেন। সেই দিয়ে আমি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাল, ডাল, লবণ, তেল প্রভৃতির একটা দোকান দিই। ছোট ভাই ফজলুর রহমানও সহায়তা করেছে নানাভাবে। সম্ভবত ১২ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহর ক্ষেতলাল এসে পৌছে। আশপাশের গ্রাম থেকে শত শত লোক ভারতীয় ট্যাংকের চারপ্যাশে ভিড় করে। ভারতীয় সেনাদের দিকে লক্ষ্য করে শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, মানেকশ' জিন্দাবাদ, ওসমানী জিন্দাবাদ, জয়

বাংলা প্রভৃতি শ্লোগাণ দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্তিবাহিনী থানার দায়িত্ব নেয়। সংগ্রাম কমিটির লোকজন সক্রিয় হয় তবে বেশি দিন তা স্থায়ী হয়নি। পুলিশ আবার থানার দায়িত্বে আসে। আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের নিয়ে রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। শরণার্থীরা গ্রামে ফিরে আসে। আমার মামা ও লাইলীখালা ঢাকা থেকে গ্রামে এসে পৌছে। আমার নানী তার ছোটমেয়েকে পেয়ে নিশ্চিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে আছেন, অনেকেই শহীদ হয়েছেন। বগুড়া জেলায় শহীদ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নামের তালিকা–

১। ইন্সপেক্টর শামসুদ্দীন সর্দার
২। হাবিলদার গোলজার হোসেন
৩। কং ৩৬৮ ইছাহাক শরীফ
৪। আর সি. ৬৪ আব্দুর রহিম
৫। কং ৫৪০ আব্দুল আজিজ
৬। আর.সি. আব্দুল রাজ্জাক
৭। কং ৪২৫ খায়রুল বাশার
৮। ও.এস. আই মইনুল হক
৯। নায়েক ১০৯ খোদা বক্স
১০। কং ১৯৮ শষী মোহন বড়ুয়া
১১। কং ৪১১০ মছির উদ্দীন
১২। কং ৫৪৬ শফিকুল রহমান
১৩। কং ৪২৯ হারুন অর রশিদ
১৪। কং ৫২ সানোয়ার সর্দার
১৫। ও. এ. এ. আই ১২৩ আ. কাদের
১৬। কং ১১৮ আব্দুল করিম
১৭। কং ৩৬৫ চাঁন মিয়া
১৮। কং ২৭৭ ইছমাইল হোসেন
১৯। আর. সি ১৪১ আব্দুল মান্নান
২০। কং ৫৪৮ নাজিম উদ্দীন
২১। কং ২২১ আ. করিম

তথ্যসূত্র : দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, -মুহাম্মদ নূরুল কাদির।

৭নং সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ্রগ্রহণকারী সামরিক অফিসারগণের নাম

১। লে. কর্নেল কাজী নুরুজ্জামন, বীর উত্তম (অব.) সেক্টর কমান্ডার।
২। ব্রিগ্রেডিয়ার গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, বীর বিক্রম পিএসসি (অব.)
৩। কর্নেল এম. আব্দুর রশীদ, বীর প্রতীক, পিএসসি (মরহুম)
৪। মেজর নজমুল হক (মরহুম)
৫। মেজর বজলুর রশীদ (অব.)
৬। মেজর আব্দুল কাইয়ুম খান (বরখাস্ত)
৭। মেজর এ মতিন চৌধুরী (অব.)
৮। মেজর আমিনুল ইসলাম
৯। মেজর রফিকুল ইসলাম (অব.)
১০। মেজর আওয়াল চৌধুরী (অব.)

১১। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ (শহীদ)
১২। ক্যাপ্টেন কায়সার হক (অব.)
১৩। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস (অব.)
১৫। মেজর লিয়াকত আলী খান
১৬। লে. কর্নেল এ. এল. এম. ফজলুর রহমান
১৭। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ এ.বি তাজুল ইসলাম (অব.)
১৮। মেজর জয়নাল আবেদীন খান (অব.)
[তথ্যসূত্র : দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, –মুহাম্মদ নূরুল কাদির]

শহীদ আনসার অফিসার, আনসার কর্মচারী ও আনসারদের নামের তালিকা

১। পিসি আজিজুর রহমান
২। আনসার আবু তালেব
৩। আনসার শরিফ উদ্দিন
৪। আনসার আব্দুর রহমান
[তথ্যসূত্র : দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা।]

সারিয়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল

দল নিরপেক্ষ থেকে জাতীয় দায়িত্ব পালনে দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করার এবং মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল গঠন করা হয় ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ। সারিয়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল গঠনে উদ্যোক্তা ছিলেন নিজতিতপরলের আকরাম হোসেন।

সারিয়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালনকারী সারিয়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের নাম–

নাম	গ্রামের নাম
১. ডা. মো. আব্দুল কদ্দুস	পারতিতপরল
২. মো. ইলিয়াস উদ্দিন	হিন্দুকান্দি
৩. মো. ছরোয়ার হোসেন – পাকুল্লা (বর্তমানে পাকুল্লা সোনাতলা থানার অন্তর্ভূক্ত)	
৪. ডা. মো. আব্দুল কদ্দুস	পারতিতপরল
৫. এ.বি.এম. রেজাউল করিম মতিন	সারিয়াকান্দি
৬. মো. আব্দুর রাজ্জাক	সারিয়াকান্দি
৭. শাহ মুনজুরুল হক	চন্দনবাইশা
৮. এ্যাড. জিল্লুর রহমান	পারতিতপরল
৯. আলী আজগর	সারিয়াকান্দি

১০. শাহ মুনজুরুল হক — সারিয়াকান্দি;
১১. আ. হামিদ সরদার — সারিয়াকান্দি
১২. আ. লতিফ — সারিয়াকান্দি
১৩. আ. হামিদ সরদার — সারিয়াকান্দি
১৪. এ্যাড. জিল্লুর রহমান সরকার — পারতিতপরল (ভারপ্রাপ্ত)।

সাত নম্বর সেক্টর

সাত নম্বর সেক্টর দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর হেড কোয়ার্টার ভারতের তরঙ্গপুর। লে. কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) সেক্টর কমান্ডার হিসেবে এই সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সেক্টরটিকে ৯টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়।

১। লালগোলা সাব-সেক্টর ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন সাব-সেক্টর কমান্ডার। পরবর্তীতে বীরবিক্রম উপাধি পেয়েছিলেন।

২। মেহেদীপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ)

৩। হামজাপুর সাব-সেক্টর ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, সাব-সেক্টর কমান্ডার। (পরবর্তিতে বীরবিক্রম)

৪। খেপুপাড়া সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন রশিদ সাব-সেক্টর কমান্ডার।

৫। ভালাহাটা সাব-সেক্টর লে. রফিকুর ইসলাম, সাব-সেক্টর কমান্ডার।

৬। মালঞ্চ সাব-সেক্টর : প্রথমে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন, সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, পরে একজন সুবেদার তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেয়।

৭। তপন সাব-সেক্টর মেজর নজমুল হক, প্রথম দিকে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন, পরে লে. কর্নেল নূরুজ্জামান ৭নং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে তিনি ৭নং সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। এক মর্মান্তিক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। পরে এক সুবেদার এই সাব-সেক্টর কমান্ড করেন।

৮। ঠোকরবাড়ি সাব-সেক্টর : সুবেদার মোয়াজ্জেম।

৯। আঙ্গিনাবাদ সাব-সেক্টর দুটি অপারেশনাল ক্যাম্প ছিল। বড়াহার ক্যাম্প ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থাপাথাপা ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা মহসীন ক্যাম্প অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন।

পনের রাজাকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল

বয়স তার ১৬–১৭। কাজ করেন বগুড়া কটন মিলে লেবার হিসেবে। এর আগে কাজ করতেন বগুড়া জিলা স্কুলে পাখা টানার '৬৫ টাকায় ছয়মাসের চুক্তিতে। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে যেভাবে পারছে দেশকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। একজন রাজাকার, নিরাপত্তার স্বার্থে তার নাম বলছি না। সে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের

ক্যাম্পে। ওরা একদল প্রায় ১৪/১৫ জন। আমি তখন মাইনকার চরে। আমাকে তখন ইনডিয়ান সরকার সহযোগিতা করেছিল। মাড়োয়াড়ির একটি গদিতে থাকতাম। খোঁজ নিতাম কোথায়ও কোনও যুদ্ধকবলিত মুক্তিযোদ্ধা আমার দেশ থেকে এসে বিপদে রয়েছে কিনা। ১৬ই আগস্ট ১৯৭১। ওদের পেয়ে ভাবলাম রাজাকারদের কাজে লাগানো সম্ভব। সম্ভবত সেপ্টেম্বর হবে মাসটা। আমার কাছে কিছু দোনালা রাইফেল ও থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে এল। ওরা গাবতলীর রামেশ্বরপুরে বেশ কয়েকজন যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ১৫-২০ দিনের গেরিলা ট্রেনিং ও প্রতিরোধ ট্রেনিং তাদের সম্পন্ন করা ছিল। আমি ওদের বললাম, রাজাকার দেশকে ভালোবাসতে পারে না। ওরা সবাই একবাক্যে রাজী হলো দেশকে তারা মুক্তির দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। রাজাকারদের একজনকে আমি নিচতাম, ঐ রাজাকারটি ছিল আমার একজন দলীয় কর্মীর ভাই। আমরা থাকতাম জয়পুরপাড়া, ওরা ছিল এর পাশের এলাকা ফুলবাড়ি। ওর ভাই আমার মতো ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়ন করত। বগুড়ার ফুলতলায় পার্শ্ববর্তী একটি আমবাগানে পাক আর্মিদের ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। ওখানে একদিনের জন্য একটি হায়ার ট্রেনিং হতো রাজাকারদের। এরপর শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের পাঠিয়ে দেয়া হত মুক্তি যোদ্ধাদের খোঁজ নেওয়া, লুটপাট করা এসব বিষয়ে।

আমি মুক্তিযুদ্ধের কাজে এসব রাজাকারদের অংশ নিতে সাহায্য করলাম। ট্রেনিং দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম ১৪ জনকেই। দেশ স্বাধীন হলো। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে এভাবেই সর্বস্তরের মানুষ সহযোগিতা করেছিল। আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে যে, ঐ রাজাকারগুলো মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছে। বাঁচার তাগিদে তারা রাজাকার হয়েছিল কিন্তু মন- মানসিকতায় তারা দেশের পক্ষেই ছিল। সবার অংশগ্রহণেই এ দেশটি স্বাধীন হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার : ফিরোজ আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা

ছেলেমেয়ে ও স্বামীর সামনে গণধর্ষণ

এ. কে. এম রেজাউল হক রাজু (মুক্তিযোদ্ধা)

সারাদেশের মতো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনাবাহিনীর বর্বরতার স্বাক্ষর বগুড়াও বহন করেছে। ছেলেমেয়ে ও স্বামীর সামনে একজন হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করে পাকসেনারা। তার বাড়ির মধ্যেই ঐ হিন্দু মহিলাটি গণ ধর্ষণের শিকার হন। সোনাতলার চামরগাছার একটি হিন্দু পরিবারে এ ঘটনা ঘটে। ১৯৭১-এ এরকম নীরব ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বগুড়ায় অনেক। বড় ভাইর সামনে ছোট বোনকেও ধর্ষণ করেছে। আমরাতো বাঙালি পরিবারের সদস্য। তাই ঐ হিন্দু পরিবারটির সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ন করতে চাইনি। নীরবে সয়ে গেছে এমন আক্রান্তরা।

সাক্ষাৎকার : ফিরোজ আহমেদ (মুক্তিযোদ্ধা)

বগুড়া শহরের আরও কয়েকজন রাজাকার।

১। ওসমান গনি ওরফে ওসমান বিহারী বগুড়া সদর লতিফপুর কলোনি
২। আনোয়ার হোসেন বগুড়া সদর লতিফপুর কলোনি
৩। ইকবাল হোসনে বগুড়া সদর লতিফপুর কলোনি
৪। আসলাম হোসেন বগুড়া সদর লতিফপুর কলোনি

বীরবিক্রম + বীরপ্রতীক + বীরউত্তম

মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই নানা অবদানের জন্য নানা খেতাবে ভূষিত হয়। বীরশ্রেষ্ঠ বগুড়া জেলায় একজনও নেই। বীর উত্তম রয়েছেন ১ জন। তিনি হলেন মেজর জিয়াউর রহমান। বীরপ্রতীক নাই। বীরবিক্রম ১ জন। তিনি হলেন মেজর হামিদুর হোসেন তারেক।

তালিকা

৭ নং সেক্টর (গণ বাহিনী)

র‍্যাংক (তদানীন্তন) নাম
১৫৯। জিবি – এ টি এম হামিদুল হোসেন
১৬০। জিবি – অধ্যাপক সিদ্দিক (শহীদ)
১৬১। জিবি – মো. ইদ্রিস আলী খান।

৭নং সেক্টর (প্রাক্তন E. P. R)
২৭১। এম এফ – ইদ্রিস

৭নং সেক্টর

র‍্যাংক (তদানীন্তন) নাম
৩৬৪। জিবি – এ. কে. এম. মাহবুবর রহমান
৩৬৫। জিবি – মো. মোহসীন আলী সরদার
৩৬৬। জিবি – মো. আজাদ আলী
৩৬৭। জিবি – মো. নূর হাকিম
৩৬৮। জিবি – বদিউজ্জামান (টুনী বাহিনী)

তথ্যসূত্র : মাহমুদ শফিক (গণহত্যা – ১৯৭১)
৭নং সেক্টর নাজমুল হক।

('৭১ এর আগস্টে শহীদ) কাজী নুরুজ্জামান অস্থায়ী রাজশাহী পাবনা ও বগুড়া।
বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার আলবদর ও বিহারীদের ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে পাক

হানাদারদের এ দোসরদের বগুড়া আল্লা মিয়ার তোলা ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম সংলগ্ন মাঠে ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল এবং চানমারি ও পিছনে আটাপাড়া ওয়াপদা কলোনির হিলির জঙ্গলে ভরা বিভিন্ন স্থানে। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার আলবদরদের তালিকায় ৩৯ জন রাজাকারের নাম কাগজে কলমে পাওয়া যায়। এছাড়া অগণিত বাজাকার আলবদর রয়েছে।

কয়েকজন রাজাকারের নামের তালিকা দেওয়া হলো :

১। আজিজুল হক মোল্লা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।	
২। বুলু মণ্ডল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান	ধুনট
৩। খোরশেদ আলম তালুকদার	কাহালু
৪। আলতাব হোসেন (পিস কমিটির সভাপতি)	ধুনট সদর
৫। আব্দুল মজিদ তালুকদার	ধুনট
৬। কাদের বক্স মণ্ডল	ধুনট
৭। মজিবর রহমান প্রামানিক (পিস কমিটির চেয়ারম্যান)	খোকসাহাটা ধুনট
৮। মজুর উদ্দিন ছুতার	ধুনট
৯। মোমিন হাজী মুরইল গ্রাম।	কাহালু
১০। আয়েজ মণ্ডল	সরুগ্রাম – ধুনট
১১। মোখলেছুর রহমান (খোকা মিয়া)	সরুগ্রাম- ধুনট
১২। মফিজুর রহমান (চাঁন মিয়া)	সরুগ্রাম- ধুনট
১৩। মশিউর রহমান (চাল মিয়া)	সরুগ্রাম- ধুনট
১৪। আবুল হোসেন	সরুগ্রাম- ধুনট
১৫। লয়া নাপিত	কানুপুর শিবগঞ্জ
১৬। পীর মামুন	বেলগাড়ী শিবগঞ্জ
১৭। মো. কাজেম	বেলগাড়ী – শিবগঞ্জ
১৮। সামছুদ্দীন	সব্দল দিঘী – শিবগঞ্জ
১৯। গোলাম মওলা	রায় নগর – শিবগঞ্জ
২০। মো. সুফী	রায় নগর – শিবগঞ্জ
২১। বংশী দফাদার	লালদহ শিবগঞ্জ
২২। ইসমাইল	লালদহ শিবগঞ্জ
২৩। আহসান আলী মুন্সী	ধুনট
২৪। গোলাম রব্বানী	ধুনট
২৫। আব্দুল কাদের	ধুনট

২৬। ইয়ার মোহাম্মদ ধুনট
২৭। পলান ধুনট
২৮। মোজাম্মেল হক ধুনট
২৯। ইদ্রিস ডাক্তার ধুনট
৩০। কোরবান আলী ধুনট
৩১। মজিবুর রহমান পাকড়ীহাট্য, ধুনট
৩২। মানতাজ ধুনট
৩৩। আব্দুর রহমান ফকির ধুনট
৩৪। ওসমান গনি ওরফে ওসমান বিহারী বগুড়া সদর
৩৫। আব্দুর রউফ (গ্রাম ডাক্তার) গাবতলী পূর্ব পাড়া।
৩৬। মাহফুজুল হক নামাজগড় বগুড়া।
৩৭। আয়েজ উদ্দিন শেখ পূর্বভরনশাহী – ধনুট
৩৮। মতিগোকুল বগুড়া
৩৯। তাহের মাওলানা গোকুল বগুড়া
৪০। শমসের আলী (রাজাকার কমান্ডার) – গাবতলী
৪১। আব্দুল আলিম জয়পুরহাট
৪২। আনোয়ার হোসেন (ওসমান বিহারীর ভাতিজা) বগুড়া সদর
৪৩। ইকবাল হোসেন (ওসমান বিহারীর ছেলে) বগুড়া সদর
৪৪। জয়েন উদ্দিন ওরফে জুন– জলশুকা গ্রাম মাদলা
৪৫। আবুল কালাম ওরফে জলশুকা, খোট্টাপাড়া– মাদলা ইউনিয়ন। শাহজাহানপুর উপজেলা
৪৬। সিরাজুল ইসলাম (খোট্টাপাড়া মাদ্রাসা সুপারিন্টেন্ডেন্ট) খোট্টাপাড়া– মাদলা ইউনিয়ন।শাহজাহানপুর উপজেলা
৪৭। আকুল জলেশ্বরীতলা বগুড়া
৪৮। কাইল্যা মজিদ বগুড়া সদর
৪৯। নজমল ওরফে নাজমুল মাদলা – শাহজাহানপুর উপজেলা
৫০। আসলাম হোসেন বিহারী বগুড়া সদর
৫১। আব্দুল খবির জোয়ারদার কুন্দইশ – ডেমাজানী
৫২। আতাউর রহমান জোয়ারদার – কুন্দইশ শাহজাহান পুর উপজেলা
৫৩। বাচ্চু চেয়ারম্যান সোনারায় ইউনিয়ন, সাতশিমুলিয়া গাবতলী
৫৪। আব্দুল মোমিন তালুকদার – কাহালু (এখন জামাতের রোকন), (আলবদর বাহিনীর কমান্ডার)
৫৫। ইদ্রিস মাওলানা চমরগাছা। পৌরএলাকা সোনাতলা
৫৬। মুহিব মেম্বার মহিপুর
৫৭। মন্টু রাজাকার ধুনট
৫৮। আসলাম হোসেন বিহারি (II)

পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ

১৮ ডিসেম্বর

বগুড়ার সাতমাথায় ট্যাঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিরান শহর ও শহরতলী। তখনও লোকজন বুঝে উঠতে পারেননি বগুড়া স্বাধীন হয়েছে। আমি বগুড়ার ছেলে বগুড়া আমার নিজস্ব শহর। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো এই ভেবে যে, প্রথম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমিই সাতমাথায় পা রেখেছি। ইতোমধ্যে দু'চারজনকে পাঠিয়ে দিলাম আশেপাশের গ্রামে যাতে সবাই জানতে পারে বগুড়া এখন শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন। কর্নেল দত্ত আমাদের জানালেন, বগুড়ার ওয়াপদা ডাক বাংলার মাঠে অফিসিয়ালি পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করবে কিন্তু তার আগে আমাকে ও ক্যাপ্টেন বর্ষণ সিং কে যেতে হবে বগুড়া কলেজে অবস্থানরত পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করাতে। ট্যাঙ্কও এক কোম্পানি সৈন্যসহ আমরা বগুড়া ডিগ্রি কলেজে গিয়ে হাজির হলাম। পৌঁছে দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড কারখানা। গোটা ডিগ্রি কলেজ পাকসেনা ও তাদের পরিবারের দখলে। একজন কর্নেল ও জনকয়েক মেজর, ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কের অফিসারদের দেখলাম। কর্নেল সাহেব আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না পাকিস্তানের মতো এক শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের মতো মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে। সে আরও অবাক হলো যখন শুনলো আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং তাকে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমার পরনে একটা পুরনো রঙচটা প্যান্ট। পায়ে ক্যানভাসের জুতো, আমার পোশাকের দৈন্যতা দেখে সে পাকিস্তানী উন্নাসিকতায় কথা বলতে লাগলো।

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'কর্নেল আমার শরীরে হয়তো তোমাদের মতো কড়া ইস্ত্রি করা সুন্দর পরিপাটি পোষাক নেই, কিন্তু আমার পোষাক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, আমার পায়ে হয়তো তোমাদের মতো চকচকে পালিশ করা বুট নেই কিন্তু আমার এই ক্যানভাসের জুতো তোমাদেরকে নয় মাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, আমাদের হাত দুটো হয়তো তোমাদের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু এই হাত দুটো তোমাদের হাতের মতো নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেনি, নির্বিচারে নিরাপরাধ মানুষ খুন করেনি, আমাদের এই হাত দুটো স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরেছে, এক হানাদার বাহিনীর সংগে ন'মাস যুদ্ধ করেছে এবং তাদের পরাজিত করেছে। এখন তোমাকে আমার এই হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।'

ডিগ্রি কলেজ থেকে পাকসেনাদের অস্ত্র গোলাবারুদ বুঝে নিয়ে যখন ওয়াপদা ডাকবাংলোয় এলাম তখন পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ কে তার নাটোর হেডকোয়ার্টার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এদিকে মিত্রবাহিনীর ২০ মাউনটেইন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লচমন সিংও উপস্থিত হয়েছেন।

২০ মাউন্টেইন ডিভিশনের অনেক অফিসার ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে আমি নিজে

দাঁড়িয়ে দুই সেনাপতির ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করতে দেখলাম।

বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। শত্রুমুক্ত।
অনেক রক্তের বিনিময়ে এল স্বাধীনতা। এল মুক্তবায়ু মুক্তপ্রাণ, মুক্ত নিঃশ্বাস। ওয়াপদা ডাকবাংলো থেকে বগুড়া স্টেডিয়ামে নিজের ক্যাম্পে ফেরার পথে দেখলাম, জনতার ঢল নেমেছে শহরে। দলে দলে পরিচিত অপরিচিত লোক এল আমাকে অভিনন্দন জানাতে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রতিটি বাড়িতেই পত্‌পত্‌ করে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

তথ্যসূত্র : জলছবি '৭১ হামিদুল হোসেন তারেক, বীরবিক্রম।

রণাঙ্গনে নারী মুক্তিসেনা

মুক্তিযোদ্ধা বলতে সশস্ত্র যোদ্ধাকেই বোঝানো হয় না। ব্যাপক অর্থে বিশ্লেষণ করতে গেলে এ কথাটির অর্থ এমন দাঁড়ায়, দেশকে স্বাধীন করার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা যুদ্ধে দেশকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের রণাঙ্গনে নারীরা যুদ্ধে সরাসরি হয়তো অনেকে অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু রান্না করে, আহতদের সেবা শুশ্রূষা করে পরম যত্নে যাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্ন, অস্ত্র হাতে তুলে দিয়েছে সে সব মমতাময়ী নারীর দেশমাতৃকার প্রতি ভূমিকার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অক্ষয়।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে এমন একজন নয় দুজনকে পাওয়া গেছে যারা দেশকে যুদ্ধের সময় এমনি করেই সাহায্য করেছে। একজন শিরিন অন্যজন ডলি শিরিন মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে শরণার্থীদের চিকিৎসা। নানা ধরনের সেবা দিয়েছেন। শিরিন মেডিকেল কলেজে পড়তেন। ফলে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। ডলি করতেন ছাত্র ইউনিয়ন। শরণার্থীদের ও মুক্তিযোদ্ধাদের তারা সেবা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বগুড়াও শত্রুমুক্ত। কিন্তু কাহালুর মেয়ে শিরিন এর খবর কেউ আজ আর জানে না। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কর্ণিয়া দান করার বিষয় নিয়ে ডলি ছিলেন সারাদেশে নন্দিত। কবি মহাদেব সাহা তাকে নিয়ে পত্রিকায় লিখেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বিষয়টি নিয়ে খবর ছাপা হয়েছে। তার কথা প্রভাবেই ধরেছেন তিনি।

সমরাঙ্গনে আমার সেই দিনগুলি

যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন বগুড়ায় চলে আসি। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বড় তিন ভাই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এ ভারতে চলে যাবার কারণে আমার মা-বাবা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। ভাবত কে জানে কোন মুহূর্তে আমাদের পরিবারের ওপর বিপদ নেমে আসে। একদিন হলোও তাই। আমাদের বাড়ি ছিল বগুড়া শহরের গোহাইল রোডের ঘোড়াপট্টিতে। পাঞ্জাবি পাষণ্ডরা একদিন আমাদের বাড়িসহ পুরো এলাকায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আমাদের পরিবার বাধ্য হয়ে বগুড়ার সাত শিমুলিয়ায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানেও আমরা হানাদার পাক আর্মি ও রাজাকারদের কারণে টিকতে পারি নাই। খানসেনারা হামলা করে বসে। বাবা-মা আমাদের আগলে রাখেন। সারাক্ষণ আমরা খাটের নিচে লুকিয়ে থাকি। এভাবে জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। আমার মা ছিলেন নির্ভীক। আমাদের বলতেন ইঁদুর বিড়ালের মতো মরার চাইতে যুদ্ধ করে

দশজনকে মেয়ে মরে যাওয়াটা অনেক গৌরবের। আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেশি দিন থাকতে পারলাম না। রাজাকাররা আমাদের থাকতে দিল না। বাবা একদিকে ছিটকে গেল। মায়ের হাত ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে আসামের গোয়ালপাড়ায় আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। সেখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শরণার্থী শিবির। এক পাশে মাইনকার চর। মুক্তিবাহিনীর বিশাল ক্যাম্প। তিন হাজার থেকে চার হাজারের মতো মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে থাকে। ভারতের বিভিন্ন যুবসংস্থা থেকে যুবকরা শরণার্থী শিবিরের তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু হাজার হাজার শরণার্থীর ভিড়ে গুটিকয় স্বেচ্ছাসেবক ভাইরা দিন-রাত কাজ করে হাঁপিয়ে উঠছিল। ভাবতাম দিনরাত এভাবে বসে না থেকে আমিওতো ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারি। দেশের জন্য এটাওতো কিছু করতে পারা। একদিন মায়ের পাশে শরণার্থী শিবিরে খাবারের অপেক্ষায় বসে আছি। দেখি একজন স্বেচ্ছাসেবক হাজার হাজার শিশুর লাইনে দুধ বণ্টন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। চারপাশে একটা বিশৃঙ্খলা। আমি তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়লাম। ওর সাথে সহযোগিতা করলাম। সেই শুরু। আমি দেখছিলাম শিশুদের, যারা অন্য দেশে মা-বাবা হারা আমি তাদের বুকে তুলে নিলাম। এভাবে কাটছিল যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলো। আমার ছোট দুইভাই মাহফুজুর রহমান দীপু ও টিপু বালুর ঘাট ক্যাম্পে ট্রেনিং নিচ্ছে। জাানি না ওদের কোনও খবর। আরেক ভাই কোথায় তাও জানি না। অস্থির সময় কাটে। হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল রণাঙ্গনে। ঘন বর্ষায় হাঁটা। কাদা ঠেলে কাঁটা ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে আমাকে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শুশ্রূষার জন্য। ক্লান্তিহীন সে দিনগুলো পার করেছি নিজের ভেতরের তাগিদে। শরণার্থীশিবির আর আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রুষার ফাঁকে ফাঁকে মুক্তিবাহিনীদের ট্রেনিং ক্যাম্পে ছুটে যাই কাজ দেখি। মাত্র ১০/১৫ দিনের মধ্যে S. L. R চালাতে শিখি। গান কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তার কৌশলও আয়ত্তে। ক্যাম্পের ভাইরা আমাকে রণাঙ্গনে অস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করে। মুক্তিযোদ্ধারা কেন বলেছিলেন জানি না। মেয়েদের শিবিরে, অসহায় অনাথ শিশুদের কাছে ছুটে গিয়েছি আমার যথাসাধ্য সেবা দিয়েছি। আমার অপেক্ষায় শরণার্থীশিবিরের সবাই বসে থাকত। কখন দুধের বোতল আনব, কখন তাদের সবার খাবার জোগাড় করব। অসুস্থদের পথ্য দেব। ঔষুধ দেব। আহত মুক্তিযোদ্ধারা বসে থাকতেন আমার জন্য। পায়ে মর্টারের গোলা পড়ে বৃদ্ধ পঙ্গু-লোকটির চোখে ছিল ভাল হয়ে ওঠার আকুতি। আমি রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাই। পারি না। আমার মনে পড়ে আমার পিঠেপিঠি ছোট ভাই বগুড়ায় থাকতে আমাকে প্রথম যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়। ও ভালো আঁকতে জানত। কাগজ কলম নিয়ে হাতে কলমে সে আমাকে দেখাত নানা অস্ত্রের ছবি এঁকে। কোনটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কখন ট্রেন্ড আপ করতে হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে বগুড়ায় যখন মুক্তিযোদ্ধারা মরিয়া তখন আমার কাজ ছিল রাতে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা। কার বাড়িতে কোথায় রাখব তা আমার সিদ্ধান্ত। মিলিটারিদের দেখলেই বলতাম আমি আর্মিদের মোকাবেলা করব। আগে আমার বুকে গুলি চলবে তারপর সবাই। ওকে বলতাম, তোর অনেক কাজ আছে তোকে বাঁচতে হবে এভাবে ওকে বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। ২২ সেপ্টেম্বর শবেবরাতের

আগে ওকে হারিয়ে ফেলি। আর দেখা হয়নি। অস্ত্র আনতে ভারতে যাবার কথা বলে বেরিয়ে ছিল। ফেরেনি আজও। জানি না ও কোথায় আছে কি ঘটেছিল ওর ভাগ্যে। শেষ পর্যন্ত ওকে হারাতেই হলো।

শরণার্থী শিবিরে শত শত তরুণ কিশোররা অপেক্ষা করত। তাদের সবাই দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। ক্যাম্পের ট্রেনাররা, কমান্ডাররা আনফিট বলে ওদের বাতিল করে দেয়। আমায় এসে ধরে। আমি ওদের বলে দিলে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়তো হবে। এভাবে সবার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতাম। এরপর আমাকে আমাদের ক্যাম্প কমান্ডার নতুন এক দায়িত্ব দিলেন। যেসব তরুণরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ক্যাম্পে আসবে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্রেনিং কেন্দ্রে পাঠানো। এ ছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মিলিত কমিটির সিদ্ধান্ত সমগ্র শিবিরের ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্বও আমার ওপর পড়ল। আমি চিন্তা করলাম এখানে তো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প দেখি। আর কী করা যায়। অনেক মেয়েই এখানে বসে আছে। তখন বাংলাদেশের মধ্যে রৌমারী এলাকাটাই ছিল মুক্ত এলাকা। আমি রৌমারী চলে গেলাম। ওখানকার যারা গুরুদায়িত্বে ছিলেন তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম বললাম মহিলাদের কী করে দেশের কাজে লাগান যায়। এখানে প্রত্যেকটা রিফিউজি ক্যাম্পে অসংখ্য মেয়ে ছিল ওদেরই কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। সারাদিন এগুলো করে সন্ধ্যায় নিজের শিবিরে ফিরে যেতাম।

দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ চলছে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত্র। কোন রিফিউজি বাংলাদেশে আসতে চাচ্ছিল না। তখন চিলমারী, রৌমারীর ছক্কু মিয়া সংসদ সদস্য। তিনি রিফিউজিদের এ ব্যাপারে বোঝানোর জন্য বিশাল এক সমাবেশের আয়োজন করেন। সবাই বলছিল আমরা দেশে ফিরে যাব না। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা কে দিবে। ওদের এমন কথায় ছক্কু মিয়া বললেন ডলি আপনি মঞ্চে এসে ওদের জন্য কিছু কথা বলেন। ওদের আপনিই বোঝাতে পারবেন। আমি মাইকের সামনে প্রথম দাঁড়ালাম। বললাম আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বরের পতাকা আমাদের ঘরে ঘরে। আমাদের আর কোনও শত্রু নাই। আমরা সবাই বন্ধু। আমরা আমাদের ভাঙাচুরা দেশকে গড়ব নতুন করে। আমার নৌকা আগে যাবে তারপর আপনাদের নৌকা পরে যাবে (তখন দেশে ফিরতে হলে সীমান্ত পার হয়ে সারিয়াকান্দীর যমুনা নদী পার হয়ে দেশে প্রবেশ করতে হতো)।' আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমাদের দেশের বিপদগ্রস্ত মানুষেরা এসেছিল। আগে আমার নৌকা। তারপর রিফিউজি ভর্তি সারিবন্ধ অনেকগুলো নৌকা। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আজও চোখ বন্ধ করলে খুব ভালো লাগে। আমি ছোট্ট একটা মেয়ে ছিলাম। আমার কথা শুনে নানা বয়সী মানুষেরা আমার পেছনে এসেছে আমাকে নির্ভর করে।

আসামের ক্যাম্পে যখন ছিলাম আমাদের সেকটর কমান্ডার ছিলেন হামিদুল্লাহ খান। সাহেদ ভাই, খসরু, সুবেদার শাহজাহানসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে তখন পানিহাটাতে যুদ্ধে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। বসে থাকতে তো পারিনি। ওখানে মিল্ক ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাম্পে রেডক্রস থেকে দুধ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এগুলো আসত আসাম থেকে। আমি

বাংলাদেশের সব রিফিউজি ক্যাম্পে শিশুদের ও বয়স্কদের জন্য দুধ সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থাটা করতে পেরেছিলাম বলে গর্বিত বোধ করতাম।

আমার জীবনে মুক্তিযুদ্ধে ঘটে যাওয়া অনেক কষ্টকর হৃদ বিদারক ঘটনা রয়েছে। আমাদের গ্রামের বাড়ি সাত শিমুলিয়ার লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়নের পর সোনারায় ইউনিয়নের মাঝামাঝি পীরগাছা পার হয়ে একটা বাড়ি। ওখানে পাক আর্মিরা ঢুকে পড়েছিল। এখানে এর আগেও পাক আর্মিরা ঢুকেছিল। খাবার সংগ্রহসহ মেয়েদের সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। একটি সন্তানসম্ভবা ২০ বছরের মেয়ে যার ডেলিভারী ফাইনাল স্টেজে ছিল সে মেয়েটি ভয়ে ঘরের ভেতর বাঁশের তৈরি চৌকির নিচে লুকিয়ে ছিল। পাক আর্মিরা তাকে ওখান থেকে বের করে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ফলে বাচ্চা প্রসব হয়ে যায়। পাক মিলিটারিরা সদ্য প্রসবকৃত বাচ্চাটিকে বেয়োনেট চার্জ করে মেরে ফেলে পরে ঐ মেয়েটিকেও বেয়োনেট চার্জ করে। আর্মিরা চলে গেলে এ মেয়েটিকে দেখতে যাই। লাশ ধুয়ে তখন তার আত্মীয় স্বজনরা তার দাফনের ব্যবস্থা করেছিল। এ ঘটনা আমার ভেতর তীব্র আক্রোশের সৃষ্টি করেছিল।

যুদ্ধের দিনগুলোর আরও দুটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। একটি হলো, আমরা ভারতে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সারিয়াকান্দির একটি বাড়িতে। ওখানে আধা মাইল পরপর সেন্ট্রি পাহারা থাকত। অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা। ওদের কৌশল ছিল মিলিটারিরা এদিকে এলে পাহারাদাররা আমাদের সবাইকে খবর দিবে। আমরা পালিয়ে যাব। একদিন ভোরবেলা আমরা যে বাড়িতে অবস্থান করছিলাম সেখানে ফজরের আযানের পরপরই আমার বড়বোন নামাজ সেরে উঠেছে। ভোরের সূর্য সবেমাত্র উঠতে শুরু করেছে। একজন অল্পবয়সী লোক ১৭/১৮ বছর বয়স ভিক্ষা চাইতে এসেছে। কিন্তু আমার বোন লক্ষ করে এই ভোরবেলাতেই তার ব্যাগে দেড়-দুই সেরের মতো চাল। বোনের সন্দেহ হওয়াতে মুক্তিযোদ্ধা অহসান হাবীব দিপু (কালো দীপু নামে পরিচিত) ওকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো। সন্দেহের কথা জানানো হলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কে চার্জ করা হবে। এ লোকটি নিশ্চয়ই আমাদের এ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা আছে কিনা তা জানতে এসেছে। ঐ লোকটিসহ আরও একজনকে ধরে দীপুরা সারিয়াকান্দির একটি চরে নিয়ে গিয়ে সারাদিন বেঁধে রাখে। নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু লোকগুলো একটিও কথা বলে না। দিপুরা ঐ লোকদের কালেমা পড়তে বলে। লোভ দেখানো হয় লা ইলাহা ইল্লালাহ বললে ছেড়ে দেয়া হবে। ওরা কিছুই বলে না। পরবর্তীতে আমরা ওদের L (এল) প্যার্টানে মারার প্লান করলাম। ভিক্ষুকটিকে বস্তা বন্দি করে যমুনা নদীতে ফেলে দেয়া হলো।

আরেকটি ঘটনা ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। তখন দেখেছি মানুষের জীবনটা কত প্রিয় তার নিজের কাছে। জীবন বাঁচাতে তার নিজ মেয়েকে পাক আর্মিদের হাতে তুলে দেবার ঘটনাও যুদ্ধের সময় ঘটেছে।

সোনারায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ জলেশ্বরী তলার বাড়িতে পাক আর্মিদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। প্রায়ই পাক আর্মিরা তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় এসে খাওয়া দাওয়া করতেন। তার ছোট মেয়েকে দিয়ে একদিন খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

একজন লোক এসে চেয়ারম্যানের কানে ফিসফিস করে বলে পাওয়া যায়নি। পাক আর্মির একজন বলে। ইয়ে কোন হ্যায়, আরে ইয়ে সুন্দর হ্যয়, আচ্ছা হ্যায়। হামারা বাংলোমে ভেজ দো।' বাবা বাধ্য হয়ে তার মেয়েকে আড়িয়াবাজার পাক মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে। ওনার মেয়েটি এরপর মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধারা ওনাকে হত্যা করতে চাইলে তার মেয়েটি বলেছিল এই নরাধমকে বাঁচিয়ে রাখলে বাংলাদেশ অপবিত্র হয়ে যাবে। চেয়ারম্যান এ কথা শুনে বলেছিল, আমি পাপী তোমরা আমাকে মারো। নইলে আমার আত্মা কষ্ট পাবে। ১৬–১৭ বছরের মেয়েটির ঘৃণামিশ্রিত এ কথা শুনে মুক্তিযোদ্ধারা ঐ চেয়ারম্যানকে হত্যা করে। চেয়ারম্যানের এক ছেলেও পাক আর্মিদের দোসর ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। মুক্তিযোদ্ধারা তাকেও হত্যা করে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত থেকে ফিরে একমাস অসুস্থ ছিলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সেখানকার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভর্তি করা হয়েছিল। আমাদের ওয়ার্ডের ওপরের তলা ছিল চোখে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের জন্য। প্রায় ২০০ আহত মুক্তিযোদ্ধা ওখানে ভর্তি ছিল। তাদের চোখে নানা সমস্যা ছিল। বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল হক দুলাল আমার ছোট ভাই দীপুর সহযোদ্ধা, ওর তখন চোখে এক্সপ্লোসিভ লেগে চোখের কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নার্ভও শুকিয়ে গিয়েছে। ও আমাকে একদিন ডেকে বলল, ডলি আপা আমার চোখের উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাকেতো রাশিয়া পাঠানো হয়েছিল। চোখ ঠিক হলো না। রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনও দেশে আমাকে পাঠালে' চোখের সমস্যা দূর হতো চোখ ভালো হতো। একটা ব্যবস্থা যদি করতেন।' – ওর বার বার অনুরোধে আমার মন টলে উঠল। ভাবলাম দেখি কি করা যায়। আমি তখন রোকেয়া হলে থাকতাম। ওখানে এক চোখ বন্ধ রেখে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম আমাদের দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যদি একটু উপকার করি তবে মন্দ কি। আমি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে (ঢাকা মেডিকেল) গেলাম। বললাম তোরা সব রেডি থাকবি। আমরা বঙ্গভবন ঘেরাও করব। ওদের দেড়শজন আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং আমি গেলাম। সবাই ঘিরে আছে। আমি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম বাইরে। শেখ মুজিব ভেতরে মিটিং করছিলেন। দেখলাম সদলবলে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। আমি দুলালের হাত ধরে শেখ মুজিবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিকিউরিটিরা আমাদের ঢুকতে দিচ্ছিল না। বাঁধা পেয়েও আমরা দাঁড়িয়ে তাদের বোঝাচ্ছিলাম যে আমাদের দাবির কথা সরাসরি শেখ মুজিবকেই বলব। শেখ মুজিব আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের ভেতরে আসতে বললেন। কাছে যেতেই বললেন, ' মা তুমি কী জন্য এসেছ? – আমি দুলালকে স্বেচ্ছায় আমার বামচোখের কর্ণিয়া দান করতে চাই।' এবং বাকি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসা চাই। এরা আপনার বঙ্গভবন ঘেরাও করে আছে। ওদের উন্নত চিকিৎসা হলে তারা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। আমার কথা শুনে তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে থাকলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুইজারল্যাণ্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অর্ডার দিলেন। তিন

দিনের মধ্যে পাসপোর্ট রেডি হলো ২০০ জনের সবাই সুইজারল্যান্ড চলে গেল উন্নত চিকিৎসার জন্য। অনেকের চোখের সমস্যা শেষ হয়। উন্নত চিকিৎসা হয়। দুলালের চোখ আর ভালো হয়নি। কিন্তু আমি যে ওদের জন্য কিছু করতে পেরেছি এটাই আমার ভালো লেগেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন হাজারো বিচ্ছিন্ন ঘটনা আছে। আমরা ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধাদের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম যুদ্ধের সময়। আমাদের দলের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় প্রতিরাতে অপারেশন করতো। কালভার্ট ব্রিজ উড়িয়ে দিত। পাক আর্মিদের আক্রমণ করত। আমরা যখনই যে গ্রামে গেছি রাজাকার আলবদরের সৌজন্যে মিলিটারিরা তা জানতে পারত। আক্রমণ চালাত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে আমরা পালিয়ে বেড়াতাম। পাক আর্মিদের কবল থেকে অনেকবার মরতে মরতেও বেঁচে গেছি। এভাবে যুদ্ধের নয়টি মাস আমার কেটেছে।

সাক্ষাৎকার ফেরদৌস পারভীন ডলি। মুক্তিযোদ্ধা। গ্রাম: সাত শিমুলিয়া। পো: ভবানীগঞ্জ। জেলা: সদর (বগুড়া সদর)

প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে

অপারেশন বামুজা : রতন খান

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর ভয়াল রাত্রির পরদিন একে একে মা-বাবা, ভাই-বোন, মামা-খালু ও তাদের সন্তানদের নিয়ে বগুড়া শহর ছেড়ে রওনা দেই, গন্তব্য আমাদের বাড়ির কাহালু থানার দূর্গাপুর ইউনিয়নের থলপাড়া গ্রাম। ছয়/সাতটি পরিবারের প্রায় অর্ধশতেক মানুষের একত্রে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা শহরের পাকিস্তান আর্মি নির্বিচারের মানুষ হত্যা করছে এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সে ছিল বিভিষীকাময় দিন।

এ অবস্থা কতদিন চলবে তা অজানা। তাই জ্বালানী সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করে সন্ধ্যার পূর্বেই শহর ছেড়ে দলে দলে মানুষ গ্রামে ছুটছেন, একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। গ্রামের মানুষও নিজেদের উজাড় করে দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছাত্র-জনতা সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন স্থানীয়ভাবে। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জনতার একনলা/দু'নলা বন্দুকের প্রাথমিক প্রতিরোধ তাই স্থায়ী হল না।

ছাত্র-জনতা দমবার পাত্র নয়। তাদের মনে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার অদম্য আশা। জীবন এখানে তুচ্ছ। তাই তারা ছুটল প্রতিবেশী দেশ-ভারত। সংগঠিত হল, সমরাস্ত্র চালালোর প্রশিক্ষণ নিল, ফিরে এলো দেশে। সবাই ছিল স্বাধীনতার পক্ষে শুরু হল গেরিলা এবং সম্মুখযুদ্ধ। গুটিকতক রাজাকর, আলবদর, আলশামস্ ছাড়। আমার দেখা একটি সম্মুখ যুদ্ধের কাহিনী আজ আপনাদের শোনাব। নির্দিষ্ট করে তারিখটা মনে করতে না পারলেও সময়টা যে সেপ্টেম্বর মাসের শেস দিকে তা নিশ্চিত। আমাদের গ্রাম লাগোয়া বামুজা গ্রামের মোজাম্মেল এর বিশাল মাটির দোতলাবাড়ির দোতলায় যে অধ্যক্ষ হোসেন আলীর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছে এবং আশাপাশে অপারেশন চালাচ্ছে তা ইতোমধ্যে প্রায় এলাকায় জানা হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দিনে ঘুমায়, রাত্রে অপারেশনে যায়। আজ ব্রিজ উড়ানো, কাল পাকসেনাদের ক্যাম্পে হানা, পরদিন তথাকথিত শান্তিকমিটির চেয়ারম্যানকে হত্যা। এই দলটি কাহালু থানা এবং তার আশাপাশের এলাকায় পাকসেনা ও তাদের দোসরদের তটস্থ করে রেখেছিল।

ঘটনার দিন ছিল শনিবার। কাহালু থানা সদরের হাটের দিন। হাটেই থলপাড়া গ্রামের রফিক শেখ গোপন খবর পেলেন খানসেনা এবং রাজাকারের এক যৌথবাহিনী তার বিষাই বাড়ি অর্থাৎ বামুজা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসস্থলে অভিযান চালাতে যাচ্ছে। হাট করা রেখেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওনা দেন বামুজা গ্রামের উদ্দেশ্যে, যত দ্রুত সম্ভব সংবাদটি মুক্তিযোদ্ধাদের পৌছানো প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় থানা শহর থেকে ৩/৪ মাইল দূরে ওই অজগ্রামে পায় হেটে যেতে হয়। পাকসেনাদের

পৌছানোর ১০/১৫ মিনিট পুর্বে পাকসেনাদের আগমনের সংবাদ পান মুক্তিযোদ্ধারা। বেলা তখন প্রায় ৩টা। দু'জন বাদে সকল মুক্তিযোদ্ধা তখন ঘুমিয়ে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হয় জেগে থাকা দু'জন মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি নিয়ে গ্রামের প্রবেশদ্বারে সাময়িক প্রটেকশন দেবে, যাতে করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে বাকি মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে ২০/২৫ জনের পাকসেনা ও রাজাকারের দলটি বামুজা গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌছে। ততক্ষণে গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। শুধু বামুজা গ্রাম নয়, আশপাশের ২/৪ গ্রাম মানুষশূন্য। পজিশন নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের রেঞ্জের মধ্যে পাকসেনার দল চলে এলেই প্রথম ব্রাশফায়ার করে মুক্তিযোদ্ধারা। প্রথম ফায়ারেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দু'জন পাকসেনা এবং এক রাজাকার। বাকি পাকসেনা ও রাজাকাররা এক বুক লম্বা ধানক্ষেতের আইলে পজিশন নেয় এবং শুরু করে বৃষ্টির মত গুলি। আচমকা আক্রমণের জন্য সম্ভবত প্রস্তুত ছিল না পাকসেনারা। প্রায় দু'ঘণ্টা উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় চলে। এক সময় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায় এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও নিরাপদ দূরেত্বে চলে যেতে সক্ষম, হয়। গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে গেলেও আমরা গ্রামেই ছিলাম। বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে তালগাছের আড়াল থেকে সমস্ত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি। আমার পাশ দিয়ে গোলা যখন বাঁশঝাড়ে লেগে বাঁশগুলো ফাট্ ফাট্ করে ফেটে চলে যাচ্ছিল, তখন আমি কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে শিহরণ অনুভব করেছি। নিজে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও গোলাবারুদের বাক্স বহন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছি। গোলাগুলি থেমে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর যখন আমরা নিশ্চিত হলাম পাকসেনা ও রাজাকাররা নিহত সহযোদ্ধাদের নিয়ে থানা হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেছে, তখন আমরা গ্রামবাসীদের নিয়ে বামুজা গ্রামে ঢুকলাম। পাকসেনা কর্তৃক জ্বালানো বাড়িঘরের আগুণ নিভালাম। পাকসেনা ও রাজাকার মৃত্যুর সংবাদে গ্রামেই বিজয় করলাম আমরা এ যুদ্ধের নাম দিলাম "অপারেশন বামুজা"

বাংলাদেশের হাজারো রণক্ষেত্রের মত "অপারেশন বামুজা" হয়তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়নি, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে আমরা গর্বিত, কারণ আমাদের এলাকায় পাক হানাদারবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হয়েছে। আমরা আমাদের সন্তানদের শোনাই সেই গর্বের কথা।

তথ্যসূত্র : আমাদের একাত্তর, সম্পাদনা   মহিউদ্দিন আহমদ

আমিও জেগে উঠি– শোয়েব শাহরিয়ার

জুলাই-আগস্টের দিকে জয়পুরহাট তথা গোটা পশ্চিম বগুড়ার বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছিল পাকিস্তানিরা। চোরাগুপ্তা হামলার রুট ছিল ঐ এলাকা। বাধ্য হয়ে তখন বগুড়া এলাকার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীকে যুমনা নদীর উজান বেয়ে আসামী পাহাড় আর গহীন জঙ্গল পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যেতে হত। দ্বিতীয়বার যখন যাবার সিদ্ধান্ত হল তখন সারিয়াকান্দির হাট-শেরপুর থেকে একটা বড় নৌকা ভাড়া করে এক সকালে আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যাত্রা শুরু করলাম। নদীতে তখন ঘোর বর্ষার জলের প্রচণ্ড তোড়।

৭১ এর বন্যা ছিল সীমাছাড়া। একসময় জলের আক্রমণ পাকিস্তানি বর্বরদের কোণঠাসা করেছিল। বাতাস পড়ে গেলে তীব্র স্রোতের উল্টোদিকে গুণ টেনে টেনে যেতে হত। নৌকার গতিও হয়ে পড়ত পিপড়ের মত শ্লথ, গতিহীন। স্রোতের গতি ও ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, ঢেউ আর বিস্তীর্ণ জলরাশির কাছে আমাদের নৌকাকে স্থবির বলে মনে হত। দূরে আরো দূরে ছায়ার মত মাছ ধরার ছোট ছোট নৌকাগুলো স্রোতে ভাসত। নৌকা, নদীর ভাঙ্গা পার, পাড়ের জনগণ, কুঁড়েঘর, অসংখ্য ছেলেমেয়েদের কোলাহল, মাঠে কর্মরত অদূর গাঁয়ের মানুষগুলো দেখলে হঠাৎ করে ভূলে যেতে হয় দেশে এ-রকম একটা ভয়াবহ ধ্বংসঙজ্ঞ চলছে।

মাঝে তিনজন। পালা করে গুন টানে। তিনজনের একজন অবসরে থাকে এবং নৌকার সাথে হেঁটে হেঁটে চলে। খেয়াল করিনি দুদুমাঝি একটু পেছনে পড়ে গেছে। হঠাৎ করে শুনি দুদুশাঝি নৌকার দিকে দৌড়াচ্ছে আর গলা ফাঁটিয়ে চিৎকার করছে, নৌকা থামাও বড়চা, লৌকা থামাও। তিনি শুনতে পেলেন আচিরে একটু সজাগ করতেই সত্যিসত্যিই গর্জনরত শব্দকে ক্রমশ জোরালো হতে শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাঝি দু'জন গুন ছেড়ে আমাদের ডাকতে লাগল, তাড়াতাড়ি নামেন, তাড়াতাড়ি নামেন। বাঁচতে চান তো তাড়াতাড়ি নামেন। গুণ টানার কারণে নৌকা পার ঘেঁষে সামনে এগোচ্ছিল। আমি দ্রুত নেমেই একটা আলোর আড়ালে মাটি কামড়ে শুয়ে পড়লাম। কড়কড় শব্দে ঘেঁষে সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে তোলপাড় করে দুটো প্লেন প্রথমে বার দুই চক্কর মারল মাথার ওপর। শুয়ে শুয়ে আড় চোখে দেখলাম বাজপাখির ছোঁ এসে গেল। আর একটু হলেই জলে অবগাহন। ভাবগতিক দেখে যেন মনে হয় ওরা জলকেলি অথবা মৎস্য শিকারের লোভে ছুটে এসেছে এখানে। তারপর হঠাৎ ক্যাট ক্যাট.....॥ যমুনার মাঝ বুকে ছইওয়ালা নৌকা, যেগুলো ভাটির টানে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল তাদের লক্ষ্য করে ক্যাট শব্দ। বৃষ্টির মত। মূহুর্তের মধ্যে পচে যাওয়া মানুষের শরীর থেকে মাংসপিন্ডু যেমন করে খসে পড়ে তেমনি নৌকাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভেতরের মানুষগুলো মুক্তিযোদ্ধা না সাধারণ মানুষ ছিল জানি না। ওরা বেঁচে থাকল না মরে গেল, না বাঁচার আর্তনাদ করল আমি আজও জানি না। একটু পরে দেখলাম দানব পাখি দুটো দায়িত্ব সেরে দ্রুতগতিতে দিগন্তের পারে হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ঘটনার স্থানটাকে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চলমান স্রোতের তোড়ে নৌকার ছিন্নভিন্ন খন্ডাংশগুলো কোথায় কীভাবে ভাসছে বা তলিয়ে যাচ্ছে তা জানা হল না। শুধু মনে হলো সেই মুহুর্তে যমুনার বুকের যে খানিকটা পানি লাল রঙ ধারণ করেছিল, এতক্ষণে তা অনিঃশেষ জলধারার সাথে মিশে গিয়ে ঘোলাটে সাদা রং ধারণ করেছে।

সারাদিন ভয় আর কষ্টে নিজের ভেতরে নিজেই মৃত ইদুরের মত অচেতন পড়ে থাকলাম। সন্ধ্যায় রংপুরের কোনো এক মুক্তচরের মধ্যে স্রোতহীন হ্রদ বরাবর একটি জায়গায় রাত্রি যাপনের জন্য নৌকা ভেড়ানো হল। রাত কাটানোর জন্য এই মুক্ত চরে প্রায় ৫০/৬০ টি নৌকা গা ঘেষাঘেষি করে রাখা ছিল। নিশুতি রাত। চরে সমাকীর্ণ বালুরাশি, যমুনার জল এবং তার সাথে মোমের মত মধূময় স্ফটিক আলোর ফোয়ারা যে কোন মানুষের জন্মান্তর ঘটানোর মত চমকে উঠবে এমন। সরাদিনের ক্লান্তির আর

অবসাদের কারণে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে। ঘুম আসছিলনা। কী অব্যক্ত ঘোর যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। হঠাৎ করে যেন একটা সুর বা সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজ। কান সজাগ হয়ে উঠল। পরিষ্কার শুনতে না পেরে আলতো করে ছইয়ের বাইরে নৌকার গলুইতে বসলাম। একটা করুণ অথচ আত্মসচেতন সংযত অথচ দৃপ্ত প্রত্যয় কণ্ঠ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত সারাৎসার সুরে সুরে ভরে দিচ্ছে কেউ । হয়ত দেশামাতৃকার মুক্তিপাগল একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরস্রষ্ট্রা আপন মনের গভীর থেকে উৎসারিত কথায় ও সুরে যমুনার স্রোতের সাথে, জ্যোৎস্নার ধুসর নিঃস্বাসের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে যাচ্ছে, গেয়ে যাচ্ছে.....

মোরা খাব না খাব না
বাংলাদেশে থাকতে দেব না
আমার দ্যাশের চাউল লইয়া তুমি পোলাউ খাও
তোমার দ্যাশের গম আইন্যা বাংলাদেশে দাও
মোরা খাব না খাব না
বাংলাদেশের থাকতে দেব না।

ঐ গায়ককে আমি চিনি না, জানি না, কোনো দিন দেখিনি, হয়ত আর কখনও দেখব না। এ গান বাংলাদেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কণ্ঠে শুনিনি, সম্ভবত আর শুনবও না। কিন্তু ঐ সুর ঐ কণ্ঠ, সহজ সরল কথা এবং সেই সঙ্গে যমুনার বুকে অঢেল জ্যোৎস্নারাত প্রতিনিয়ত আমার ভেতরে জাগ্রত থাকে, সুর বাধে, গান হয় আমিও মুক্তিযুদ্ধের জন্য জেগে উঠি, প্রস্তুত হই।

সবাই থ্রি নট রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ করে আনন্দোল্লাস করল। ঠিক এমনি এক মুহুর্তে আমরা শুনলাম রাজাকারদের বিচার হবে জনতার বিচার। থানার হেডকোয়ার্টার ঐদিন লোকে লোকারণ্য। বিজয়ী মানুষের ঢল। রাজাকারদের মধ্যে রুহুল আমিন ও তার এক স্থানীয় সাগরেদকে নৃশংসতা, গণহত্যা, ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দালালি করার অপরাধে কছেই মাটিতে ফেলে লাথি মারতে থাকে। জনতার পায়ে পাপেই সেই রাজাকার কমান্ডার দেহটি ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। পীরগাছায় একদিন শেষ বিকেলে এক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমার কথা হয়েছিল। এই যুবক গরীব চাষী পরিবারের। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় গামছা ফেটি করে বাঁধা। লুঙ্গি পরা। পায়ে কাপড়ের জুতো, তাও ছেঁড়া। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। এখন আপনার কেমন লাগছে। তিনি বলেন, সেইডা তো তুমরাই কইবার পারো। আমরা তো দেশটা মুক্ত করার জন্য লড়াই করিছি। হামরা সবার জন্য দেশ আনি দিনু। "রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি জবাব দিয়েছিলেন।

হাট শেরপুরের এক সফল অপারেশন– ডা. আরশাদ সায়ীদ

ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরে ঘাঁটি হলো বগুড়ার হাট শেরপুরের দর্জি সামাদ ভাইয়ের বাসায়। ৭নং সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হক আমাদের মাত্র তিনজনকে (আমি তখন ঢাকা মেডিকেলের ১ম বর্ষের ছাত্র, আমাদের কমান্ডার ওয়ালেস ভাই ২য় বর্ষের ছাত্র ও নোবেল বগুড়া আজিজুল হক কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র) গেরিলা যুদ্ধের স্পেশাল ট্রেনিং

দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে ছিলেন। সঙ্গে আরও তিনজন সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা এবং যথেষ্ট পরিমাণ গেরিলা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি এক্সপ্লোসিভ, গ্রেনেড, মাইন ও স্টেনগান দিয়ে ছিলো। ওগুলো যমুনা নদীর তীরে সামাদ ভাইয়ের গোয়ালঘরে লুকিয়ে তৈরি হচ্ছিলাম আমাদের প্রথম অপারেশনের জন্য। এমনি সময়ে একদিন আমাদের কমান্ডার ওয়ালেস ভাই নিয়ে এলেন ৬ ফুট লম্বা এক সুদর্শন যুবককে। পরিচয় করিয়ে দেবার মুহূর্তে উনি নিজেই হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, আমি এক্স-ক্যাডেট লেফটেন্যান্ট ফারুক। বললেন, দুপুরে খাবারের পর জানাবেন বিস্তারিত। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সামাদ ভাইয়ের বাইরের ঘরে আসর জমিয়ে বসা হলো এবং সে আসরের মধ্যমণি আমাদের নব পরিচিত এক্স-ক্যাডেট লে. ফারুক।

গম্ভীর গলায় শুরু করলেন লে. ফারুক; শুনে অবাক হয়েছেন নিশ্চয় সবাই। আমি পাইলট হবার বাসনায় বিমানবাহিনীর পরীক্ষা দিয়ে উৎরে যাবার পর পাকিস্তানের রিসালপুরে ট্রেনিংয়ের জন্য গেলাম। আমার রুমমেট এক বদমেজাজি পাঞ্জাবি, যাকে দেখার পর থেকে আমার মেজাজ বিগড়ে ছিল। মাঝেমাঝেই ঝগড়া হতো। একদিন দেখি মুখ ধোবার বেসিনে পা তুলে পা ধুচ্ছে। নিষেধ করতেই বলে বসল হারামি বাঙালি। ব্যাস এক ঘুষি দিয়ে ব্যাটাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। শাস্তি পেলাম কোয়ার্টার গার্ড, সারাদিন অভুক্ত থেকে বন্দি ছিলাম রোদের মাঝে।

একদিন এসেম্বলিতে ইন্সট্রাক্টর ঘোষণা দিলেন আন্তবাহিনী সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে, যারা ভালো সাঁতার জানে সামনে এসে দাঁড়াও। তাকিয়ে দেখি আমার রুমমেট সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছেলে। আঁতে ঘা লেগে গেল। লাফিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভুলে গিয়েছিলাম সেই কবে ছোটবেলায় নানার বাড়িতে গিয়ে সাঁতার শিখেছিলাম প্রায় ১৫/১৬ বছর আগে। যথারীতি সাঁতারের জন্য রেডি হয়ে বাঁশি বাজতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। তারপর শুরু হলো প্রাণপণে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা। কিছুক্ষণ পর মাথা উঁচিয়ে দেখি বাকি প্রতিযোগিরা ৫০ মি. শেষ করে শেষ ৫০ মিঃ-এর জন্য আমার দিকে ফিরে আসছে। ডাঙ্গায় উঠতেই প্রচণ্ড রাগী প্রায় ৭ ফিট লম্বা ইন্সট্রাক্টর বাজখাই গলায় চিৎকার করে উঠল, Have you seen a frog? Yes sir বলতেই বলে বসল, Then start jumping like a frog. পায়ের ভেতর ঘুরিয়ে হাত দু'খানা দিয়ে কান দু'টি ধরে ব্যাঙের মতো লাফাতে শুরু করলাম। দেখি আমার রুমমেট ৩২টা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ একা একা Jump করতেই দেখি কতিপয় Junior মুখ টিপে হেঁহেঁ আমাকে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখেই মেজাজ বিগড়ে গেল। সটান দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বলে বসলাম Hey man! Have you seen a frog? সমস্বরে Yes sir বলতেই আমি আদেশ দিলাম, Then start jumping like a frog এবং ওদের ঐ কাজে লাগিয়ে ১০ গজের মতো যেতে না যেতেই সেই বাজখাই গলার ইন্সট্রাক্টর কোত্থেকে উদয় হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, আমি তোমাকে থামতে বলেছি? না বলতেই হুংকার দিয়ে যেই না 'শালা বাঙালি' বলা, অমনি আমার বাঁ হাতের এক পাঞ্চ ওর মুখের উপর। মাটিতে

পড়েই রাম চিৎকার। কয়েকটা দাঁত ওর ওখানেই শেষ। ব্যাস আমার পাইলট হওয়াও শেষ। তাই এখন এক্স-ক্যাডেট লেফটেন্যান্ট।

আমরা হো হো করে হেসে উঠতেই গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ করলেন, সামাদ সাহেব তাড়াতাড়ি চা দেন, আজই আমরা অপারেশনে যাব। যেই বলা সেই কাজ। উপুড় হয়ে বগুড়ার ম্যাপ নিয়ে নির্দেশ দেয়া শুরু হলো। মজার কথা, আমাদের কমান্ডার ওয়ালেস ভাইও দেখি সুবোধ বালকের মতো তার কথা শুনছে। বললেন, এখান থেকে বগুড়া কত দূর? ২২ মাইল শুনেই বললেন, No problem. চার মাইল করে প্রতি ঘণ্টায় গেলে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টায় ওখানে পৌঁছে যাব। আমি প্রতিবাদ করলাম, চার মাইল করে প্রতি ঘণ্টায় চলা কি সম্ভব? আর মাঝে তো অনেকবার বিপদে পড়ে সময় নষ্ট হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে বললেন, এই জন্যই তো Civilian-দের নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছিল তিনি যেন মস্ত বড় অফিসার। বললেন, ঠিক আছে প্রথম ২ ঘণ্টায় ৪ মাইল করে, পরবর্তী ঘণ্টায় ৩ মাইল করে হলে ৭ ঘণ্টায় পৌছাবো আমাদের গন্তব্যস্থানে।

আমরা তখনও জানি না তার মনের ইচ্ছা কী? ওয়ালেস ভাই জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, প্রতিদিন ভোরে পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে একটি ট্রেন বগুড়া থেকে বোনারপাড়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশনে সৈন্যদের পাহারায় যায়। বগুড়ার কাছাকাছি চেলোপাড়ার মতো জায়গায় ট্রেন লাইনের নিচে মাইন বসানোর পরিকল্পনা হলো। ফারুক ভাই আমাদের ৩ জনকে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন কার কাছে কী থাকবে। উত্তেজনায় ভুলেই গেলাম আমাদের কমান্ডার ওয়ালেস ভাই। আর দেখি উনিও ফারুক ভাইকে লিডার হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সব প্ল্যান ঠিক করে হঠাৎ বলে বসলেন, আমি এখন ঘুমাতে যাব। ঠিক ৬:৫০মি. এ ডেকে দেবেন। ৭টায় আমরা যাত্রা শুরু করব। আমরা অবাক। উত্তেজনায় আমরা লাফাচ্ছি আর উনি কিনা ঘুমাতে গেলেন। অদ্ভুত ব্যাপার, ৫ মিনিটের মাথায় নাক ডাকা শুরু করলেন। ঠিক ৬:৩০ মি. এ সামাদ ভাই খাবার প্রস্তুত করে ডাক দিলেন। আমরা ফারুক ভাইকে ডাকা শুরু করলাম। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম কি আর ভাঙ্গে? শেষে ধাক্কাধাক্কি করে চোখে পানির ঝাপটা দিয়ে জোর করে ওঠানো হলো। খাওয়া শেষে আবার শুরু করলেন, চা না খেয়ে যাব না, ঘুম পেয়ে যাবে। ইতোমধ্যে ৭:৩০মি. হয়ে গেল। আমি, নোবেল ও ওয়ালেস ভাই সাথে নিলাম মাইন। পিঠে বেঁধে ঢোলাঢিলা কাপড় পরে নিলাম। মাইনের ডেটোনেটর নিলাম কোমরে। ফারুক ভাই নিলেন গ্রেনেড। কমান্ডো স্টাইলে সামাদ ভাইয়ের চাইনিজ ছোট কুড়ালটা ফারুক ভাই তার পিঠে বেঁধে নিলেন।

বিদায় নিয়ে জুলাইয়ের মেঘলা আকাশের নিচে আমরা চার মুক্তিযোদ্ধা প্রায় মার্চ করার মতো জোর কদমে এগিয়ে চললাম। ঘণ্টা দু'য়েক চলার গতি সবার ঠিকই ছিল, কিন্তু এর পরই এল মুষলধারায় বৃষ্টি। লাল মাটির দেশ। মাটি হয়ে উঠল পিচ্ছিল। গতি গেল কমে। জোরে বলে উঠলাম, ফারুক ভাই বিপদ নং-১। বললেন, No problem. সবাই দৌড় দাও। যেই না দৌড় শুরু করেছি অমনি আমি পিছলে চিৎপটাং। পিঠে

মাইনের আঘাত পেলাম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বসে দম নেয়ার চেষ্টা করছি। এরই মধ্যে ফারুক ভাই চাট্টি মেরে বলে, ভেতো বাঙালি Civilian দের অবস্থা দেখ। ভীষণ রাগ হলো। আধা ঘণ্টার বৃষ্টির পানিতে রাস্তার পাশের নালা প্রায় ভরে গেল। এর মাঝেই আমরা দৌড়াচ্ছি। পেছনে ওয়ালেস ভাই কথা বলেছিলেন। হঠাৎ ধপ করে এক শব্দ। পেছনে ফিরে দেখি ওয়ালেস ভাই নাই। পরক্ষণেই দেখি পাশের পচা নালা থেকে উঠে আসছে কাদামাখা এক মূর্তি, আমাদের ওয়ালেস ভাই। নোবেল যেই না হাসতে গেছে হঠাৎ সেও প্রপাত ধরণীতল। সগর্বে শুধু আমাদের ফারুক ভাই ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন, ভেতো বাঙালি কোনদিন তো দৌড় দাওনি? দেখ মজা। তার এই দম্ভোক্তি শুনে রাগ করে মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম এ ব্যাটা পড়ে না কেন।

বৃষ্টি থেমে গেল কিন্তু সময়ের বহু পিছে পড়ে গেলাম। আমি ঘোষণা দিলাম বিপদ নং-২। খোঁচাটা খেয়ে ফারুক ভাইয়ের মেজাজ গেল সপ্তমে চড়ে। বললেন ঠিক আছে, এবার আর রাস্তা দিয়ে নয়, ঐ যে দূরে তালগাছ দেখা যাচ্ছে সোজা আমরা ওখানে পৌঁছবো Now run straight, বলেই রাস্তা ছেড়ে লাফিয়ে জমিতে নেমে দিলেন দৌড়। তার দেখাদেখি আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়লাম জমিতে। জমির কাদায় গেল আমার বাঁ পা দেবে। কষ্ট করে টেনে তো বের করলাম, কিন্তু দেখি বাঁ পায়ের কেড্স কাদায় আটকে গেছে। খুঁজতে দেখে ফারুক ভাই হুংকার দিয়ে উঠলেন। বললাম কেড্সটা খুঁজছি। বলে উঠলেন, থাক ওখানেই। কৃষক ভাই পেলে ভাববে তৈমুর লং-এর জুতা (কারণ তৈমুর লং-এর এক পা ছিল না)। অগত্যা বাকি এক পায়ে জুতা নিয়েই দৌড় শুরু করলাম এবং পৌঁছলাম ঐ তালগাছের কাছে।

এরপর এল আরো এক বিপদ। ওয়ালেস ভাই রাস্তার নির্দেশ দিতে পারছিলেন না। তখন রাত ১১টা। রাস্তায় হঠাৎ দেখি এক লোক সিগারেট টানছে, জিজ্ঞেস করে জানা গেল আমরা দৌড়ঝাপে ভুল রাস্তায় এসে পড়েছি এবং ৪ মাইল পিছিয়ে গেছি। হতাশ হবার মুহূর্তে বলে বসলাম বিপদ নং-৩। এবার হুঁ শব্দ ছাড়া ফারুক ভাইয়ের মুখে কিছুই শোনা গেল না। তবে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন হাসান নামের ঐ ভদ্রলোক। বললেন, মনে কিছু যদি না করেন, আপনারা মুক্তিযোদ্ধা, সম্ভবত কোনো অপারেশনে যাচ্ছেন। আজ রাত আমার বাসায় বিশ্রাম করে কাল না হয় যাত্রা শুরু করবেন। আমি খুব খুশি হব। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা নিজেরা পরামর্শ করে তার কথায় সায় দিয়ে পিছে পিছে রওনা দিলাম। তার গ্রাম রাস্তা থেকে বেশ উঁচু ভূমিতে এবং প্রথম বাড়িটি হাসানদের। পিচ্ছিল পথে উঠতে গিয়ে এবার গড়িয়ে নিচে গিয়ে পড়লেন আর কেউ না স্বয়ং এক্স-ক্যাডেট লে. ফারুক। হাসি চেপে রেখে বলে বসলাম বিপদ নং-৪। গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া কিছু বলতে পারছিলেন না। পিঠের কুড়ালটা ভালোভাবেই আঘাত দিয়েছে তাকে। সবাই মিলে ধরাধরি করে বাইরের টং ঘরে এসে দেখা গেল কুড়ালের বেকায়দা আঘাতে তার পিঠে ভালোই জখম হয়েছে। অবশিষ্ট রাত হাসানের সাথে গল্প করে কাটালাম। ওর বাসায় কেউ ছিল না। খুবই উৎসাহ নিয়ে ও আমাদের সহযোগিতা করতে চাইল। সকালে হাসানকে পুরো রাস্তা রেকি (কাউকে রাস্তার অবস্থান ও শত্রু অবস্থান জানার জন্য অগ্রিম খবর নিতে পাঠানো) করতে পাঠিয়ে আমরা ঘুমিয়ে

পড়লাম। প্রায় বিকালের দিকে হাসান ফেরত এসে আমাদের উঠিয়ে পুরো রাস্তার অবস্থান জানাল। সে বলল, একটা ব্রিজে আর্মিসহ রাজাকার পাহারায় থাকে, তাই আমাদের গ্রামের মেঠোপথ ধরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছে। খাবার পর ফারুক ভাইয়ের আবার ঘুম পেয়ে গেল। আমাদের গল্পের মাঝেই উনার নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

এবার আর দেরি না করে রাত ৯টায় রওনা হলাম, সঙ্গে হাসান। ব্রিজের কাছাকাছি এসে রাস্তা ছেড়ে গ্রামের পথ দিয়ে ওর পরিচিত নৌকায় পার হলাম আমরা। দূরেই শোনা যাচ্ছিল রাজাকার ও পাকিস্তানি মিলিশিয়াদের কথাবার্তা এবং হুইসেলের শব্দ। খুবই সন্তর্পণে এগুচ্ছিলাম আমরা। তিন ঘণ্টা পর বগুড়ার কাছাকাছি চেলোপাড়ায় এসে পড়লাম। হাসান ও নোবেলকে রাস্তায় পাহারায় বসিয়ে আমরা ঝুঁকে ঝুঁকে পৌঁছলাম রেল লাইনের ধারে। দূরে বগুড়া স্টেশনের আলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। কুড়াল দিয়ে পাথর ও মাটি সরিয়ে স্লিপারের নিচে বসিয়ে দেয়া হলো একটা মাইন। বাকি ২টা নিয়ে রাস্তায় ফিরে এসে ফারুক ভাই বললেন, ট্রেন মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পাকিস্তানি সেনারা নিশ্চয় এই রাস্তা বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করবে। অতএব রেল লাইনে পাতা মাইন বরাবর ইটপাড়া রাস্তায় পাশাপাশি দু'টো মাইন রাস্তার ইট সরিয়ে পেতে দেয়া হলো। কাজ শেষ হতেই দেখি রাত ২.৫৫ মি:। এবার ফিরে চলার পালা। হাসান বলে বসল ও ওখানেই থেকে যেতে চায় ওর এক আত্মীয়ের বাসায়। সকালে কী হয় দেখার জন্য। আমরা আপত্তি করছিলাম দেখে ফারুক ভাই বললেন, একজন অন্তত সাক্ষী থাকুক।

ফেরার পথে এক ভাঙ্গা পুলের উপর এসে ফারুক ভাইয়ের সেই কুম্ভকর্ণের ঘুম এসে গেল। হাই তুলে বললেন, না জিরিয়ে আমি ফিরছি না। বলেই দড়াম করে পুলের উপরই শুয়ে পড়লেন। তাই দেখে নোবেল ও ওয়ালেস ভাইও শুয়ে পড়লেন। কিছু দূরে নতুন পুলে পাহারাদারের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আমি যতই সর্তক করছিলাম, কিন্তু কে কার কথা শোনে। ইতোমধ্যে নাক ডাকার শব্দ শুরু হলো। ভাগ্য ভালো কোথা থেকে রক্তের লোভে হাজার হাজার মশা এসে বোমারু বিমানের মতো আক্রমণ শুরু করল নাকে মুখে। কিছুক্ষণ হাত-পা চালিয়েও কাজ হলো না দেখে ধ্যাত্তারি বলে রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠেই পড়ল সবাই। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আবার ফেরার পথ ধরে কিছুদূর এগুতেই দেখি চালভর্তি এক গরুরগাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে বগুড়া যাচ্ছে। ওকে থামিয়ে মিথ্যা বলা হয়, এ রাস্তায় মিলিটারি বসে আছে। দেখা পেলে গুলি করবে তাই আমরা পালাচ্ছি। সুবোধ বালকের মতো গরুরগাড়ি ঘুরিয়ে নিল। বলে দিলাম যার সাথে দেখা হবে তাকেই এ কথা বলতে। ভোর বেলায় এসে পৌঁছলাম বাঙালি নদীর তীরে। মাঝি আমাদের চিনতো। আমাদের খাওয়ানোর জন্য বাড়িতে নিয়ে গেল। কিছু মুখে দিয়ে ওখানেই ঘুম। ঘুম থেকে উঠে খাবার খেয়েই রওনা দিলাম হাট শেরপুরের উদ্দেশ্যে।

পড়ন্ত বিকালে হাট শেরপুরের কাছাকাছি এসে দেখি হাজার হাজার লোক বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ করে কী যেন দেখছে। সেদিন ছিল হাট বার। ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপার কী? পেছনেই কি মিলিটারি আসছে নাকি? এরপরই ২০/২৫ জন গ্রামের ছেলে (যাদের সাথে পূর্বে পরিচয় ছিল) দৌড়ে এসে আমাদেরকে ওদের ঘাড়ে তুলে নিয়ে

নাচতে নাচতে হাটে উপস্থিত। ভীষণ হৈ চৈ আমাদের চারপাশে। মানুষ কে কার আগে আমাদের ছোঁবে তারই ঠেলাঠেলি।

হতভম্ব হয়ে এ ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছি ব্যাপার কী? হঠাৎ দেখি সামাদ ভাই ও হাসান। হাসান দৌড়ে এসে জাপটে ধরে চিৎকার করে বলা শুরু করল একটা জিপে ৬ জন পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের কমান্ডার নিয়ে ঐ রাস্তায় যাবার পথে মাইন বিস্ফোরণে মারা গেছে। ট্রেন উঠার সময় ও উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করে ফেলে। কোনো শব্দ না পেয়ে চোখ খুলে দেখে ট্রেনটা দিব্যি চলে গেল। মাইনটা ফাটল না। ও যখন আফসোস করছিল ঠিক তখনই দেখে পাকিস্তানি সৈন্য ভর্তি জিপ রাস্তা ধরে আসছে এবং ঐ রাস্তায় পাতা মাইনের উপর উঠতেই প্রচণ্ড কান ফাটানো শব্দ। জিপটি গাছের সমান উঁচুতে উঠে আছড়ে পড়ল মাটিতে। হাসান হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ভাবছিল হয়তো স্বপ্ন দেখছে। ঘোর কাটতেই দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাত পাকিস্তানি সৈন্যের ছিন্নভিন্ন লাশ। ওদের মাঝে একজনের গায়ে অফিসারের পোশাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ও ঐ জায়গা ছেড়ে সাইকেল নিয়ে চম্পট এবং সোজা হাট শেরপুর আসে আমাদের খোঁজে। সামাদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হতেই সে বিস্তারিত জানায় এ খবর। সামাদ ভাই এ খবর গোটা গ্রামবাসীকে জানিয়ে খোঁজ করতে থাকে আমাদের। এরপর দূর থেকে আমাদের দেখে হাটের লোকের এ অবস্থা। বুঝলাম ঘাটের মাঝির ওখানে ঘুমিয়ে থাকার মাঝে এসব কিছু ঘটে গেছে।

হাজার হাজার জনতার আকুতি মিনতি দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল রবার্ট ব্রাউনিং-এর দি প্যাট্রিয়ট কবিার নায়কের কথা। আকাশের চাঁদ চাইলেও বোধহয় এরা তা একছুটে এনে দেবে আমাদের জন্য। কত বৃদ্ধ লোক এসে আমাদের মাথায় দোয়া পড়ে ফুঁ দিল। গ্রামের মেয়েরা পর্যন্ত এক নজর দেখার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল। গর্বে বুকটা ফুলে চোখে পানি এসে গেল এই নিরীহ লোকগুলোর চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে। এভাবেই শেষ হলো আমাদের এক সফল অপারেশন।

ঐ পথে যুদ্ধ শেষে যতবার গিয়েছি, দেখেছি সেই মাইন বিধ্বস্ত জিপটা। আর মনে পড়ে গেছে এক এক্স-ক্যাডেট ফারুক ভাইয়ের কথা, যার খোঁজ আমি এখনও পাইনি। যুদ্ধের মাঝেই উনি ঢাকা চলে যান।

তথ্যসূত্র : আমাদের একাত্তর, সম্পাদনা : মহিউদ্দিন আহমেদ

চোখে দেখা ১৯৭১ – তপন কুমার রায়

২৫ শে মার্চ ১৯৭১ বাড়ির বাইরে মাচাঙ্গের উপর শুয়ে আছি। তখন রাত ৩টা। আমার বাবা এসে আমাকে ডাকাডাকি করছে। বলছে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় বেরিকেড দিতে হবে। তখন আমি লাফিয়ে উঠি এবং রাস্তায় নেমে দেখি অনেকেই রাস্তায় বেরিকেড দিচ্ছে, আমিও তাদের সঙ্গে বেরিকেড দিতে লাগলাম। কারো পানের দোকান স্টল, কারো জুতার বাক্স, কারও চৌকি, ড্রাম, ইট এ সমস্ত জিনিস দিয়ে থানা মোড় হতে সাতমাথা পর্যন্ত বেরিকেড দেয়া শুরু করলাম। এমনকি পুলিশ বাহিনীরাও সহযোগিতা করতে থাকলো। তারা থানা থেকে দুইনলা, এক নলা বন্দুক ও গুলি কার্টিজ সাধারণের মাঝে সরবরাহ করলো। এদিকে কিছু লোক বগুড়া রেল স্টেশন

থেকে আনলোড মালবাহি বগি ২টা নিয়ে এসে ২ নং রেলগেটের মাঝখানে লাইনের উপরে (যেটি বর্তমানে ২নং রেল ঘুমটি নামে পরিচিত) রাখল। যাতে করে পাক সেনারা, এদিকে প্রবেশ করতে না পারে। সবাই যে যেখানে পারলো পজিশন নিয়ে বসে রইলো। প্রহর গুণতে গুণতে সকাল হয়ে গেল। তারপর যখন সকাল ৮টা তখন পাক সেনারা গাড়ি নিয়ে ফায়ারিং করতে করতে বড়গোলা রাস্তা হয়ে ২নং রেল ঘুমটির নিকট হাজির হল। তখন মালবগির সাথে ঘেঁসে তারা (পাক সেনারা) পজিশন নিয়ে আমাদের দিকে লক্ষ করে ফায়ারিং করতে লাগল। আমরাও পুলিশ বাহিনীসহ মোকাবেলা শুরু করলাম।

অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলতে লাগল। হঠাৎ থানার সামনে কাঁঠালতলার দিকে যাওয়ার সময় গুলি খেয়ে অজ্ঞাতনামা এক লোক মারা গেল। ২নং রেল ঘুমটির নিকট একটি চায়ের হোটেল ছিল। তার ভিতরে পাকহানাদাররা ঢুকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দু'জন হোটেল কর্মচারিকে গুলি করে মেরে ফেলল। অবশেষে পাকহানাদাররা পিছু হটতে বাধ্য হ'ল। তারা মহিলা কলেজের নিকট আস্তানা গাড়ল।

এদিকে সবাই বন্দুকসহ পজিশন নিলাম। গোলাগুলি চলতে থাকল, দিনের পর রাত হয়ে গেল। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। শহরে বিদ্যুৎ বন্ধ। ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমাদের সহকর্মী একজন লোক ভুলবশত সুবিল ব্রিজ পার হয়ে যেতেই পাকহানাদাররা তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু তার হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। পাকহানাদাররা তার দুই হাত পিছনের দিকে করে বেঁধে ফেলল। দুই পা ও চোখ বেঁধে রাখল। এই ভাবে সারারাত অতিবাহিত হয়ে গেল, তাকে শুকনো একটি রুটি খেতে দিয়েছিল। কিন্তু সে ভয়ে খেতে পারেনি।

সকালে খান সেনারা গুলি করতে করতে রংপুর রোড হয়ে চলে যায়, তবে শহরের ভিতর আর তারা ঢুকতে পারেনি। পরে হাত, পায়ের ও চোখের বাঁধন খুলে সেই লোকটিকে আমরা উদ্ধার করলাম। হঠাৎ আকাশে ফাইটার বিমানের আগমন হলো। দুই তিনবার চক্কর দিতেই লোকজন ভয়ে লুকাতে লাগল। এর মধ্যে রেল ষ্টেশনের নিকট পেট্রোল পাম্পের পার্শ্বে রেল লাইনের ধারে ফাইটার বিমান বোম্বিং করতে শুরু করল। আর একটি সার্কিট হাউজের নিকট বোম্বিং করল। ফাইটার বিমান চলে যাওয়ার পর লোকজনের দেখার জন্য ভিড় জমে গেল।

একদিন পরের ঘটনা। বগুড়া থেকে সাত মাইল দূরে আড়িয়া বাজারের নিকট একটি মিলিটারি ক্যাম্প আগে থেকেই ছিল এবং সেই ক্যাম্পে বেশ কিছু পশ্চিমা মিলিটারি ও বাঙ্গালি মিলিটারি ছিল যৌথভাবে। পশ্চিমা মিলিটারিরা যুক্তি করে বাঙ্গালি মিলিটারিদেরকে বলল, তোমরা গাছ কেটে রাস্তায় বেরিকেড দাও। তখন বাঙ্গালি মিলিটারিরা গাছ কাটার জন্য ক্যাম্প থেকে বের হয়ে যায়। এদিকে পশ্চিমা মিলিটারিরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে ফাইটার বিমানে খবর দেয় বাঙ্গালি মিলিটারিদের উপর বোমা ফেলার জন্য। তারা রাস্তায় গাছ কাটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দু'টি ফাইটার বিমান এসে কয়েকটি বোমা ফেলে চলে যায়। এই বোমা ফেলাতে তিন জন বাঙ্গালি মিলিটারি আহত হয়। তাদেরকে গ্রামের লোকজন সাইকেলে করে মোহাম্মদ আলী হসপিটালের দিকে নিয়ে আসার সময় আহতদের মধ্যে একজন ঘটনা কি হয়েছে বলতে লাগল– পশ্চিমা

মিলিটারিরা আমাদেরকে গাছ কাটার কথা বলে ফাইটার বিমানকে খবর দেয়। তখন এ কথাগুলো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় লোকজন রাগে উত্তেজিত হয়ে যার যা বন্দুক ছিল নিয়ে দল বেধে আড়িয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। আড়িয়া বাজারের ক্যাম্পের চারপাশে সবাই বন্দুক নিয়ে পজিশন নিলে রীতিমতো আমাদের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর গুলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

আমাদের মধ্যে মাসুদ ও আর একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়। ওদিকে পশ্চিমা মিলিটারিদের একজন পাকা রাস্তার কালভার্টের নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। একজন ক্যাম্পের ভিতর তাঁবুর নিচে খাটের উপর থেকে শুয়ে গুলি ছুঁড়ছিল, তার মাথার খুলিতে আমাদের গুলি লেগে সেও মৃত্যুবরণ করল। তার পাশে আরো দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আর বাকিরা অস্ত্র উচিয়ে হাত তুলে আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করল। তাদেরকে বন্দি করে বগুড়া জেল থানার ভিতর রাখা হ'ল।

পরের দিন ঐ ক্যাম্পের ঘর ভর্তি যত গোলাবারুদ ছিল সেগুলো সবাই মিলে ট্রাকে ভর্তি করে বগুড়া জেলাস্কুলের ক্লাস রুমের ভিতরে সযত্নে রাখা হল। এর পর কিছু লোকজন রাগে বেশ কিছু বিহারীকে মেরে ফেললেও কিছু বিহারীকে ধরে জেল খানার ভিতর রাখল। দু' একদিন পরে জেল খানায় পশ্চিমা মিলিটারিদেরকে বের করে নদীর ধারে দাঁড় করে মেরে ফেলা হয়।

বগুড়া শহরে তখন থম থমে ভাব বিরাজ করছে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ করে কিছু যোদ্ধা জেলখানার নিকট স্টেট ব্যাংকে গিয়ে সেখানে তিনটি ট্রাক নিয়ে ব্যাংকে যত টাকা ছিল সমস্ত টাকা ট্রাকে ভর্তি করে ভারতের দিকে চলে গেল। রিম ঝিম টুপ টাপ বৃষ্টি পড়ছিল। তখন দুপচাঁচিয়ার রাস্তা কাঁচা ছিল। এই রাস্তা ধরে যেতে যেতে একটি টাকা ভর্তি ট্রাক মুড়াইল এর নিকট পিছনের চাকা মাটিতে দেবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেও ট্রাকের চাকা তুলতে পারল না। অবশেষে ছয়জন সঙ্গি একজনকে ট্রাকের উপর বসে থাকতে বলে অন্যজায়গা থেকে ট্রাক নিয়ে আসার জন্য চলে গেল। ট্রাকের ছাদের উপরে একজন এ্যাসেলার নিয়ে বসে আছে। টুপ টাপ বৃষ্টি হচ্ছে। বিকাল হয়ে সন্ধ্যা হতে লাগল। ট্রাকের টাকা গুলি দেখা যাচ্ছে। টাকা গুলিও ভিজছে। এদের মধ্যে তিনজন একটি জিপ গাড়ি নিয়ে এল। যতটুকু পেরেছে গাড়িতে টাকা ভর্তি করে দুপচাঁচিয়ার দিকে রওনা দিল। দুপচাঁচিয়ার লোকজন জিপগাড়ির বাতি দেখে মনে করছে পাকহানদাররা আসছে। সবাই সতর্ক অবস্থায় লুকিয়ে রইল। গাড়িটি যখন দুপচাঁচিয়ায় পৌঁছল তখন দেখা গেল আমাদেরই বাঙালি ভাই তবে গাড়িতে টাকা ভর্তি দেখে লোক বিস্মিত হ'ল।

দুপচাঁচিয়ার পুলিশ বাহিনী থানার ভিতর ছিল না। কারণ দেশের অবস্থা খারাপ দেখে যে যার বাড়িতে চলে গেছে। এরা জিপ গাড়িটি থানার ভিতর নিয়ে বসে থাকলো। ওদিকে এদের বাকি সঙ্গিরা খোঁজাখুঁজি করতে করতে লোক মারফত জানতে পারল ওরা দুপচাঁচিয়ার দিকে গেছে। এরা পায়ে হেঁটে দুপচাঁচিয়া গিয়ে তাদেরকে থানার মাঠে পায়। তখন ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হওয়ার পর এমনকি রাগে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ওদের মধ্যে তিন জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। (হায়রে টাকা! বন্ধু বন্ধুকে টাকার জন্য মেরে ফেলতে দ্বিধা করল না।) পরে বাকি

সঙ্গীরা টাকা ভর্তি জিপ গাড়িটি নিয়ে চলে গেল। ভোর হয়ে গেলে থানার মাঠে লোকজনের আস্তে আস্তে ভিড় জমে গেল লাশ দেখার জন্য। বেলা যখন ৯টা তখন গ্রামের লোকজন চিন্তা ভাবনা করে লাশ তিনটিকে থানার মাঠেই দাফন করল।

এদিকে ভোরের দিকে শোনা যায় মুড়াইলে যে ট্রাক ছিল তার ভিতর যত টাকা ছিল সেগুলো ওখানকার লোকজন লুটপাট করে নিয়েছে। এ সমস্ত কথা শুনে আমি গুপিনাথপুর রাস্তা ধরে যেতে থাকি জামালগঞ্জের দিকে। জামালগঞ্জ যাওয়ার পর সেখানে শোনা যায় বিকট বিকট শব্দ। তখন আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ শব্দ কোথায় এবং কিসের? তখন লোকজন বলল, পাকহানাদাররা পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, হিলিতে ঢুকে পড়েছে তাই ওদিকে যাওয়া যাবে না। তখন আমি গ্রামের রাস্তা ধরে ভারতের দিকে যাওয়ার জন্য রওনা হই। যেতে যেতে অনেক দূরে গিয়ে বন্দকপুর নামে একটি গ্রামে পৌছি। সেখানে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রাতে থেকে আবার রওনা দেই। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চিঙ্গিশপুর বর্ডারে এসে পৌছি। বর্ডার পার হয়ে কামারপাড়া দিয়ে বাসে উঠে বালুরঘাট পৌছি। আমার সঙ্গে একটি পরিচিত লোক ছিল তার বোনের বাড়ি বালুরঘাটে। সেখানে কয়েক দিন থাকলাম।

ওদিকে হিলির যুদ্ধ থেমে গেছে। হিলি পাকহানাদারদের দখলে। আমার এক মামা খবর পেয়ে আমাকে নিতে আসে। আমি তখন মামার সঙ্গে ইন্ডিয়া হিলিতে চলে যাই। মামার গ্রামের বাড়ি ছিল রায়ভাগ বর্ডারের কাছাকাছি। মামা তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইন্ডিয়ার ভিতরে থাকতেন। পরে মামা ও আমি ব্যবসা শুরু করি। মাঝে মধ্যে আমি ও আমার মামাতো ভাই মিলে মামার গ্রামের বাড়ি দেখতে যেতাম। সেখান থেকে রেল লাইন দেখা যেত। একদিন দোকানে বসে বেচাকেনা করছি। হঠাৎ বগুড়ার কিছু লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে আমি জানতে পারি তারা বালুর ঘাটে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং দিচ্ছে। আমাকে তারা উৎসাহিত করে বলল, তুমি চল আমাদের সঙ্গে বালুরঘাটে, সেখানে আমাদের ট্রেনিং হচ্ছে, তুমিও ট্রেনিং-এ ভর্তি হও। আমি তখন বললাম, আমার বাবা মা, ভাইকে খুঁখে না পাওয়া পর্যন্ত আমি যেতে পারব না। তারপর তারা উঠে চলে গেল।

আমার ব্যবসা খুব ভালোই চলছিল। মাস খানেক পরে আবার তাদের সঙ্গে দেখা। তারা আমাকে বলে কোন দিক দিয়ে গেলে ভালো হবে। ওরা বলে ঠিক আছে আমরা আরেক দিন আসব তুমি থেকো বলে চলে গেল। দিন পাঁচকে পরে সবাই অস্ত্র নিয়ে চলে এল। আমাকে বলল, তুমি এই স্টেনগানটি হাতে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে। আমি তখন বলি এটা কার অস্ত্র? ওরা বলল, আমাদের একজনের সে অসুস্থ তাই আপাতত তুমি এটা চালাবে। আমি তখন বলি এটা আমি কেমন করে চালাব। আমার তো কোনো ট্রেনিং নেই। লিডার বলে আমি কিছুটা বুঝিয়ে দেব, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। চল আমরা রওনা হই।

যেতে যেতে একটি গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ি। গ্রামের এক গাছের নিচে বসে সবাই একটু বিশ্রাম করি। সেই ফাঁকে আমাকে স্টেনগান চালানো বুঝিয়ে দিল লিডার। আর একটি কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিল– যখন স্টেনগান থেকে গুলি বের হবে তখন প্রচণ্ড ঝাঁকি হবে। স্টেনগানটি শক্ত করে ধরে থাকবে। আমরা আবার রওনা হলাম। কিছু দূর

যাওয়ার পর রেল লাইন দেখা যায়। আমরা মাথা নিচু করে বসে বসে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পাই, রেল লাইনের পুলের কাছে চারজন পাকহানাদার ডিউটি করছে। সেখান থেকে আরো কিছু দূর সরে একটি বড় গাছের নিচে পাঁচ সাত জন ডিউটি করছে। আমাদের লিডার বলল, তোমরা শুয়ে থাক আমি গুলি চালাবো ঐ চার জনের উপর, তারপর লিডার উঠে গুলি চালাতে থাকল পরে আবার মাটিতে শুয়ে পড়ল তাতে বুঝা গেল দু'জন পাকহানাদারের গুলি লেগেছে। বাঁকি দু'জন লাইনের উপর থেকে আমাদের লক্ষ করে গুলি ছুড়তে লাগল। গাছের কাছে যারা ছিল তারাও গুলি করতে লাগল। আমরা সবাই তাদেরকে লক্ষ করে গুলি করলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর লিডার ফায়ারিং করতে নিষেধ করল।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আধা ঘণ্টার মতো আমরা নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। লিডারকে আমাদের একজন বলে যে, আমরা কি এইভাবে বসে থাকব সন্ধ্যা তো হয়ে আসছে। প্রতিউত্তরে লিডার বলে, আর কিছুক্ষণ দেখি ওরা খাড়া হয়ে দাঁড়ায় কিনা। হিলি থেকে বেশ কিছু পাকহানাদারদের ট্রাক আসছে এদিকে। আমরা ঐসব দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে লড়াই করা যাবে না। লিডার অর্ডার করল, শুয়ে শুয়ে হাঁটু ও হাতের কনুইয়ের উপর ভর করে পিছু হঠার জন্য।

আমরা শুয়ে শুয়ে হাঁটু ও হাতের কনুইয়ে ভর করে ইন্ডিয়ার ভিতর চলে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর গ্রামের আড়াল পড়ল তখন উঠে আমরা ভিতরে চলে গেলাম। সবাই মিলে হাত মুখ ধুয়ে একটি চায়ের দোকানে বসে আমরা চা পান করলাম।

ওরা সবাই বালুর ঘাটের দিকে চলে গেল। আমাকে বলল, আমরা অন্য দিক দিয়ে দেশে প্রবেশ করব যুদ্ধ করার জন্য, তুমি থাক। কিছু দিন পর ইন্ডিয়ান বি,এস,এফ পাকহানাদারদের রেল লাইনের উপর থাকা ট্রেনটিকে উড়িয়ে দেয়ার জন্য পজিশন নিয়ে কামান সেট করে দু-দুবার কামান থেকে গোলা মারে ট্রেনকে লক্ষ করে, কিন্তু তা ট্রেনের একটু উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। পরে পাক হানাদাররা ট্রেনকে পিছু নিয়ে মর্টারসেল মারা শুরু করল। তাতে দু'জন বি,এস,এফ জখম হ'ল।

এর মধ্যে গোটা ইন্ডিয়া হিলিতে আতঙ্ক শুরু হ'ল এবার বুঝি আমাদের রক্ষা নেই। বেশ কিছু লোকজন পরিবার নিয়ে বালুর ঘাটের দিকে চলে গেল বাড়ি ঘর ছেড়ে। এদিকে মর্টার সেল মারা বন্ধ হয়ে গেল। কারণ এ দিক থেকে আর কোনও গুলি বা কামান মারা হয়নি। দু'দিন পরে ইন্ডিয়ান ঘোড় রেজিমেন্ট এসে হিলিতে শেলটার নিল। তখন ধীরে ধীরে আমরা স্থায়ী বাসিন্দারা নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে আসলাম। হিলি তখন শান্ত হয়ে গেল।

[তথ্যসূত্র : '৭১ এর বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংকলন।]

বগুড়ার কতিপয় শহীদ

শহীদ তোতা মিয়া : বগুড়ার প্রথম শহীদ তোতা মিয়া। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শোনা গেল পাকসেনারা বগুড়ার আশে পাশের গ্রামগুলো আক্রমণ করবে। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১ কি. মি দূরে ঠেঙ্গামারা গ্রাম, এখানের গ্রামবাসীরা হানাদারদের কিছুতেই বগুড়া শহরে ঢুকতে দিতে চায় না। হানাদারদের বাঁধা দিতে হবে সে নির্দেশ যেন প্রত্যেকের মনই দিচ্ছে। যার যা আছে তা দিয়ে বাঁধা দিতে প্রস্তুত সব, তোতা মিয়া তার কুড়াল দিয়ে বাঁশ কেটে রাস্তায় বেরিকেড দিচ্ছিল। যুবক তোতার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ গাড়ি বহর আসতে দেখা গেল, গাছকেটে পুরো রাস্তা বেরিকেড দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। তোতা মিয়া বাঁশ বাগান থেকে একদৌড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। রাস্তায় কাজ করতে থাকা অন্য গ্রামবাসী তখন আড়ালে-আবডালে। তোতা তার কুড়াল নিয়ে নওদাপাড়া নামক জায়গায় দাঁড়িয়ে। কুড়াল উচিয়ে এগিয়ে যায় পাকসেনাদের গাড়ি বহর ও মার্চ করে আসা পাকসেনাদের দিকে। পাকসেনারা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে, বগুড়ার মাটিকে বাঁচাতে প্রথম শহীদ হন রিক্সাচালক যুবক তোতা মিয়া। তোতা মিয়া রাস্তায় পড়ে গেলে নিষ্ঠুর হানাদারেরা তার লাশের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায়। হানাদার পাকসেনারা যাবার পর গ্রামবাসীরা কোনোমতে তোতামিয়ার লাশ দাফন করেন।

বীর কিশোর শহীদ মামুদ আহম্মদ : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ায় যে ক'জন ছাত্র নবীন বয়সে শহীদ হয়েছেন তাদের একজন মাসুদ। বগুড়া আজিজুল হক কলেজের বিজ্ঞানের ২য় বর্ষের ছাত্র। উদ্যমী আর সাহসী মাসুদ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন মেধাবী। স্কুলে প্রাইমারি ও জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৫ মার্চ রাতের ক্রাক ডাউনে জ্বলে উঠেছিল বগুড়া। গোটা দেশে আন্দোলন যখন চরমে তখন পিছিয়ে ছিল না বগুড়া তথা বগুড়াবাসী। ১৯৭১ এর ২৮ মার্চ হানাদার পাকসেনা বগুড়া শহরে যখন আক্রমণ শুরু করে তখন মাসুদ E. P. R আনসার বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও সাধারণ জনতার কাঁধ কাঁধে মিলিয়ে পাকসেনাদের মোকাবিলা করেন। মাসুদ ছিল অত্যন্ত সাহসী। ২৯ মার্চ সকাল বেলা ২৮ (গত দিন) মার্চের রেশ ছিলই। পাক হানাদারেরা ঘাঁটি বেধেছে সুবিলের উত্তর পাড়ে। প্রথমে তারা ঘাঁটি বেঁধেছিল কটন মিলের গেস্ট হাউসে। মাসুদ ও সুবেদার আকবর, হানাদারদের ঘাঁটি রেকি করে আসে। যুদ্ধের সময় জীবনকে বাজী রেখে এভাবে চলাচল করত। ১ এপ্রিল সকালেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে সারা শহরে, হানাদার বাহিনী পালিয়েছে। শহরটা মুক্ত, কিন্তু বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল দূরে আড়িয়া বাজার এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৩ বিগ্রেডের ৯৬ আই পি পি (অ্যামুনিশন পয়েন্ট) অবস্থিত। আড়িয়া বাজারের

পাকিস্তানি এই ক্যাম্প থেকে বগুড়ার আশেপাশে পাকসেনারা গোলা-বারুদ সরবরাহ করত। ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য অ্যামুনিশন পয়েন্টে পাহারা দিত।

মাসুদ সহ আরও কয়েকজন মুক্তিসেনা, ৩৯ জন E. P. R ৫০ জন পুলিশ এবং ২০ জন মুক্তিসেনা বেলা সাড়ে এগারটায় আড়িয়া বাজার ক্যান্টনমেন্টের উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম এই তিন দিক দিয়ে ঘেরাও করে। দু' পক্ষে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। দু'পক্ষ থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ হয়। পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আকাশ পথে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা অবিচল। যুদ্ধ চলাকালে মাসুদ তার ৩০০ রাইফেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সুদক্ষ কৌশলে হানাদার পাকসেনাদের ৩ জনকে হত্যা করে। ওদের দলটি বেলা আড়াইটার সময় আড়িয়া ক্যান্টনমেন্টে তাদের বিজয় নিশান সাদা পতাকা ওড়ায়। পাকসেনাদের ১৭ জনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। এমন সময় আনন্দের আতিশয্যে তার প্রিয় রাইফেলটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলে অসীম সাহসী যোদ্ধা মাসুদ। এমন সময় ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ নামের এক পাকসেনা ক্যাম্পের পিছনের ট্রেন্সে লুকিয়ে থেকে মাসুদকে লক্ষ করে গুলি চালায়। নিমিষেই ঢলে পড়ে নির্ভীক সেনা মাসুদ। মাসুদের সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারা এই সেনার সম্মানে আড়িয়া বাজারটিকে মাসুদ নগর নামকরণে বদ্ধপরিকর হয়। মাসুদের এই আত্মত্যাগ দেশমাতৃকাকে বাঁচাতে এবং আরও অনেক যুবককে মুক্তিযুদ্ধে যেতে অনুপ্রাণিত করে। মাসুদের লাশ নিয়ে তার বন্ধুরা পরিবারকে হস্তান্তর করে। মাসুদের লাশকে ২১টি গান স্যালুটের মাঝে শেষ বিদায় জানানো হয়। আড়িয়া বাজারের মাসুদনগর ও জিন্না হল মাসুদ মিলনায়তন নামে শহীদ মাসুদকে বাঁচিয়ে রাখবে চিরদিন।

শহীদ মাসুদুর রহমান চান্দু : ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণে ডাকে চান্দু উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে ভারত যান ২৫ জন তরুণকে সঙ্গী করে। প্রশিক্ষণ শেষে চান্দুর নেতৃত্বে ২৫ তরুণ মুক্তিযোদ্ধা হিলি সীমান্তের রেলপথ সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। এরপর তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ মাইনকার চর থেকে বাংলাদেশে আসেন। বাহাদুরাবাদ ঘাটে পাকহানাদার বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন। যুদ্ধ শুরু হয়, সারাদিন যুদ্ধ চলে। চান্দু তার দলবল নিয়ে যমুনা নদী পার হয়ে সারিয়াকান্দি থানার চন্দনবাইশা নামক স্থানে আশ্রয় নেন। ওখানে জানতে পারে পাকবাহিনী চন্দনবাইশা বন্দরে ক্যাম্প করে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। চান্দু তার দলে আরও ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে পরের দিন ঐ ক্যাম্প আক্রমণ করেন। এখানে সম্মুখ যুদ্ধ চলে ৬ ঘণ্টা। এতে ২ পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হয়। চান্দু তার দলবল নিয়ে ধুনট থানার নিমগাছী, খোট্টাপাড়া ও জালসুকা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এলাকাগুলো রাজাকারমুক্ত করেন। সফল অপারেশনের পর চান্দু সারিয়াকান্দি থানার জোড়গাছা নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেন। চান্দু শুনতে পান গাবতলী থানার দড়িপাড়া নামক জায়গায় একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। একজন E. P.R অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও রাজাকার কমান্ডার শমসের আলীর চক্রান্তে চান্দু মুক্তিযোদ্ধাটিকে বাঁচাতে ছুটে যান। ১৫ নভেম্বর

রাত ২টায় তার সাথীদের নিয়ে অপারেশন করতে ঐ গ্রামে রাজাকার কমান্ডার শামসের আলীর বাড়ি ঘেরাও করেন এবং প্রায় ১ ঘণ্টা দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। প্রচুর গোলাগুলি বিনিময়ের পর রাজাকার কমান্ডারের গুলিতে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মাসুদুর রহমান চান্দু শহীদ হন।

শহীদ আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ান ১৯৭১ সালের বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অকুতোভয় এই ব্যক্তি ১৯৬৯ সালের গণবিক্ষোভে আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। '৭১ এর ৭ মার্চ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৩ এপ্রিল '৭১ পাকবাহিনীর বগুড়া শহর দখল করার পর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সারিয়াকান্দী থানার হাট শেরপুরে আত্মগোপন করেন। ১৯ মে '৭১ তিনি তার দল নিয়ে ভারতের কুরমাইল ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। ১ জুন তার গেরিলা বাহিনী নিয়ে বগুড়ায় ফিরে আসছিলেন। আবু সুফিয়ান গন্তব্য স্থানে পৌঁছে জানতে পারে জায়গাটি তাদের জন্য নিরাপদ নয়। তখন তিনি জায়গা পরিবর্তন করে তার দলকে নিয়ে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর যান। আক্কেল পুরের ঐ জায়গায় আর্মিদের ক্যাম্প ছিল। সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে জিয়ানগরে আশ্রয় নিয়ে পরদিন আক্কেলপুরে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালায়। রাত তিনটার দিকে হানাদার পাকসেনারা দীর্ঘ যুদ্ধের পর পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঘটনাস্থলেই ১০ জন গেরিলা সৈন্য শহীদ হন। পরবর্তী অপারেশনের জন্য তৈরি হওয়ার লক্ষ্যে সুফিয়ান ও তার দল জিয়ানগরের দিকে ফিরে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল; এমন সময় একজন পায়জামা পাঞ্জাবী পরিহিত ব্যক্তি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আপনাদের ভয়ে হানাদারেরা পালিয়েছে। ওরা ওদের লাশগুলোও নিয়ে গেছে। আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনাদের জন্য খাবার তৈরি করা হয়েছে। খেয়ে, বিশ্রাম নিয়ে যাবেন।

আবু সুফিয়ান মধুর কথায় আশ্বস্ত হয় না। কিন্তু আগত ব্যক্তির সঙ্গে আসা আগন্তুকদের কয়েক জনকে সুফিয়ান চিনতেন, তাই বললেন, এখানে গোলাগুলি করে তাদের গোলাবারুদও শেষ হয়েছে। ওখানকার মুক্তি ক্যাম্প থেকে গোলাবারুদ আনতে হবে। লোকগুলো তার কথায় বাধা দিয়ে তাকে জানায় পাকসেনারা বস্তা গোলাবারুদ ফেলে গেছে। ইচ্ছে করলে সুফিয়ান বাহিনী তা সংগ্রহ করতে পারে। মুক্তপ্রাণ সুফিয়ান তাদের কথায় বিশ্বাস করে তাদেরই একজন পরিচিত ব্যক্তির বাসায় তার বাহিনীকে নিয়ে যায়। সুফিয়ানের দলের কিছু মুক্তিযোদ্ধা ঘরের বাইরে এদিক ওদিক ছিটিয়ে ছিল। ঘরের ভেতর যারা ছিল সেই সব মুক্তিযোদ্ধারা গোসল সেরে খেতে বসতেই পাকসেনারা ঘরে ঢুকে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। মুক্তিবাহিনী যারা ঘরের বাইরে ছিল তারা বিপদ আঁচ করে আত্মগোপন করেন। সারারাত ওদেরকে ঘরে বন্দি রেখে পাকসেনারা ভোর ৬টায় ওদেরকে ঘর থেকে বের করে অমানুষিক নির্যাতন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের কামান্ডার আবু সুফিয়ানের ওপর নির্যাতন ছিল বেশি। সুফিয়ানের হাত দুটো পিছনে বেঁধে, হাত পেট ও পিঠের চামড়া কেটে তাতে

সিগারেটের আগুন চেপে ধরে। খেজুর গাছের ডাল কেটে অনেক কাঁটা একত্র করে বেঁধে সারা শরীর খোঁচানো হয়। আবু সুফিয়ান, গোলাম মোহাম্মদ পাইকার (খোকন) সহ আরও কয়েকজনকে হাত ও পায়ের তলায় পেরেক বসিয়ে চামড়া ছিলে তাতে লবণ মাখিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। গর্ত আগেই খুঁড়েছিল পাকসেনাদের দোসররা এর ভেতরেই সুফিয়ানকে নামিয়ে মাটি চাপা দেয়। অন্যান্যদের গর্তের মধ্যে ফেলে মাথায় গুলি করে। মৃত্যুবরণের আগেই তাদের মাটিচাপা দেওয়া হয়।

পাকহানাদাররা ও রাজাকাররা চলে যাবার পর গ্রামবাসীরা আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্যদের লাশগুলো গর্ত থেকে বের করে উনিশটি কবরে আলাদা আলাদা ভাবে সমাহিত করে।

শহীদ মোস্তাফিজার রহমান (ছুনু) : ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হানাদার পাক বাহিনী বগুড়ায় প্রথম প্রবেশ করে। ২৫ মার্চ রাতেই বগুড়ায় ছড়িয়ে পড়ে যে পাকহানাদাররা বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। শহরের দামাল ছেলেরা বদ্ধপরিকর দেশকে যে কোনও মূল্যেই বাঁচাতে হবে। বগুড়া জেলার মেধাবী ছাত্র ও একমাত্র গিটার শিল্পী ছুনুর বুকেও বাজে দেশকে বাঁচানোর দামামা। বগুড়া শহরের সব পথ বন্ধ। হানাদারদের পথরোধ করা হয়, শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র- জনতার জটলা। উত্তেজনায় টানটান সবাই আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ে। হানাদাররা যখন শহরে প্রবেশ করে তখন হাই কমান্ডের নির্দেশে ছুনু অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে বড়গোলা ইউনাইটেড ব্যাংকের উপরতলায় অবস্থান করে। পাকহানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে ব্যাংকের ছাদে দাঁড়িয়ে শত্রু সেনাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করছিলেন ছুনুরা। হানাদাররা ছাদে অবস্থানরত মুক্তিসেনাদের দিকে গুলি বর্ষণ করলে টিটু নামের একজন সহযোদ্ধা নিহত হন। এক সময় ছুনুও তার সঙ্গী যুদ্ধ চালাতে থাকে। হানাদার পাকসেনারা টের পায় ছুনুর বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে যায়। পাক সেনারা তাকে ও তার সঙ্গীকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে মাটিডালিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। হানাদার পাকসেনারা ছুনুদের হত্যা করার পর পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে তাদের লাশ মাটিচাপা দেয়।

শহীদ সাইফুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্ধুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাইফুল ইসলাম। হানাদারদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে বগুড়ায় এসে যুদ্ধ করতে থাকেন। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সাইফুল ধুনট থানা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় ধুনট থানায় অবস্থানরত ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। হানাদারদের কয়েকটি কনভয় ও ট্রেন আক্রমণ করে ধ্বংস করে সাইফুলরা। শহরের ওয়াপদা পাওয়ার হাউস সাব সেকশন উড়িয়ে দেওয়ার নীল নকশা করে বগুড়ায় দামালরা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ জন সহযোদ্ধা নিয়ে '৭১ এর ১১ আগস্ট শহরের দিকে রওনা দেয় সাইফুল। হাটশেরপুর থেকে ২২ মাইল পথ পেরিয়ে তারা মাদলা ঘাটে পৌছায় রাত ৯ টার সময়, ঘাটে কোনও ফেরি নেই।

পারাপার কিভাবে সম্ভব, সাইফুল হঠাৎ বলল চল কলাগাছের ভেলা তৈরি করা যাক। যা ভাবা সেই কাজ, ভেলা তৈরি করে তারা ৩ জন করতোয়া নদী পার হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মাল গ্রামের ভিতর দিয়ে মেঠোপথ ধরে এগুতে থাকে। হানাদারদের আক্রমণের শিকার হয় তারা। আত্মরক্ষার কোনও উপায় না পেলে সাইফুল গ্রেনেড চার্জ করে। পাক হানাদারদের পাহারাদার রাজাকাররা তাদের চিনে ফেলে। গ্রেনেড ছোঁড়ার পরপরই একজন রাজাকার সাইফুলের মাথায় লাঠির আঘাত করে, মুক্তিযোদ্ধা ৩ জন অন্ধকারে তিন দিকে দৌড় দেয়। সাইফুল রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় পালায়। এদিকে হানাদার পাকসেনাদের দোসর রাজাকাররা সাইফুলের বাড়ি ঘেরাও করে তার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। সাইফুল আত্মগোপন করা অবস্থায় তা শুনতে পেয়ে বগুড়ায় থানার দিকে এগুতে থাকে। পথে রাজাকাররা তাকে ধরে পাকসেনাদের কাছে হস্তান্তর করে। হানাদারবাহিনী সাইফুলকে এতিমখানায় নিয়ে যায়, পরে তাকে সামরিক কারাগারে নিয়ে যায়। অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয় তার ওপর। সাইফুল বর্বর ইয়াহিয়া খানের তথাকথিত সাধারণ ক্ষমায় মুক্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। সাইফুল নির্যাতনের পর হানাদার পাকসেনাদের হাত থেকে নিস্তার পেলেও ১৯৭১ এর দালাল আলবদর ও রাজাকারদের থেকে নিস্তার পায় না। ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর সকালে ১৩ জন ছাত্রের সঙ্গে তাকেও শহরের বাইরে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে হত্যা করে।

শহীদ এ. কে. এম. নূরুল হক টুকু : ১৯৭০ সালে সোনাতলা শাহসুলতান কলেজে আই. এস. সিতে ভর্তি হয়েছিল টুকু। শেখ মুজিবের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া জেলা সারা দেশের মতো ফুঁসছিল অধিকার আদায়ে সংগ্রামে তারই পরিক্রমায় ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী বগুড়া হানাদার মুক্ত করতে এলে টুকু তাদের গাইড করে দুপচাঁচিয়া থেকে বগুড়া শহরে নিয়ে আসে। উল্লসিতটুকু ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের সংবাদে তাকে একনজর দেখার জন্য ঢাকায় যান। পথিমধ্যে উল্লাপাড়ায় এক মাইন বিস্ফোরণে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শহীদ মখলেছার রহমান মুন্টু বগুড়া পলিটেকনিক্যালের ছাত্র মোখলেছার রহমান মুন্টু বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখেন। বগুড়ায় যখন যুদ্ধ হয় তখন তিনি যুদ্ধ করেন পাকহানাদার বাহিনীর সঙ্গে। বগুড়া প্রায় ১ মাস মুক্ত থাকার পর দ্বিতীয় বার যখন চারদিক থেকে আক্রান্ত হয় তখন তিনি তার ছোট ভাই মান্নানকে নিয়ে ভারতে চলে যান। ভারতে গেরিলা ট্রেনিংয়ের পর তারা আগস্টে বগুড়ায় ফিরে এসে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি নিজ বাড়ি মাড়িয়ায় তার সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জন্য যান। রাজাকারদের সংবাদের ভিত্তিতে পাকসেনারা তাকে ঘিরে ফেলে। পাকসেনারা বন্দি মুন্টুকে বগুড়া শহরে আনার সময় মুন্টুর দলের সঙ্গে পাকসেনাদের গুলি বিনিময় হয়। জানা যায় মখলেছার রহমান মুন্টুকে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন আগে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের পূর্ব পাশে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা।

শহীদ আব্দুল আলী মোল্লা : শহীদ আব্দুল আলী মোল্লা ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ। ১৯৭১ সালের ১১ই মে তিনি হানাদার পাকসেনাদের ভয়ে কাহালু থানার কানড়া গ্রামে পালিয়ে যান। তিনি কর্মজীবনে ছিলেন বগুড়া রেলওয়ে রিফ্রেজমেন্ট রুমের একজন কর্মী। পাকসেনারা তার বাড়িতে গিয়ে ছাত্র, আওয়ামী লীগ কর্মী ও হিন্দুদের অবস্থান জানতে চান। প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে তাকে ধরে কাহালু রেলস্টেশনে এনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

শহীদ আবু হাসান মহম্মদ জামাল : শহীদ আবু হাসান মহম্মদ জামালকে ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট তার বড় ভাই ডা. সিদ্দিকের বাসা থেকে হানাদার পাকসেনারা ধরে নিয়ে যান। জামাল আত্মরক্ষার জন্য পাকসেনাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে। এক পর্যায়ে একজন পাকসেনা জামালের ঘুষির আঘাতে মাটিতে পড়ে যায়। এতে পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অমানুষিক নির্যাতন করে ধরে নিয়ে যায়। পাকিস্তানীরা এতিমখানায় নিয়ে গিয়ে জামালকে গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ মকবুল হোসেন প্রামানিক : মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও থাকার ব্যবস্থাসহ নানা সহযোগিতা করার অপরাধে পাকসেনাদের হাতে রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় শহীদ হন। ১৯৭১ সালের ২৬ অক্টোবর রাতে তার বাড়ি ঘেরাও করে পাকসেনারা। আব্দুল কাদের ও আব্দুল হাকিমকে ধরতে না পেয়ে তাদের পিতা শহীদ মকবুলকে ধরে নিয়ে যায়। বহু নির্যাতন ও অত্যাচারের পর ৩০ অক্টোবর শেরপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদীর পাড়ে মকবুল হোসেনকে সন্ধ্যায় গুলি করে হত্যা করে। শহীদ মকবুল হোসেন একজন স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ছিলেন।

শহীদ অধ্যক্ষ মহসীন আলী দেওয়ান : বাংলাদেশের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী হত্যা একটি অন্যতম হৃদয়বিদারক ঘটনা। একটি জাতিকে পঙ্গু করতে সবচেয়ে আগে সে জাতির শিক্ষকদের মেরুদণ্ড ও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন সহজ হিসাব। ১৯৭১ সালে যে সকল বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের দোসরদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন তাদের একজন অধ্যক্ষ মহসীন আলী দেওয়ান। ১৯৭১ সালের ২ জুন অধ্যক্ষ মহসীন আলী দেওয়ান শেরপুর কলেজের অবস্থা দেখার জন্য শেরপুর আসেন। তার সাথে ছিল সহ- অধ্যক্ষ জনাব রোস্তম আলী, হাফেজ ওবায়দুল্লাহ। তিনি তার বাসস্থান সেউজগাড়িতে আসেন। বাড়ি দেখে চলে যাবার মুহূর্তে সেউজগাড়িতে বসবাসরত একজন বিহারী তাকে বলেন, "আপনি পরিবার পুরিজন সহ বাসায় চলিয়া আসুন। আপনার কোনও ভয়ের কারণ নাই।' বিহারী চলে যাবার আধঘন্টা পর কয়েকজন পাকসেনা দেওয়ান সাহেবের বাড়িতে আসেন। জানতে চান বাড়িটি তার কি না? জানা হলে মহসীন আলী দেওয়ানকে তার দু'জন সঙ্গীসহ শ্রমবিজ্ঞাগের কমিউনিটি হলের মধ্যে নিয়ে যায়। রোস্তম আলীকে ছেড়ে দিয়ে অধ্যক্ষ মহসীন আলী দেওয়ান ও ওবায়দুল্লাহ হাফেজকে গুলি করে হত্যা করে পাকসেনারা।

শহীদ আমিনুল কুদ্দুস (বুলবুল) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বগুড়ায় প্রথম পাকহানাদার বাহিনী আক্রমণ করলে বগুড়াকে বাঁচাতে অন্যান্য দেশপ্রেমিকের সঙ্গে

বুলবুলও প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম দফায় বগুড়া মুক্ত হলে তিনি সামরিক ট্রেনিং নেবার জন্য বাসার সামনে অবস্থিত করনেশন স্কুলে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য ১৯ এপ্রিল ৫ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে ভারতের দিকে রওনা হন। ২০ এপ্রিল সকাল ৮ টায় বগুড়া শহর থেকে ১২/১৪ মাইল দূরে দুপচাঁচিয়া থানার কাছে গিয়ে জানতে পারেন সেখানে কিছু পাকিস্তানী দোসর রয়েছে। এ সংবাদের প্রেক্ষিতে বুলবুল তার সঙ্গীদের নিয়ে পরিকল্পনা করে তার প্রস্তুতি নেন এবং দুপঁচাচিয়ার গ্রামবাসীদের সাহায্যে '৭১ এর দালালদের আক্রমণ করেন। আক্রমণের প্রথমদিকে তার সহযোদ্ধা ফারুক শহীদ হন। বুলবুল যখন পজিশন নিচ্ছিল ঠিক সে মূহূর্তেই তার ওপর পাকসেনারা গুলিবর্ষণ করে। গুলি বুলবুলের উরু ভেদ করে যায়। বুলবুল একসময় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শহীদ আনারুল হক (আজাদ) '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন শহীদ আনারুল হক আজাদ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সারাদেশে ক্রাক-ডাউন হয়। জ্বলে উঠেছিল বগুড়াও। রাস্তায় নেমে পড়েছিল নানা বয়সী মানুষেরাও। আজাদও তার ব্যতিক্রম নয়, ২৬ মার্চ পাকসেনারা বগুড়া শহর আক্রমণ করলে আজাদ নিজে রাইফেল নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। আজাদ বম্বে সাইকেল স্টোরের (গোহাইল রোডে) ওপরতলা থেকে পাকসেনাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। এতে একজন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনাদের মধ্যে চলে সম্মুখযুদ্ধ। গোলাগুলির একপর্যায়ে হানাদারের একটি গুলি এসে লাগে আজাদের মাথায়। আজাদের মাথার খুলি উড়ে যায়, আজাদ শহীদ হন।

শহীদ জাহেদুর রহমান (রঞ্জু) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রঞ্জুও প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তিনি তার পিতার ব্যক্তিগত ডাবল বেরেলের (দোনালা) বন্দুক ও পিস্তল নিয়ে পাকসেনাদের ওপর সাড়াঁশী আক্রমণ চালান। কয়েকদিন সম্মুখযুদ্ধ হয়। ২৮ মার্চ শহরে থমথমে অবস্থার মধ্যে বগুড়া হানাদারমুক্ত হয়। প্রথম বার বগুড়া মুক্ত হলে রঞ্জু বাড়িতেই ছিলেন। ২৩ এপ্রিল পাকসেনা আবার বগুড়া আক্রমণ করলে রঞ্জু তার মা-বাবার সঙ্গে কাহালুর ইছবপুরে চলে যান। সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তিনি ২৪ এপ্রিল ভারতে যাবার সময় দুপঁচাচিয়া পাকসেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে হানাদার পাকসেনাদের হাত থেকে পালিয়ে যান। পরে আদমদিঘী থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে আশ্রয় নেন তিনি। ৩/৪ দিন পর রঞ্জু ওখান থেকে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ভারতে যেতে পথিমধ্যে মির গ্রামে জামাতে ইসলামের দালালের হাতে ধরা পড়েন। পরবর্তীতে রাজাকারদের থানা জয়পুরহাটে হানাদার পাক সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শহীদ আব্দুস সাত্তার, আব্দুল কাদের ও আব্দুল সালাম : ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞে শহীদ হন একই পরিবারের তিন সন্তান। বিহারীদের সহযোগিতায় ওরা ৩ ভাইসহ আরও ৪ জনকে হানাদাররা ধরে নিয়ে যায়। পরে বগুড়া রেলস্টেশনের

দক্ষিণ দিকে পুকুরের পাড়ে নিয়ে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করে। হত্যা করার পর লাশগুলো পড়ে থাকে। হানাদারেরা চলে যাবার পর এলাকাবাসী তাদের কবর দেন।

শহীদ এস. এম. আকবর হোসেন (বকুল) : ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল হানাদাররা বগুড়ায় পুনরায় আক্রমণ করে। ট্যাংক ও বিমানের সাহায্যে তিনদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে বগুড়া শহর দখল করে। ঐদিন আকবর হোসেন তাঁর ৪জন সঙ্গী নিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে যুদ্ধচলাকালে তাঁরা ধরা পড়ে পাকসেনাদের কাছে। পাকসেনারা তাঁদের ধরে নিয়ে যায় পরে মাটিডালীর কাছে ইট ভাটায় আকবর ও তার সঙ্গীদেরকে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

শহীদ মীর মাকছুদুল হক (বাবলু) : ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। যুদ্ধের কারণে হয়ে গেলেন ফটোগ্রাফার। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা শহরে গোলাগুলি ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। সে সময় বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে বিভিন্ন ছাত্রাবাস ঘুরে পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার দলিল সংগ্রহ করেন ক্যামেরার মাধ্যমে। একদিন পাকিস্তানিদের বাঙালি হত্যাকাণ্ডের ছবি ও খবর সংগ্রহ করার সময় ধরা পড়েন পাকসেনাদের কাছে। পাকসেনারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহীদ ডা. কসির উদ্দিন তালুকদার : ১৯৭১ সালের ২৯ মে সকাল ৯টায় তদন্তের অজুহাতে তাকে বগুড়া থানায় নিয়ে যায়। সকাল ১০টার সময় ২জন পাকসেনা একটি জিপ গাড়িতে করে তাঁকে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তাঁর বাড়ীতে তল্লাশী চালানো হয়। এরপর আবার তাকে জিপে করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐদিন বেলা সাড়ে ১২টায় মাঝিড়া গ্রামে তাকে এক পুরানো কবরস্থানের মধ্যে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। কসিরউদ্দিনের অপরাধ ছিল তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা সেবা দিতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ঘাঁটি ছিল তার হোয়াইট হাউস নামের বাড়িটি। এ ছাড়া বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ৭২ বছর বয়সে ডা. কসির উদ্দিন তালুকদার শহীদ হন।

দড়িমুকুন্দ বধ্যভূমি

১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামে শেরপুর থানায় মির্জাপুর ইউনিয়নের দড়িমুকুন্দ গ্রামে হানাদার পাক সেনারা একসঙ্গে ২৪ জনকে হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তাদের সহযোগিতা করে রাজাকাররা।

দড়িমুকুন্দ গ্রামের ২৪ জন শহীদের তালিকা

১। আজাহার আলী ফকির
২। ওসমান গনি ফকির
৩। আজিজুর রহমান ফকির
৪। একরামুল হক ফকির

৫। সুজির উদ্দিন
৬। সেকেন্দার আলী
৭। বুলমাজন আলী
৮। রমজান আলী
৯। মোখলেছার রহমান
১০। ইছাহাক আলী
১১। আবেদ আলী
১২। আলীমুদ্দিন
১৩। ছোবাহান আলী
১৪। গুইয়া প্রামানিক
১৫। দলিল উদ্দিন
১৬। হাসেন আলী
১৭। উজির উদ্দিন
১৮। আয়েন উদ্দিন
১৯। আফজাল হোসেন
২০। মোহাম্মদ আলী
২১। আজিমুদ্দিন
২২। নেওয়াজ উদ্দিন
২৩। হায়দার আলী
২৪। জপি প্রামানিক

একাত্তরের বুদ্ধিজীবী

৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দোসরদের ও হানাদার পাক সেনাদের হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হয়েছে এ দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০৭৬ জন বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছেন। এর মধ্যে শিক্ষাবিদ ছিলেন ৯৬৮ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ২১, সাবেক গণ পরিষদ সদস্য ৮, সাংবাদিক ১৩ চিকিৎসক ৫০ এবং শিল্প সংস্কৃতি ব্যাক্তিত্ব সহ আরও ১৬ জন। এটি সঠিক পরিসংখ্যান নয় কেননা অনেকেই হয়তো দেশের আনাচে কানাচে রয়ে গেছে। আবার অখ্যাত অনেক বুদ্ধিজীবী ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তাদের নাম ঠিকান কিছুই জানা যায়নি। বগুড়া জেলায় এ পর্যন্ত ৩০ জন শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছে অথচ এ ব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্য জানা নেই। চলছে এদের অনেকের তথ্যানুসন্ধান। যাদের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা হলেন–

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ছিলেন একজন প্রকৌশলী। পিতার নাম আবুল খায়ের মোহাম্মদ সোলায়মান। ৯ জানুয়ারি ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে বি. এস. সি. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারি ডিগ্রি লাভ করেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যান উচ্চতর ডিগ্রির পর কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পে যোগদান করেন প্রকৌশলী হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে রাঙামাটি জেলার জেলা প্রশাসক তাকে ভারতে চলে যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি প্রত্যাখান করেন। কর্মস্থল ত্যাগ করেননি। দেশ মাতৃকার প্রতি গভীর টান অনুভব করেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যে কোনো মুহুর্তে আক্রমণ করতে পারে জেনেও তার চাকুরীর প্রতি তিনি ছিলেন দৃঢ়। ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল ৩.৩০ টায় কাপ্তাই প্রধান বাঁধের উপর দাঁড় করিয়ে দুই দুই বার গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাকে।

ডা. কসিরউদ্দিন তালুকদার : ১৮৯৯ সালে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া থানার মহিষমুন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কসির উদ্দিন তালুকদার। তিনি ছিলেন পেশায় একজন চিকিৎসক। ডা. কাসির উদ্দিন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসাসেবা দিতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনঘাঁটি ছিল তার বাদুরতলাল বাড়িটি। বগুড়ার হোয়াইট হাউস খ্যাত বাড়িটি রাজাকার ও হানাদার পাকবাহিনীর রোষে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবানলে ১৯৭১ সালের ২৯ মে ডা. কসির উদ্দিন তালুকদারকে হানাদাররা থানায় ধরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝিড়া (বর্তমানের শাহজাহানপুর) গ্রামের কবরস্থানের ভেতর নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে তাকে। পাক হানাদারদের

হত্যাকাণ্ডের পর গ্রামবাসীরা কসির উদ্দিনকে মাটিচাপা দেওয়া হয়। তিনি তার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এম.এল.সি ছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োজিত ছিলেন।

চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান বগুড়া শহরের রহমানের নগর পাড়ায় ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিক ও ছাত্রনেতা চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় নানা অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৭০-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 'দৈনিক আজাদ' ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ রির্পোটার হেলালুর রহমান ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনেও তার অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন দিবসে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্যারেডে নেতৃত্বে দেন। ৭১ এর স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতেই ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন ইকবাল হলে হানাদার পাকসেনাদের অতর্কিত হামলার সময় গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন।

নগেন্দ্রনাথ নন্দী : আইনজীবী নগেন্দ্রনাথ নন্দী বগুড়া জেলার জয়পুরহাট অঞ্চলের ক্ষেতলাল থানাধীন পৌলুঞ্জত গ্রামে ১৯০১ সালের ২২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিসিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৬ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। লেখাপড়ায় কৃতিত্বের জন্য তিনি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯২৭ সালে ২৩ জুন তিনি বগুড়া জেলা বারের তালিকাভুক্ত হন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল সপরিবারে কাহালু থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জনৈক কালী বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। কালী বাবু ছিলেন আইজীবী নগেন্দ্র নাথের একজন মক্কেল। ১৬ এপ্রিল রাজাকার আল বদরের ২০/২৫ জন অতর্কিতে সেই বাড়িতে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুট করে এবং সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাক সেনাদের হাতে তুলে দেন। নরপশু পাক হানাদার তাদেরকে কাহালু বাজার থেকে অদূরে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে হত্যা করে।

ছমির উদ্দিন মন্ডল : ছমির উদ্দিন মন্ডল বগুড়া জেলার অন্তগর্ত (যুদ্ধের পূর্বে জয়পুরহাট বগুড়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল) জয়পুরহাটের মানিপাড়া গ্রামে ১৯৩৩ সালের ১২ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম সফি উদ্দিন মন্ডল। ছমির উদ্দিন মন্ডল জয়পুরহাটের আক্কেলপুর সোনামুখী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বগুড়া আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে আই. এ পাশ করেন। তিনি বাম রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের একজন ভাষা সৈনিক ছিলেন। এবং জয়পুরহাট আখচাষী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৯ মে দেশ মাতৃকার জন্য লড়াইয়ে শারীক হতে ট্রেনিং গ্রহণের জন্য ভারতের দিকে রওনা হন কিন্তু পথিমধ্যে মুসলিমলীগ এবং জামায়েত ইসলামের দালালদের হাতে ধরা পড়েন। সোনামুখী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথাকথিত শান্তি কমিটির সেক্রেটারি মতিউর রহমানের যোগসাজশে ছমির উদ্দিন মন্ডলকে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে

সোর্পদ করা হয়। আমানুষিক নির্যাতন করে তাকে ১৯৭১ সালের ১৩ মে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এ. কে. এম বদিউজ্জামান মন্ডল : এ. কে. এম বদিউজ্জামান মন্ডল, জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা পশ্চিম কুজাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার শৈশব কৈশোর ও শিক্ষাজীবন কাটে জয়পুরহাটেই। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এ পাশ। বদিউজ্জামান মন্ডল এদেশের প্রতিটি সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বগুড়া জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন। বদিউজ্জামানকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আব্দুল জোব্বার এ্যাডভোকেট আব্দুল জোব্বার বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের মঙ্গলবাড়ি গ্রামে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে এল এল বি ডিগ্রি লাভ করে তিনি বগুড়া আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। তিনি উত্তরবঙ্গে একজন দক্ষ আইনজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৭০ সালে আব্দুল জোব্বার বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, আশ্রয় দান এবং কর্মপন্থা নির্ধারণে নেতৃত্বে দান করেন। বগুড়া যখন হানাদার পাক সেনা দ্বারা আক্রান্ত ও বিধস্ত তখন তিনি দেশের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন দৃঢ় করার জন্য গ্রামে চলে যান। তিনি ছিলেন হানাদার পাকসেনাদের প্রধান শত্রু। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মে তিনি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

মণিভূষণ চক্রবর্তী : বগুড়া জেলার জয়পুরহাট অঞ্চলের হাটশহর গ্রামে ১৯২৭ সালের ৩০ এপ্রিল মণিভূষণ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শহীদ হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত একজন ইউপি সদস্য ছিলেন। সমাজসেবামূলক নানা কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। একাত্তরের রাজাকার আলবদরদের নির্যাতনের শিকার হন তিনি। মণি ভূষণ চক্রবর্তী স্থানীয় পাকিস্তানি দোসরদের সহায়তায় হানাদার পাকসেনারা তাকে ধরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করে। ১৯৭১ সালের ২ মে তিনি পাকসেনাদের হাতে নিহত হন।

মোহসীন আলী দেওয়ান অধ্যাপক মোহসীন আলী দেওয়ান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি ভূটিয়া পাড়া গ্রামে, জয়পুরহাট। তার শিক্ষাজীবন ও শৈশব কাটে বগুড়ার মাটিতে আজিজুল হক কলেজ থেকে বি. এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করেন ছাত্র জীবনেই। রাজনীতিতে যুক্ত হবার ফলশ্রুতিতে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের ছাত্র সংসদ-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মোহসীন আলী দেওয়ান কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি নওগাঁ ও বগুড়া আজিজুল হক কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বগুড়ার "সাপ্তাহিক বগুড়া বুলেটিন" ও সান্ধ্য দৈনিক 'জনমত' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। বগুড়া প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বগুড়া প্রাথমিক শিক্ষক

সমিতিরও সভাপতি ছিলেন মহসিন আলী দেওয়ান। গল্পকার হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। "অতএব" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তার 'গল্পের চিড়িয়াখানা' নামে ছোট গল্পের বইও প্রকাশিত হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

কাজী আবুল কাশেম : ১৯১৯ সালে বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরহাটের দেবীপুর গ্রামে কাজী আবুল কাশেম জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী মনির উদ্দিন। পেশায় তিনি ছিলেন এইচ. এম. বি পাশ করা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। তিনি আওয়ামীলীগের ডাক্তার হিসেবে পরিচিত ছিলেন সর্বমহলে। সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিতেন ভালবেসে, বিনা পয়সায়। তিনি ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২ এবং ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ৬৯-এর গণ আন্দোলনে তার সক্রি ভূমিকা ছিল। এলাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল নাম ছিল আবুর কাশেম। ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাদের দোসর রাজাকারদের সহযোগিতায় তাকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই পুনরায় তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আবুল কাশেমের সাহসী ভূমিকায় যুবসামজ জেগে উঠেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আব্দুস সাত্তার : বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর এলাকায় ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন আব্দুস সাত্তার। তিনি বি. এ এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। চাকুরি জীবন শুরু করেন ঢাকাতে। কর্মরত অবস্থায় তিনি জানতে পারেন অবাঙ্গালী বিহারীরা বগুড়া শহরে লুটতরাজ করছে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি বগুড়া শহরে আসেন। নিজ বাড়িতে গেলে অবাঙ্গালী বিহারীরা তাঁকে ধরে ফেলে। বগুড়া রেলস্টেশনের মসজিদের দক্ষিণ- পূর্ব কোণে নিয়ে গিয়ে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা হয় তাকে।

দবির উদ্দিন মন্ডল : বগুড়া জেলা সদর থানার গোকুল ইউনিয়নের রামশহরে জন্মগ্রহণ করেন দবির উদ্দিন মন্ডল। পিতা বিখ্যাত সুফী ডা. ক্বাহারউল্লাহ। দবির উদ্দিন পীর পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি নওগাঁ জেলার পতিসর স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজাকারদের সহায়তায় এ বাড়িতে তার পরিবারের ১১ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই এগারজনের একজন ছিলেন দবির উদ্দিন মন্ডল।

তথ্যসূত্র :

১। শত শহীদ বুদ্ধিজীবী- আসলাম সানী। প্রকাশকাল ১৯৯২।

২। শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ, সম্পাদনা রশীদ হায়দার, প্রকাশকাল ১৯৮৫।

কতিপয় মুক্তিযোদ্ধার চোখে

সশস্ত্র প্রতিরোধে বগুড়া : এ্যাডভোকেট গাজীউল হক

১৯৭১ সাল। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে তিনটা। এমদাদুল হক নামে এক তরুণ বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। দু'মিনিটে তৈরি হয়ে নিলাম। চিন্তা-ভাবনার ফুরসৎ নেই। ছুটতে হলো। ডা. জাহিদুর রহমান (এম. পি) তাঁর বাড়ির দোতলায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাকতেই নেমে এলেন। তাকে নিয়েই ছুটতে ছুটতে থানায় হাজির হলাম।

দারোগা নিজামউদ্দিন এবং নুরউল ইসলাম তিনজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে রাইফেল হাতে নির্দেশমত আজাদ রেস্ট হাউসের ছাদে ঘাঁটি গাড়লেন। পাকিস্তানি সেনা রেল লাইন পার না হওয়ার পর্যন্ত তারা আক্রমণ চালাবেন না এই নির্দেশ তাদের দেয়া হল। পুলিশ ফোর্সের অন্যান্যদের অস্ত্রশস্ত্রসহ পুলিশ লাইনে পাঠিয়ে দিলাম। মকবুল সাহেব চলে গেলেন অয়ারলেসে আর কোথাও যোগাযোগ করা যায় কিনা সে সেষ্টা চালাতে।

থানা থেকে বেরোতেই দেখি গেটে ২০-২৫ জন ছাত্র-যুবক জমায়েত হয়েছে। খবর তারাও পেয়েছে। তাদের নিয়ে ডা. জাহিদুর রহমান এবং আমি ছুটলাম উত্তর দিকে। যত দ্রুত সম্ভব মাটিডালি পৌছাতে হবে। ব্যারিকেড দিয়ে প্রথম বাধাঁর সৃষ্টি করতে হবে। শেষরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শ্লোগান উঠলো 'জাগো জাগো বীর বাঙালি জাগো' জয় বাংলা বীর বাঙ্গালি হাতিয়ার ধরো, পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ কর।

রিজার্ভ ইনস্পেকটরের সঙ্গে পুলিশলাইনে কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। স্থির হলো ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পুলিশ লাইনে তারা প্রস্তুত থাকবেন। সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স। শহরে যখন ফিরে আসি তখন সকাল সাতটা। রাস্তায় লোক নেমে পড়েছে। কিন্তু অস্ত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। একনলা, দোনলা, বন্দুক এবং টু-টু বোর রাইফেলসহ মাত্র আটাশটি। শুধু আজাদ গেস্ট হাউসের ছাদে দারোগা নিজামউদ্দিন এবং তার চার সঙ্গীর কাছে পাঁচটি ৩০৩ রাইফেল। যে দুরন্ত সাতাশটি ছেলে আমার সঙ্গে ২৬ মার্চের ভোরে অকুতোভয়ে হানাদার পাক বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিল তাদের সকলের নাম আজ ভাল মনে নেই, তবে যে নামে তারা পরিচিত সে নামই নিলাম। তারা হলো (১) এনামুল হক তপন (২) শহীদ জলিল (৩) এমদাদুল হক তরুণ (৪) নূরুল আনোয়ার বাদশা (৫) শহীদ টুি (৬) শহদি হিটলু (৭) শহীদ মুস্তাফিজ (ছুনু) (৮) শহীদ আজাদ (৯) শহীদ তারেক (১০) শহীদ খোকন পাইকার (১১) সালাম (স্বাধীনতার পর আতাতয়ীর হাতে নিহত) (১২) বখতিয়ার হোসেন বখতু (আর্ট কলেজের ছাত্র) (১৩) খাজা সামিয়াল (১৪) মমতাজ (বর্তমানে বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগ সম্পাদক (১৫) রাজিউল্লাহ (১৬) টি. এ. মুসা

(১৭) নান্না (১৮) সৈয়দ সোহরাব (১৯) শহীদ বকুল (২০) বুবলা (২১) জাকারিয়া তালুকদার (২২) মাহতাব (২৩) টাটারু (২৪) বুলু (২৫) বেলাল (২৬) এ. কে এম রেজাউল হক (রাজু (২৭) ইলিয়াস উদ্দিন আহমদ।

২৬ মার্চের সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পাক সেনা সুবিল পার হয়ে বগুড়া শহরে ঢুকলো। সুবিল পার হবার আগে মাটিডালি, বৃন্দাবনপাড়া এবং ফুলবাড়ি গ্রামের কিছু কিছু বাড়ি তারা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। শহরে ঢুকবার পর পাক সেনাদল রাস্তার দু'পাশ দিয়ে দুটো লাইনে এগুতে শুরু করে।

পাকসেনারা রেল লাইনের দু'নম্বর ঘুমটির কাছে যেতেই আজাদ রেস্ট হাউসের ছাদ থেকে দারোগা নিজামউদ্দীন, দারোগা নুরুল ইসলাম এবং তাদের সহযোগীদের ৩০৩ রাইফেল গর্জে উঠলো। সম্মুখ দিক এবং দুপাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে হানাদার সৈন্যরা থমকে দাঁড়ালো কিছুটা।

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় বাদুড়তলার একটি বাড়িতে যুদ্ধ পরামর্শ সভা বসলো। আলোচনা শেষে জনাব মোখলেসুর রহমানের প্রস্তাবক্রমে পাচ সদস্যের একটি হাই কমান্ড গঠন করা হলো–

(১। গাজীউল হক (অদলীয়), সর্বাধিনায়ক, (যুদ্ধের দায়িত্ব)

(২) ডা. জাহিদুর রহমান (আওয়ামীলীগ, খাদ্য এবং চিকিৎসার দায়িত্ব)

(৩) জনাব মাহমুদ হাসান খান (আওয়ামীলীগ) প্রশাসন।

(৪) জনাব মোখলেসুর রহমান (মোজাফফর ন্যাপ যোগাযোগ)

(৫) জনাব আবদুল লতিফ (কন্যুনিস্ট পার্টি), প্রচার ২৬ মার্চ রাতেই আমরা সুবিলের দক্ষিণ পাড়ে ঘাঁটি স্থাপন করি।

২৭ মার্চ সকাল আটটা। সুবিলের উত্তর পাড় থেকে পাকসেনারা গুলি বর্ষণ শুরু করে পাল্টা জবাব দেয় আমাদের ছেলেরা। এই দিন ঝন্টু, মাহমুদ, ডা. টি. আহমদের ছেলে মাসুদ, গোলাম রসুল, বিহারীর ছেলে (নামটি মনে নেই), রশীদ খানের ছেলে গুলাব, রেডিও রফিকুল ইসলাম লাল, শহীদ আবু সুফিয়ান রানা এবং আরও অনেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সকাল সাড়ে আটটার দিকে ডা. জাহিদুর রহমান পুলিশ লাইন থেকে পুলিশ বাহিনীর ৬০ জনের এক দলকে নিয়ে এলেন। ৩০৩ রাইফেল হাতে আমাদের ছেলেদের পাশাপাশি তারাও অবস্থান নিলেন। দুইপক্ষে প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি হলো। গোলাবৃষ্টির মধ্যেই হানাদার বাহিনী সড়ক ধরে এগিয়ে এসে শহরের উত্তর প্রান্তে কটন মিল দখল করলো। তখন বগুড়া শহরের উত্তর সীমার প্রান্তে ছিল কটন মিল। পুলিশ এবং আমাদের ছেলেদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে শহরের ভিতরে বেশি এগিয়ে আসতে পারলো না হানাদাররা। এদিনের যুদ্ধে পাকসেনারা ভারী মেশিনগান ব্যবহার করে এবং মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। বিকেল তিনটায় মর্টারের গোলার আঘাতে শহীদ হলো তারেক, দশম শ্রেণীর ছাত্র। মৃত্যুর সময়েও তার হাতে ধরা ছিলো একটি একনলা

বন্দুক। তারেকের রক্তে ভিজে গিয়েছিল আমার বুক। মনে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছিলাম।

২৭ মার্চে রাতে খবর পেলাম মেজর জিয়াউর রহমান চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছেন।

২৮ মার্চের সকাল। কটন মিলের গেস্ট হাউসের ছাদে পাকসেনারা মেশিন গান বসিয়েছে। তখনো গোলাকুলি শুরু হয়নি। মেশিনগানের পাশে দু'জন পাকসেনা দাঁড়িয়ে। একজন পাকসোন ছাদের রেলিং এ ভর দিয়ে কি যেন দেখছে। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে দুরন্ত ছেলে তপন রাইফেল তুললো। অব্যর্থ লক্ষ্যে ছাদের উপর থেকে পাকসেনাটি ছিটকে পড়লো মাটিতে। পিছু হটে তপন লাফিয়ে পড়লো রাস্তার পাশের নর্দমায়। নর্দমার দেয়াল ঘেঁষে এলো আড়ালে।

শুরু হলো এলোপাতাড়ি গোলাবৃষ্টি। ১৮ মার্চ মুক্তিসেনারাও দলে ভারী। মিণ্টু ডিউক, লিয়াকত পরে রাজাকার হয়ে যায়। আবদুর রহমান, মামুন হক সাহেবের কম্যুনিষ্ট পার্টির, হারুন (ব্যাংখ অফিসার) ধলু, বজলু, মুকুল, সাত্তার রশীদ (রশীদ গুন্ডা নামে খ্যাত ছিলো) এবং গ্রাম থেকে প্রায় শ'খানেক বন্দুকসহ এসে যোগ দিয়েছে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্বেও ভারী মেশিনগানের গুলী এবং মর্টারের গোলাবর্ষেণের আড়াল নিয়ে বেলা সাড়ে তিনটার পর পাকসেনারা ক্রস করে শহরে ঢুকতে শুরু করলো। প্রচণ্ড প্রতিরোধের মধ্যেও তারা এগিয়ে চললো। বেলা ডোবার একটু পর পাকসেনারা রেল লাইন পার হয়ে থানার মোড়ে পৌছালো। হতাশ হয়ে গেলাম, এবার বগুড়ার পতন নিশ্চিত প্রায়।

২৮ মার্চ রাতে সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে ৩৯ জন ই. পি আর- এর একটি দল বগুড়া পৌছায়। অস্ত্র বলতে তাদের রাইফেল, কয়েকটি গ্রেনেড এবং তিনটি এল. এম. জি। বিনা খবরে ওরা পৌছায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হই। পুলিশ লাইনে ওদের নিরস্ত্র করে নওগাঁয় মেজর নাজমুল হকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম তিনি ই. পি. আর'দের কাজে লাগতে বললেন এবং ৩০ মার্চ নিজে বগুড়া আসবেন বলে জানালেন।

২৯ মার্চ। সকাল বেলায় সবিস্ময়ে দেখলাম রাতের অন্ধকারে হানাদার পাকসেনা কটন মিলের গেস্ট হাউস ছেড়ে সুবিরের উত্তর পাড়ের ঘাটিতে ফিরে গেছে। নিশ্চয়ই গুপ্তচর মারফত তারা ই. পি আরদের পৌছানোর খবর পায়। সকাল ৯ চায় সুবেদার আকবর এবং মাসুদ রেকী করতে বের হলো। বেলা ১১ টায় ই. পি আর-এর কয়েকজন পাকসেনাদের দিকে এম.এম. জি মুখকরে কটন মিলের ছাদে বসালেন। বেলা আনুমানিক বারোটার সময় পাকসোনরা বৃন্দাবন পাড়া প্রাইমারি স্কুলের ঘাটি থেকে মর্টারের আক্রমণ শুরু করে। এইবার আমাদের তরফ থেকে তিনটি এল. এম. জি'র মুখ দিয়ে পাল্টা জবাব গেলো। সন্ধার সময়ে দুপক্ষের গোলাগুলি বন্ধ হয়। করিম হাওলাদার নামে একজন পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

৩০ মার্চ। বেলা ৯ টায় জেলা প্রশাসক খানে আলম সাহেব খবর পাঠালেন মেজর নজমুল হক এসেছেন। দেখা হলো মেজর নজমুলের সঙ্গে। মাঝারি গড়নের শ্যামলা রংয়ের একহারা চেহারা। সর্বাঙ্গে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

৩১ মার্চ। দিনের বেলা দু'পক্ষই নীরব। খবর এলো ক্যাপ্টেন আনোয়ার এবং ক্যাপ্টেন আশরাফের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে এবং ঘোড়াঘাটে অবস্থান করছেন। ৩১ মার্চ রাতে অসীম সাহসী সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তি সেনারা মহিলা কলেজের ঘাটিতে গ্রেনেড চার্জ করলো। পেট্রোলের ড্রামে আগুন ধরিয়ে গড়িয়ে দেয়া হলো পাক সেনাদের ঘাঁটির দিকে। পাক সেনাদের ঘাটি থেকে লক্ষ্যবিহীন গুলির শব্দ শুনা গেলো। তারপর অন্ধকারে মোটর কনভয়ের শব্দ। কিছু বোঝা গেলো না। ভোরে দেখা গেলো পাকসেনা বগুড়া ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে গেছে।

১ এপ্রিল। সকালেই সারা শহর রাষ্ট্র হয়ে গেলো হানাদার বাহিনী পালিয়েছে। সারা শহরে আনন্দের ঢেউ। হরিরগাড়ীর গোপন আড্ডা থেকে সার্কিট হাউস কন্ট্রোল রুমে এসেছি। সুবেদার আকবর এসে দাঁড়ালেন। স্যার, আড়িয়া ক্যান্টেনমেন্ট আক্রমণ করবো অনুমতি চাই, কিছু জানি না বুঝি না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো চলুন।

৩৯ জন ইপি আর. ৫০ জন পুলিশ বাহিনীর লোক এবং ২০ জন মুক্তিসেনা বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম এই তিন দিক থেকে ঘেরাও করা হলো। দু'পক্ষ থেকে গুলিবৃষ্টি চলছে। এরই মধ্যে বিমান আক্রমণ শুরু হলো। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে গ্রামের হাজার হাজার লোক টিনের ক্যানেস্তারা পেটাতে শুরু করলো। বোমাবর্ষণ বন্ধ হবার পর আবার কিছুটা এগুলাম। কিন্তু পাক সেনারা অবিরাম গুলি চালিয়ে যেতে লাগলো। অবশ্য তাদের সুবিধা ছিলো। ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পৌছাতে হলে আমাদের একটা ফাঁকা মাঠ পাড়ি দিতে হয়। সেদিন ছিল দক্ষিণের জোর হাওয়া, গ্রামের লোকদের অনুরোধ জানানো হলো তারা ক্যান্টনমেন্ট দক্ষিন দিক থেকে মরিচের গুলো ছাড়তে পারে কিনা। ব্যস আর বলতে হলো না। কোথা থেকে এতো মরিচের গুলো ভেসে এলো তা বলা কঠিন। ক্যান্টনমেন্ট এর ৫০০ গজ উত্তরে আমাদের চোখমুখ জ্বলতে লাগলো। বেলা তখন আড়াইটা। আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট সাদা পতাকা উড়লো।

আনন্দের আতিশয্যে রাইফেল হাতে লাফিয়ে উঠলো অসীম যোদ্ধা মাসুদ। আর তৎক্ষণাৎ শত্রুর নিক্ষিপ্ত শেষ বুলেটটি তাকে বিদ্ধ করলো। শহীদ হলো নির্ভীক সেনা, বগুড়ার এক বীর সেনানী। যুদ্ধে জয় হলো। পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। বন্দী সেনাদের এবং আটান্ন ট্রাক ভর্তি এম্যুনিশন নিয়ে ফিরলাম। কিন্তু চোখের জল বাধা মানছিলনা। মাসুদকে হারিয়ে এলাম চিরদিনের জন্য। সেদিনই ঘোষণা করেছিলাম আড়িয়ার নাম হবে মাসুদ নগর। রাতে ২১ টি গান স্যালুটের মাঝে মাসুদকে কবরে সমাহিত করলাম। দেখলাম ডাক্তার জাহিদুর রহমানের দু'চোখের জলের ধারা নেমে এসেছে।

আড়িয়ার ক্যান্টনমেন্ট এর একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন নুরসহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে ছিলো ২১ জন পাঞ্জাবী সেনা। জনতার ক্রুদ্ধ আক্রমণের হাত থেকে এদের রক্ষা করতে পারিনি। জেলখানার তালা ভেঙ্গে ওদের বের করে নিয়ে এসে কুড়াল এবং বটি দিয়ে কুপিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে ওদের হত্যা করে। বাঙ্গালি সেনারা যারা ছিলো তাদের নজরবন্দী করে রাখা হলো। আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট কিছু চাইনিজ রাইফেল ও গুলি পাওয়া যায়। ৫৮ ট্র্যাক ভর্তি এম্যুনিশন পাই, কিন্তু তা ব্যবহারের অস্ত্র ছিলো। অস্ত্র বিশেষজ্ঞারা বলেন সেগুলো ছিলো ১০৫ গান এবং আর-আর-এর এম্যুনিশন।

২ এপ্রিল। পাবনার এস-পি জনাব সাঈদ এলেন এবং কিছু রাইফেলের গুলী নিয়ে গেলেন। তাকে বললাম যেমন করে হোক ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবকে বগুড়া দিয়ে আসতে।

৩ এপ্রিল। জনাব কামরুজ্জামান, শেখ মনি এবং তোফয়েল আহমদ বগুড়া এসে উপস্থিত হলেন। ডা. মফিজ চৌধুরীকে সঙ্গে দিয়ে তারেদ সীমান্ত পার করে দেবার ব্যবস্থা করলাম। জনাব শেখ মনির কাছেই জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু পাক সেনাদের হাতে বন্দি।

৪ এপ্রিল। বগুড়া আওয়ামী লীগের জনাব আবদুর রহিম তালুকদার জীপ দিয়ে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে নিয়ে বগুড়া পৌছালেন। তার সঙ্গে জনাব আবু সাঈদ এম-পি। মনসুর ভাইকে বিশেষ করে অনুরোধ করলাম যাতে প্রোভিশনাল গভর্নমেন্ট এর নাম ঘোষণা করেন। মনে আছে একটা সিগারেটের প্যাকেটের সাদা অংশে বি এস এফ এর কর্নেল মুখার্জীকে লিখেছিলাম মনসুর ভাইকে নিরাপদে তাজুদ্দিনের কাছে পাঠানোর জন্য।

৫ এপ্রিল। মেজর নজমুক হক বুগাড় এলেন। জেলা প্রশাসক জনাব খান আলমের কুঠিতে আলোচনা সভা বসলো। মেজর নজমুল হক জানালেন যেমন করে হোক ১০৫ কামান এ্বং আর-আর জোগাড় করতে হবে। তিনি বললেন হিলিতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার চাটার্জীর সংগে দেখা করতে। তার সঙ্গে আলোচনায় ঠিক হলো, যদি কোন প্রকারে আমরা রংপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে উত্তরাঞ্চল শত্রুমুক্ত করতে পানি তাহলে ভবিষ্যতে পাকিস্তনিদের পাল্টা আক্রমণ ঠেকাতে পারবো।

৬ এপ্রিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি এবং জাহিদুর রহমান হিলি যাই। পশ্চিম হিলিতে গেলে আমাদের দু'জনকে এক প্রকার নজরবন্দী করে রাখে সারাদিন। সন্ধ্যায় জানালো রাত তিনটায় ব্রিগেডিয়ার চ্যাটার্জী আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। রাত তিনটায় ব্রিগেডিয়ার চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাদের দু'পেটি ৩০৩ রাইফেলের গুলী দিয়ে বিদায় দিলেন এবং ১৬ এপ্রিল হিলিতে তার সঙ্গে আবার দেখা করতে বললেন। জানালেন তিনি ভারত গভর্নমেন্টকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে অস্ত্র সাহায্য করতে অনুরোধ জানাবেন।

৭ এপ্রিল। প্রায় খালি হাতেই বিকেল বেলা আমি এবং ডা. জাহিদুর রহমান হিলি থেকে ফিরলাম। মুক্তিসেনারা সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো। কিন্তু আপাতত

কোনো সামরিক সাহায্য না পাওয়ায় কিছুটা হতোদ্যম হলো। বলতে ভুলে গেছি, ২ এপ্রিল থেকেই মুক্তি সেনাদের কয়েকটি ক্যাম্পে, সেন্ট্রাল রুম শিফ্‌ট করেছিলাম দোতলায়। বগুড়া সার্কিট হাউসে প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল।

জনাব এম আর আখতার মুকুলকে কেরোসিন, ডিজেল এবং পেট্রোল এর পারমিট ইস্যু করার দায়িত্ব দেয়া হয়। খালি হাতে ফিরে আসার খবর জেনে মুকুল একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, শালা সেরেছে। এবার আস্তানা গুটাও। পাকিস্তানী খুনীরা এবার তোমার জন্য ট্যাংক নিয়া আইবো। এদিকে তোমার মুক্তি সেনাদের থামাও। এরা কোনো শৃঙ্খলা মানে না। এরাই এখন প্রব্লেম। দেখলাম তাই। মুক্তি সেনাদের মধ্যে একদল ভীষণ উশৃঙ্খল হয়ে উঠছে। এদের নিয়ন্ত্রণে রাখাই মুস্কিল। তাছাড়া পাকসেনা সরে যেতেই দলীয় কোন্দল মাথা চাড়া দিয়েছে। দুষ্কৃতকারীরাও সুযোগ নেবার চেষ্টায় আছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শেষ চেষ্টা চালালাম।

৮ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটলো না। ১৩ এপ্রিল সিরাজগঞ্জের মহকুমা অফিসার শহীদ শামসুদ্দীন দেখা করলেন এবং সিরাজগঞ্জ নগরবাড়ির ডিফেন্সের ব্যবস্থাও বগুড়া থেকে করতে অনুরোধ জানালেন।

১৪ এপ্রিল, হিলি থেকে একটা খবর আসে। যেসব এম্যুনিশন আড়িয়া যুদ্ধে পাওয়া গেছে তার নুমনা নিয়ে অতি অবশ্য হিলিতে দেখা করতে হবে। ১৪ এপ্রিল রাতে সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তি সেনার একটি দল নগরবাড়ি প্রতিরক্ষার জন্য পাঠানো হলো।

১৬ এপ্রিল জনাব এম আর আখতার মুকুল, খন্দকার আসাদুজ্জামান, মজিবর রহমান এমপি. ডা. জাহিদুর রহমান এম. পি. এবং দু'জন ইপিআরদ সাথে নিয়ে এম্যুনিশনের নমুনা সহ বিকেল বেলা হিলি পৌছি। সেদিন বিকেলেই কর্নেল ব্লিৎস এম্যুনিশনগুলো পরীক্ষা করেন। ঐদিন রাতেই আমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কোলকাতা যেতে বলা হয়। ১৭ এপ্রিল ভোরে আমরা কোলকাতা রওয়ানা হই।

১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় লর্ড সিনহা রোডে অস্থায়ী সরকারের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান এবং পার্লামেন্ট সদস্য জনাব আবদুর মান্নান এবং আবদুস সামাদ আজাদ এর নিকট বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করি।

২২ এপ্রিল বগুড়া শহরের পতন ঘটে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র এ নবম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৪৮০-৪৯০ সংকলিত। তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশগ্রহণ – মাসুদুর হেলাল

২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ২ টা। এ সময় আমরা বগুড়া শহর টহল দিচ্ছিলাম। স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র ইউনিয়নের গ্রুপের কমান্ডার ছিলাম আমি। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল সারা শহর টহল দেওয়া। আমার সাথীদের নিয়ে যখন টহল দিচ্ছিলাম তখন আমি গোশালা অর্থাৎ জামিল বিড়ি ফ্যাক্টরির সামেন একটা বিহারীর বাড়িতে আগুন লাগলে আমরা সেখানে দেখতে গেলাম। এমন সময় থানা থেকে একজন সিপাহী খবর দিল যে থানার ওসি আমাদের ডাকছে। তাড়াহুড়া করে আমরা থানায় এলাম। উনি বললেন এইমাত্র থানা থেকে মেসেজ পেলাম যে রংপুর থেকে হানাদার পাক বাহিনী বগুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। ওসি সাহেব বললেন, বগুড়া শহরের মানুষকে এ খবর জাগিয়ে দিতে হবে। রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বগুড়ায় ঢুকতে না পারে। তখন আমরা জীপ নিয়ে হুইসেল ও টিন পিটিয়ে বগুড়া বাসীকে ডেকে তুললাম। আমরা রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করি জনতাকে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন রাতে বেরিকেড দিতেই ব্যস্ত ছিলাম। ২৬ মার্চ সকাল সাড়ে আটায় পাকবাহিনী বগুড়ায় ঢুকল। পাকবাহিনী রাত দুইটার সময় মার্চ করেছে। রাস্তায় আসতে দেরি করেছে। পাকবাহিনী বগুড়া শহরে ঢুকল। আসার সময় গোকুলে একজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। এ সময় বগুড়া শহরে এ . জেড খানের বন্দুকের দোকান (সিটি মেডিকেলের পাশের দোকান) ও আড়িয়া বাজার ক্যান্টেমেন্ট থেকে লুট হওয়া অস্ত্র আমাদের হাতে ছিল। এর মধ্যে দেশী রাইফেল চায়নীজ রাইফেল, থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছিল। আমরা রাস্তায় বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলাম। আমরা প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। তখন আমার স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র ইউনিয়ন বিগ্রেডের অনেকেই টেনিংপ্রাপ্ত ছিলাম। যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিল তারা ছিল বড়গোলায় ব্যাংকের ছাদের ওপরে। যুদ্ধ চলছিল। ২৬ মার্চ হানাদার বাহিনী বাঘোপাড়া এলাকা দিয়ে বগুড়ায় প্রবেশ করেছিল। পাকা হানাদাররা পথে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তারা প্রথমেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। এদিকে বাঘোপাড়া থেকে শুরু হয়েছে শতাধিক পয়েন্ট। বন্দুক, বল্লম, দা-কুড়াল, লাঠি-সোটা নিয়ে পাকা হানাদারদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত সর্বস্তরের মানুষ। এমন সময় পাকহানাদার বাহিনীর সৈন্যরা এগিয়ে আসছিল ঠেঙ্গামারা গ্রামের দিকে। তখন সকাল সাতটা। গ্রামের যুবকরা গাছ কেটে রাস্তায় প্রতিরোধে ব্যস্ত এমন সময় তোতা মিঞা নামের একজন রিক্সাচালক ও তার সঙ্গীরা বাঘোপাড়া নওদাপাড়া এলাকা (বগুড়া-রংপুর সড়ক) গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করার কাজ করছিল। পাকহানাদার বাহিনীর ট্যাংক ও লরি জীব এগুচ্ছে সামনের দিকে তোতা মিঞার সঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। আশ্রয় নেয় রাস্তার ঝোপের কাছে। অসীম সাহসী তোতামিয়া কুড়াল নিয়ে এগিয়ে যায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কনভয়গুলোর দিকে। পাকসেনারা গুলি চালালে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিতে পড়ে তোতা মিঞা। বগুড়ায় প্রথম শহীদ হয় তোতা মিঞা। তোতা মিঞার লাশের উপর দিয়ে হানাদাররা ট্রাক চালিয়ে

যায়। পাক হানাদর বাহিনী সুবিল পার হয়ে এগিয়ে আসে শহর অভিমুখে। বড়গোলার কাছে এসে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয় হানাদার পাকবাহিনী ও মুক্তিসেনাদের মধ্যে। আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা কেউ রাস্তায়, কেউ ছাদে, কেউ দোতলায় অবস্থান নিয়েছিল। যখন দু'পক্ষের যুদ্ধ চলছিল তখন পাকসেনাদের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় টিটু। হিটলুকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায় পাক সেনারা তারপর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকবাহিনী ঝাউতলার দিকে এগিয়ে আসে। এখানে আজাদ ভাইকে হত্যা করে। পাকসেনারা। আমাদের কঠোর প্রতিরোধটা ছিল ২নং রেল ঘুমটির ওপারে। কারণ ঐদিন ভোরে কিছু মালগাড়ি এনে রেল লাইনের ওপর আমরা এলোমেলো করে রেখে দেই। রেলঘুমটিকে লক করে দেই। লক্ আপ করে চাবিটা সরিয়ে দেই। এখানে আমরা পুলিশসহ প্রতিরোধ গড়ে তুলি। ওসি নিজাম সাহেবের উদ্যোগে আমরা পুলিশ, ছাত্র জনতা অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রতিরোধ গড়ে তুলি। তখন পুলিশ লাইন থেকেও পুলিশ এসে দল ভারী করেছিল আমাদের যুদ্ধ শুরু হল। আমার ধারণা পাকসেনাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে ২নং রেল ঘুমটির কাছে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল। এখানে গোলাগুলির একপর্যায়ে তাদের একজন সেকেন্ড ল্যেফট্যানেন্ট গুলি খায়। ঐখানে তখন একটা হোটেল ছিল। হিরুর হোটেল। সে হোটেলে ঢুকে তারা বেয়োটেন চার্জ করে ৪ জন হোটেল বয়কে হত্যা করে। এই রেলঘুমটির হোটেলটাতেই একজনকে গুলি করে মারে। সেই ব্যক্তি তখন চকযাদুর রোডের গলি (যে গলি রেল ঘুমটির একটু সামনে) থেকে প্রতিরোধ করছিল। রেল ঘুমটি ক্রস করার সাহস পায়না পাকসেনারা। তখন তাদের সেনা সদস্যও কম ছিল ১৫০-২০০ পাকসেনা যুদ্ধ করছিল সেখানে। পাকসেনারা রেল ঘুমটি থেকে ফিরে। আমরা হাউজ ঘিরে রাখি। তারপর তারা ফিরে যায় কটন মিলের রেস্টহাউজে। সেখানে তারা অবস্থান নেয়। আমরা হাউজ ঘিরে ফেলি। ঘিরে ফেলার পরে সেখানে আমাদের সাথে তাদের ২দিন গুলি বিনিময় চলতে থাকে। তারা মর্টার শেলিং করে, গুলি করে, আমরাও গুলি করতে থাকি। এ সম্মুখযুদ্ধের পর পাকহানাদার আর শহর অভিমুখে ঢোকার সাহস করেনি। কটন মিল রেস্টহাউজ থেকেই তারা রংপুরের দিকে রওনা দেয় ২ দিন পরে। প্রায় ১৫ দিন বগুড়া মুক্ত ছিল। অন্য জেলায় শোনা যায়নি এমনটা। আমরা বগুড়া পনের দিনের জন্য মুক্ত রাখি। এরই মধ্যে বগুড়া শহরের তিন জায়গায় ক্যাম্প তৈরি করে ফেলি। করনেশন স্কুল ক্যাম্প, মালতী নগর ও সেন্ট্রাল স্কুল ক্যাম্প করি পনের দিনের মধ্যে। ক্যাম্পগুলোতে আমরা ট্রেনিং শুরু করি। সেখানে এক এক ক্যাম্পে প্রায় ২০০ জন ছেলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। ক্যাম্পে ট্রেনিংদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসারদের নিয়ে আমরা ট্রেনিং শুরু করি। ট্রেনিং ভালভাবেই শুরু করে। মর্টার শেল ও বম্বিং সহ এয়ার এ্যটাক হয়। প্লেন দিয়ে বম্বিং শুরু করল এবং দুপচাঁচিয়ার দিক থেকে, শেরপুর রোড থেকে, রংপুর রোড দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। আমরা প্রস্তুত না থাকায় প্রতিরোধ করতে পারলাম না তাদেরকে। এমন সময় ক্যাম্পগুলো থেকে আমাদের সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া হল নগরবাড়ির দিকে। ১৫০ জন E. P R. এবং আমরা প্রায় ১০০ মুক্তিযোদ্ধা গেলাম। ওখানে আমাদের ওপর হাই কমান্ডের নির্দেশ এলো হানাদার পাকসেনাদের প্রতিরোধ

করতে। তখন একজন E. P R. এর অফিসার ছিল, যাকে আমরা মামা বলে ডাকতাম। তিনি আমাদের দায়িত্বে ছিলেন। আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নিয়ে বগুড়ায় একটি হাইকমান্ড ছিল। হাই কমান্ডের নির্দেশে এবং E. P R. এর সেই মেজরের নেতৃত্বে আমরা ২ টা ট্রাক, ২টা জীপসহ রওনা দিলাম নগরবাড়ি ঘাটের দিকে। পাকহানাদারেরা গানবোট নিয়ে এলো। তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হল। আমাদের সাথে এসে যোগ দিল পাবনা জেলার মুক্তিযোদ্ধারা। সম্মুখযুদ্ধের সেই দিনগুলোয় আমরা মুক্তিসেনারা হানাদার পাকবাহিনীর সদস্যদের কাছে পরাজিত হই। ওখান থেকে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বাঘাবাড়ি ঘাটে চলে আসি। এখানে দু'দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। আমাদের ২ জন E. P. R. সদস্য মারা যায়। আমরা পিছু হটে আসি। কারণ পাকসেনারা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আমাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। আমাদের কাছে লাইট মেশিনগান, চাইনীজ রাইফেল ও থ্রিনট থ্রি রাইফেল ছিল। পাক হানাদার বাহিনীর একটা দল পাবনার দিকে চলে গেল। যেতে যেতে তারা চারপাশের ঘরবাড়ি জ্বালাতে জ্বালাতে ও লুটতরাজ করতে করতে লাগল। আরেকটা গ্রুপ আমাদের বগুড়ার দিকে এলো। ঐ দলটির সাথে বাঘাবাড়িতে আবার আমাদের সম্মুখযুদ্ধ শুরু হল। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে কুলোতে না পেরে ৮ জন ১০ জনের একটা করে দল করে বিচ্ছিন্নভাবে পায়ে হেটে বগুড়ায় চলে এলাম। গ্রামের পথ হেঁটে নদী পার হয়ে বাঘাবাড়ি ঘাট থেকে বগুড়ায় এসে দেখি পাক হানাদাররা বগুড়া শহর দখল করে নিয়েছে। বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিককার ঘটনা এমনই ছিল। বগুড়ায় ৩টি ক্যাম্পে ট্রেনিং পাওয়া ৬০০-৭০০ জন মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তীতে বগুড়া মুক্ত করায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। ১২ জনের একটি দলে আমরা হাট শেরপুর হয়ে ভারতে যেতে চাইলাম। পারলাম না, কারণ গিয়ে দেখি সেখানে পাক আর্মিরা ক্যাম্প করেছে। আমরা ফিরে আসি। আমরা পাঁচবিবি হয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে বাঘজানা বর্ডারে গেলাম। বাঘজানা বর্ডারে যাবার আগে একটা ঘটনা ঘটল। জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি এলাকাটা ছিল দালালদের এলাকা। আমরা যাচ্ছি। আমাদের দলের একাংশ ভারতে চলে গেছে। আমরা পেছনে রয়েছি। পায়ে হেঁটে চলছি। আমার সঙ্গে রয়েছে দুজন। তার মধ্যে একজন আমার বাবা মোশাররফ হোসেন মন্ডল। ন্যাপ সভাপতি ও হাইকমান্ডের সদস্য ছিলেন। বাঘজানা নদীর ওপারেই ভারতের বর্ডার নদী পার হব তখন দেখি আমাদের একজন পরিচিত রিকশাওয়ালা। সে আমাদের তার বাসায় দুপুরে খেয়ে যেতে বললেন। আমরা রাজী হয়ে তার বাসায় গেলাম। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলাম। যখন খেতে বসেছি। তখন দেখি বাইরে হট্টগোল চেচাঁমেচি। রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞস করলাম কিসের হৈ চৈ। সে জানাল দাললরা জেনে গেছে যে আপনারা আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তাই আপনাদের ধরতে আসছে। আমরা যে বাড়িতে গেলাম, রিক্সাওয়ালা আবার আমাদের অন্য বাড়িতে তুলেছে। সেই বাড়ির বাড়িওয়ালা একটা বড় চাকু নিয়ে বাঁশ চাঁছতে বসেছে ঘরের দরজায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়িটা ঘিরে ফেলল দালালেরা। বাড়িওয়ালা বলছে না তোমরা আমার ঢুকতে পারবে না। আমার বাড়ী থেকে ওরা বের হাবার পর যা হয় হোক কিন্তু আমার ঘরে বাড়িতে থাকতে কিছুতেই তোমাদের ঢুকতে দেবনা। ৪০/৫০ জন লোক আমাদের ঘিরে

রেখেছে। আমরা জানি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু। দালালদের মধ্য থেকে একজন স্কুল মাস্টার আমাদের দেখতে ঘরের ভিতর এলো। আমরা বাবাকে বললেন, মন্ডল সাহেব আপনাকে তো আমি চিনি। আপনি এখানে ধরা পড়ছেন, এটাতো একেবারে শেষ সময়। আমাদের পাঁচবিবি ক্যাম্পে তো এ খবর চলে গেছে। পাক আর্মির ক্যাম্প ছিল ওটা। আমাদের বললেন আপনারা বসেন দেখি কী করতে পারি। সেই স্কুল শিক্ষকটি কিছুক্ষণ পর ঘরের ভেতর এসে বলল কোথায় যাবেন? ভারতে যাবেন না বগুড়ায় ফিরে যাবেন। আমরা বললাম আমরা তো ভারতে যাবার জন্য বের হয়েছি। উনি বললেন ঠিক আছে, আমি ওপারে পার করে দিব আপনাদের। আমরা বললাম আপনি পারবেন কিনা ভাল করে বুঝে বলেন। সে বলল পারব। কোনো অসুবিধা হবে না। সে আমাদের নিয়ে ঐ বাড়ি থেকে বের হল। তার সঙ্গে থাকা ৩০/৪০ জন রাজাকাররের দলটি প্রায় কোয়ার্টার মাইল আমাদের পিছু পিছু এলো। তাদের হাতে চাকু ছিল। হৈ চৈ করছিল তারা। বারবার আমাদের এবং সেই স্কুল মাস্টারকে হুমকি দিচ্ছিল। আমরা বর্ডার পার হলাম। পরে শুনেছি আমরা চলে আসার আধ ঘন্টা পর ঐ বাড়িতে পাক হানাদার বাহিনী পৌছেছে। আমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলাম। আমরা পার হয়ে বালুঘাটে ক্যাম্পে ছিলাম। আমাদের ট্রেনিং শুরু হল। আসামের তেজপুরে। সেখানে আমাদের ২১ দিনের একটি ট্রিনিং ছিল। আমাদের পার্টির ধারণা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধটা দীর্ঘমেয়াদী হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা ট্রেনিং শেষ করে শিবগঞ্জ থানার ভেতর ঢুকলাম। প্রধান সড়ক আমরা কখনই ব্যবহার করতে পারিনি। গ্রামের ভেতর দিয়ে এসেছি। আমরা ২১ জন বগুড়ায় প্রবেশ করি। শিবগঞ্জে এসে আমাদের দলটি গাড়িদহ হাটে আসি। তখন মিত্র বাহিনীর সঙ্গে হানাদার পাকসেনাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জয়পুরহাট, হিলিসহ আশেপাশে এ যুদ্ধ চলছিল। হিলিতে পাকসেনাদের খুব মজবুত একটি বাংকার ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর এ বাংকারে অনেক নারীর মৃহদেহ ও কাপড়চোপড় পাওয়া গেছে। পাকসেনারা গাড়িসহ ঐ বাংকারে প্রবেশ করত। সেই বাংকারে অন্তত ৮/১০ টি গাড়ি ঢুকতে পারত একত্রে। হিলিতে পাকহানাদারেরা নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। হিলি বর্ডারের বাংলাদেশ সীমান্তে ছিল তাদের শক্তিশালী বাংকারটি। পাকসনোদের ঐ বাংকার থেকে বের করতে ফায়ার ব্রিগেডের হোস পাইপের মাধ্যমে গরম পানি হয়েছিল। শিবগঞ্জে যুদ্ধ চলছিল চরমভাবে। আমরা বগুড়া শহরে ঢুকে পড়েছিলাম। পাকিস্তানি দোসরদের ধরতে শুরু করেছি। যুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান আর্মি সীমান্তে ঢোকার আগে একটা বড় সড়ক যুদ্ধ হয় শিবগঞ্জে। হানাদার পাকসেনারা টের পায় তাদের বেগতিক অবস্থা। তখন কিন্তু অনেক পাকসেনা পালাতে শুরু করেছে। হানাদার পাকসেনাদের ১৪/১৫ জনের একটি দল কামদিয়া গ্রাম হয়ে গাড়িদহ হাটে ঢুকেছে। শিবগঞ্জে আমাদের সাথে তাদের গোলাগুলি আরম্ভ হল। সন্ধ্যা হবার একটু আগে যুদ্ধটা শুরু হয়। আমাদের সাথে গোলাগুলি হতে হতে পাকসেনাদের একজন সৈনিকের পায়ে গুলি লাগে। পাকসেনাদের মধ্যে যুদ্ধ না করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ফলে তারা পালাতে চাইছিল। আমরা জোরেশোরে আক্রমণ শুরু করলাম। পাক সেনারা পিছুহটে পালাতে শুরু করল। আহত পাকসেনাটা পালাচ্ছিল খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে। অন্য পাকসেনারা আহত পাকসেনাকে ফেলেই পালিয়ে গেলে। পাকসেনারা গ্রামের ভেতর ঢুকে গুজিয়া হাটের পথ ধরে চলে যাচ্ছিল। আহত পাকসেনাকে আমরা ঘিরে ফেললাম। তাকে বন্দী করলাম। দেখলাম বুকপকেটে তার মেয়ের ছবি। এক প্যাকেট সিগারেট, একটি আইডেন্টিটি কার্ড এবং গলায় তাবিজের মতো বাঁধা ছোট্ট একটা কোরআন শরীফ। আহত পাক সেনাটি কোনো কথা বলছিল না। শুধু তার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল কালেমা তাইয়্যাবা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা তাকে সন্ধ্যায় মারলাম স্ট্রাপ করে।

আমরা মুক্তিযোদ্ধারা মিত্র বাহিনীর সঙ্গে মহাস্থানগড়ে চলে এলাম। মহাস্থানে পাক আর্মির বাংকারটি ছিল ঠিক গড়ের ওপর। এখন মহাস্থানের যে জায়গাটায় মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। সেই জায়গার একদম ধার ঘেঁষেই বাংকারটি ছিল। মহাস্থান ব্রিজের পাশে যে খোলা জায়গা ছিল সেখানে আমরা ও মিত্রবাহিনীরা অবস্থান নিলাম। তখন দুই পক্ষের মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হল। প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হল। গোলার আঘাতে আমাদের দুজন গুর্খা সৈন্য নিহত হলেন। মিত্রবাহিনীর সেনারা ঐ দুই সৈন্যকে দাহ করল। তাদের নিয়মানুসারে গোলাগুলি চলছিলই। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠছিলাম না, কেননা তারা গড়ের ওপর থেকে যুদ্ধ করছিল। আমাদের মিত্রবাহিনী সেমেজ পাঠালো আমাদের অবস্থা জানিয়ে। কিছুক্ষণ পর ইন্ডিয়ান প্লেন এসে বোম্বিং শুরু করল। আকাশ পথে গোলাগুলিতে হানাদার পাকসেনাদের ২ জন নিহত হয়। এদের একজন অফিসার অন্যটি সদস্য। পাকসেনারা কাবু হয়ে পড়লেন। পাকসেনারা পিছু হটলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বাংকারটি দখল করে নেই। আমরা বাংকারের কাছাকাছি যখন তখন একজন পাকসেনা মাথার হেলমেট উচু করে আক্রমণে উদ্যত ছিল। সেই পাকসেনা কর্মকর্তার কপালে গুলি লেগেছিল। এরপর মিত্রবাহিনী ইন্ডিয়ান আর্মি এসে ক্যাম্প করল গোকুলে। গোকুল হাইস্কুলে, সেই ক্যাম্পে আমরা রাত্রিযাপন করলাম। এদিকে পলায়নরত পাকসেনারা এসে ঘাঁটি গড়ে তুলল মহিলা কলেজের এখানে। পরের দিন অনুমানিক সময় সকাল সাড়ে বারোটা একটার দিকে আমরা বগুড়া শহরে ঢুকে পড়লাম। বগুড়ায় ঢুকে প্রথমে মহিলা কলেজের ওখানে কিছু পাকসেনাদের সারেন্ডার করালাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া শহরে পাক সেনাদের প্রায় ৩টা অস্ত্রাগার ছিল। মহিলা কলেজ বগুড়া জেলাস্কুল ও আযিযুল হক কলেজে। তিনটাতেই তাদের গোলাবারুদ রাখার বড় ক্যাম্প ছিল। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মসমর্পনের ঘটনা ঘটে পার্কের ভেতর। (পৌরপার্ক পূর্বের নাম এডোয়ার্ড পার্ক) পাকসেনাদের বড় দলটি ছিল আযিযুল হক কলেজের সমনে। পাকসেনাদের সেখান থেকে পার্কে আনা হল। পার্কের মধ্য থেকে সাদা পতাকা উড়িয়ে তারা আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সে সময় ক্ষোভ ছিল পাকিস্তানী সেনা সদস্যদের প্রতি কিন্তু মিত্রবাহিনী তা রোধ করে এবং বগুড়া শহরে পাকসেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের পর শহরে কারফিউ জারি করা হয়। প্রায় ১০/১২ দিন পর পাকহানাদার বাহিনীকে ঢাকায় পাঠানো হয়। আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা তার দেশের মাটি, মা বোনের ইজ্জতের দামে পাকহানাদারদের হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। তবে বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আড়িয়া বাজার ক্যান্টনমেন্টে একজন

পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন সহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পন করেছিল এর মধ্যে ২১ জন পাঞ্জাবী সৈন্য ছিল। জনতার আক্রমণের হাত থেকে তাদের কেউ রক্ষা করতে পারেনি। উন্মুক্ত জনতা জেলাখানার তালা ভেঙ্গে তাদের দা-কুড়াল বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল।

বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ –

৩০ মার্চ বগুড়া প্রায় একমাস মুক্ত থাকার পর আক্রমণ করে পাকসেনারা। বগুড়া শহরের তিনদিক এবং আকাশপথে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে নিউমার্কেট ও রাজা বাজারের কিছু দোকান ধ্বংস হয়।

১৫ জুন ১৯৭১ পাকসেনারা পশ্চাদপসরণ করে রংপুরের দিকে যাওয়ার সময় বগুড়া কলেজের ছাত্রলীগ সভাপতি লতিফকে গোবিন্দগঞ্জে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রেখে নির্যাতন করে এবং অত্যাচারের এক পর্যায়ে গুলি করে হত্যা করে। লতিফ যুদ্ধের সময় নিজ বাড়িতেই অবস্থান করছিল। কিছু ঔষুধ আনার জন্য সে গোবিন্দগঞ্জ গিয়েছিল। থানার পুলিশ তাকে দেখতে পায় এবং পাকসেনাদের খবর দেওয়ায় তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়।

যুদ্ধ চলাকালীন বগুড়া শহরের বাদুড়তলা, চেলোপাড়া, সুতরাপুর ও পিটি স্কুলে লঙ্গরখানা খোলা হয়। এ লঙ্গরখানার সহযোগিতা ও দায়িত্বে ছিলেন ডা. জাহেদুর রহমান, ডা. কছির উদ্দিন, কমিশনার আমজাদ ও ময়েজ উদ্দিন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ময়েজউদ্দিন প্রতিদিন ২০০ টাকা ও ২ বস্তা আটা ও চল দিতেন। মতিউর রহমান ভাণ্ডারী কম্বল, সোয়েটার, টুপি ও টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন মুক্তিযোদ্দদের। চলাচল ও প্রশিক্ষণের জন্য ময়েজ উদ্দিন আহমেদ ১০,০০০ টাকার পেট্রোল ও ডিজেল জ্বালানী দিতেন।

এছাড়া ১৫ এপ্রিল আবার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে কাটাখালি ব্রিজ আংশিক ধ্বংস করে তারা।

৯ এপ্রিল কলকাতা বেতারের সূত্রে জানা যায় হানাদার পাকসেনারা আরিচা নদী পার হয়ে নগরবাড়ি ঘাটে জমায়েত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা নবেল, ওয়ালেস, টিপু, কিসলু সহ মোট ৭ জন নগরবাড়ি অভিমুখে রওনা হয়। এ সময় তাদের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ হয়। কয়েকজন E. P. R শহীদ হওয়ার পর মুক্তিসেনারা বগুড়ায় ফিরে আসে।

যুদ্ধ চারিদিকে

ধুনটের চারদিকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমি ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। দেশের এমন চরম অবস্থা দেখে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমি ভাবলাম আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা চান্দাইকোনা। এখানে ঘোঘা ব্রিজ নামে একটি ব্রিজ আছে। শুনতে পেলাম সেখানে ২৬ জনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমি তখন অসহায় বোধ করি। কাকে যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে বলব বুঝতে পারি না। আমি বাড়ি থেকে

পালিয়ে যাই একা একা। উদ্দেশ্য ভারতে ট্রেনিং নিতে যাব। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো নৌকায় চড়ে মাইনকার চর যাই। ওখানে ট্রেনিং নিতে পারি না। দেশে আবার চলে আসি। সাঘাটা নামক একটা জায়গা, সেখানে আসি। পরবর্তীতে পায়ে হেঁটে কাজীপুর। এরই মধ্যে একবার সারিয়াকান্দি দিয়ে ভারতে যেতে চেষ্টা করি। দেখি ১০ জনের দল করে এগিয়ে আসছে খানসেনা। আমাকে দেখে ওরা কিছু বলছিল না। শেষ দলটি আমাকে থামাল। আমি ভয়ে তাদের সালাম দিলাম। বলে তুম কাহা জায়েগা। আমি প্রথমে বুঝতে পারি না। আবার যখন জিজ্ঞেস করে আমি বলি ঘর। ওরা বলে ঘর কাঁহা হ্যায়। কাজী পুরমে। বলার পর আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি রুট পরিবর্তন করে জয়পুরহাট হয়ে মথুরাপুর ও গয়েশপুর বর্ডার হয়ে ভারতে পৌছলাম। ওখানের ট্রেনিং কমান্ডার ছিলেন আবু সাঈদ। তার ক্যাম্প মালঞ্চতে গিয়ে ভর্তি হলাম। ওখানে ৩/৪ দিন ছিলাম। পরে আমাদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে গেল দার্জিলিং। ২১ দিনের ট্রেনিং শেষে এলাম অপারেশন ক্যাম্প তরঙ্গপুর। আমাদের ৫০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতাও দেয়া হয়। আমাদের একটি দল মাইনকারচর হয়ে নৌকা যোগে চলে এলো কাজীপুর। কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ধুনটে শুরু হয় হানাদারদের লুটতরাজ, ধর্ষণ আর অত্যাচারে। এ সময় হিন্দুদের নিধন শুরু হয়। ধূনটের কুড়িহাটি গ্রামে একটা হিন্দুবাড়ি ছিল। সে বাড়ির সুরেন্দ্রনাথ দাশ ইউ পি সদস্য ছিল। খানসেনারা বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় তাদের।

যখন ভারত বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিল তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে তাদের যাবার পথ ছিল মথুরাপুর। হানাদারেরা পায়ে হেঁটে সিরাজগঞ্জ হয়ে ঢাকায় ক্লোজ হয়। আত্মসর্পণের পর খানসেনারা যখন পায়ে হেঁটে পালাচ্ছিল তখন সাধারণ জনতা তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এতে অনেকে মারাও যায়।

বগুড়া জেলার ধুনট থানা রাজাকার অধ্যুষিত এলাকা। এখানে রাজাকারদের একটি গ্রাম রয়েছে। সরু গ্রাম। এ গ্রামের রাজাকাররা সবাই ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এখানকার অনেক রাজাকারের মধ্যে একজন আহসান আলী মুন্সী। লাল মিয়া, চান মিয়া, খোকা মিয়া, আয়েজ এরা সবাই রাজাকার। যাদের সহযোগিতায় ধুনটে খান সেনারা হত্যাযজ্ঞ চালায়। ধুনটে এ সময় হত্যা ও ধর্ষণ চলে। তখন মধুপুর থেকে ধুনট থানায় ২ জন গ্রামের মেয়েকে ধরে আনে পাকসেনা ও রাজাকাররা। থানায় দুই দিন রেখে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি– পাকসেনারা যখন একটি গ্রামে ঢোকে তখন জাবেদ আলী স্ত্রীসহ অন্যান্যদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। জাবেদ আলীর স্ত্রী বাড়ির পিছনের আড়াঁ (জঙ্গল) দিয়ে পালিয়ে প্রায় নিরাপদ স্থানে পৌছেছিল। পাকসেনারা গ্রামের তিনদিক থেকে আক্রমণ করে একদিকে রাজাকাররা। ঐ স্ত্রী লোকটি রাজকারদের ভাগে পড়ে যায়। রাজাকারদের অনেক কাকুতি মিনতি করে ইজ্জত বাঁচানোর জন্য। কিন্তু রাজাকাররা তা না শুনে জবেদ আলীর স্ত্রীকে তুলে দেয় পাকসেনাদের হাতে। গ্রামের ২ জন রাজাকার এতে সহযোগিতা করে বেশি, তাদের নাম বলতে পারছি না। পাকসেনারা স্ত্রী লোকটিকে চ্যাংদোলা করে একটি বাড়ির বারান্দায় ফেলে বেশ কয়েকজন পাকসেনা ধর্ষণ করে। ভয়ে আতংকে ও

অতিরিক্ত ধর্ষণের ফলে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান অবস্থায় ৩ দিন পর মেয়েটি মারা যায়।

সাক্ষাৎকার মো. জালালুদ্দীন। মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক উপজেলা কমান্ডার ধুনট

মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলি

যুদ্ধের সময় আমি আজিজুল হক কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ২৬ মার্চ থেকেই বগুড়ায় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। পাকসেনারা যখন বগুড়ায় আক্রমণ করে তখন আমরা বগুড়ায় অবস্থান করছিলাম। বেশ কয়েক দিন একনাগাড়ে যুদ্ধ চলে। আমাদের বেশ ক'জন তাজা প্রাণ এ সময় শহীদ হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকি। খান সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। প্রায় মাসাধিক সময় বগুড়া শত্রুমুক্ত ছিল। মে মাসের শুরুতে খানসেনারা আবার বগুড়া আক্রমণ করে। শহরের তিন দিক এবং আকাশ পথে মোট চারদিক থেকে হানাদাররা আক্রমণ শুরু করে। আমরা এ সময়ে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়ি। পরবর্তীতে আমরা ভারতে যাবার উদ্দেশ্য ছড়িয়ে পড়ি। এ সময় আমি আমার বোনের বাড়ি ধুনটে অবস্থান করি। সুযোগ খুঁজতে থাকি ভারতে যাবার জন্য। জুন মাসে খান সেনারা ধুনটে প্রবেশ করে। খান সোনাদের ধুনটে প্রবেশের আগে ধুনট থানা লুট করে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রের জন্য। খানসেনারা যখন ধুনটে প্রবেশ করে তখন থেকেই ধুনটে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও লুটপাটসহ নানা অত্যাচার নির্যাতন চলত। এসময় পশ্চিম ভরণশাহী গ্রামের উত্তর পাশে জবেদ আলীর বাড়িতে প্রবেশ করে হানাদাররা। গ্রামে হানাদার প্রবেশ করেছে শুনে গ্রামের নারী পুরুষ দৌড়াতে থাকে ঘর বাড়ি ছেড়ে। জবেদ আলীর বউটিকে হানাদাররা ধরে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। তারপর গণধর্ষণ চলে। অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে গৃহবধুটি মারা যায়। ধুনটে যুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকারদের দৌরাত্ম ছিল অনেক বেশি। এখানে পুরো একটি গ্রামই আছে রাজাকারদের। ধুনটে অনেক লোককে রাজাকার হতে বাধ্য করা হয়। অনেকে আবার নিজের জানমাল বাচাঁনোর জন্য রাজাকার হয়ে নানা রকম অত্যাচার চালিয়েছে। পাকসেনাদের সহযোগিতা করা ছাড়াও ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকারে পরিণত করেছে নিরীহ মানুষদের। সাধারণ জনতাকে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হতো খান সেনাদের হাতে। ধুনটে যুদ্ধের সময় অনেকের সঙ্গে আমিও ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে চলে যাই। প্রশিক্ষণ শেষে এসে আবার যুদ্ধ করি। ধুনটে পরবর্তীতে হানাদার খানসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হতে থাকে। খান সেনারা বুঝে যায় বাঙ্গালিদের সঙ্গে তারা পারবে না। ২৬ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা খান সোনাদের প্রতিহত করতে ওদের ক্যাম্পের চারপাশ রেকি করে, কখনো ক্রল করে এগিয়ে তাদের গতিবিধি দেখে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা যখন আক্রমণ চালায় তখন খানসেনারা দুপুরের খাবারের আয়োজন করছিল। খিচুড়ী ও মুরগির মাংস রান্না করা ছিল। পরে খানসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। ওদের রান্না করা খাবারগুলো মুক্তিসেনারা নষ্ট করে ফেলে।

ধুনট মুক্ত হবার ২দিন আগে মাঝিড়ার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হানাদার পাকসেনাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। এতে বেশ কয়েকজন পাকসেনা নিহত হয়। ধুনটে যুদ্ধের সময় এলাঙ্গী ইউনিয়নের এলাঙ্গী বাজারসহ পুরো একটি গ্রামে বর্বরোচিত হামলা চালায় হানাদারেরা। দাঁড় করিয়ে একযোগে হত্যা করে অনেককে। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে ২৬ নভেম্বর ১৯৭১ ধুনট খানসেনামুক্ত হয়। রাজাকার আলবদররা পালিয়ে যায়। অনেক রাজাকার গ্রাম থেকে পালিয়ে যায়।' অনেককে মুক্তিযোদ্ধারা এ সময় হত্যাও করে।

মজুর উদ্দিন ছুতার নামের একজন রাজাকার ছিল ধুনটে। তার দুই ছেলে পলান ও ইব্রাহিমকে নিয়ে সে ধুনটের নিরীহ গ্রামবাসীদের আতংকের ভিতর রাখত। তাদের অত্যাচারে কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে পারতো না। এলাঙ্গীতে তাদের প্ররোচনায় পুরো একটি গ্রামকে ভস্মীভূত করা হয়। যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে এদের তিনজনকে মুক্তিযোদ্ধারা একটি গর্ত করে একই সঙ্গে মাটিচাপা দেয়। রাজাকারদের একজন আবদুল মজিদ তালুকদার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য এ যুদ্ধে আমার মত অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের প্রায় শেষদিকে ৪ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ের ডামাডোল বাজছিল এবং পাকসেনারা পিছু হটছিল তখন ধুনটের ২১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে হানাদারও রাজাকাররা। ঐ দিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয় এবং বাড়িতে বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন রাজাকারদের সহায়তায় ঘুমিয়ে পড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ২২ জনকে আটক করে। সারারাত নির্যাতনের পর ভোরবেলা ২১ জনকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে। ১ জন মুক্তিসেনা বেঁচে যান। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এখানকার মুক্তিযোদ্ধারা এভাবেই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হয়েছেন।

তথ্যসূত্র : এস, এম ইউসুক হারুন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ধুনট।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের কিছু ঘটনা

আমি বগুড়া শহরের চেলোপাড়ায় চাচা ডা. হাবিবুর রহমানের বাসায় থেকে সেন্ট্রাল স্কুলে লেখাপড়া করতাম। ১৯৭১ ইং সালে আমি ৯ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। তিন বৎসর মাদ্রাসায় পড়ার কারণে তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর।

১৯৭১ ইং সালে ৭ মার্চে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর হতে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলাম।

২৫ মার্চ রাত ১২টায় হৈ চৈ শুনে ঘুম থেকে উঠে শুনলাম রংপুর হতে বগুড়ায় পাকসেনারা রওয়ানা হয়েছে। আমরা রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড দেওয়ার কাজে লেগে গেলাম। সারারাত আর ঘুম হলো না। রাতেই সংবাদ পেলাম পাকসেনারা ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় ই.পি. আর হেড কোয়ার্টারসহ বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে বহু লোকজনকে হত্যা করেছে।

২৬ মার্চ সকালে শোনা গেল পাকসেনারা বগুড়া মহিলা কলেজে ও ওয়াপদা রেস্ট হাউজে অবস্থান নিয়েছে। আরও জানা গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তার বাসা

হতে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বগুড়ার যুবক ছেলেরা সংঘটিত হয়ে অস্ত্র নিয়ে পাকসেনাদের সঙ্গে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। আমরা কিছু ছেলে তাদের খাবার পৌঁছানোসহ সহযোগিতা করতে লাগলাম। পাকসেনারা এক পর্যায়ে শহরের মধ্য ঢোকার চেষ্টা করলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে বড়গোলায় স্টান্ডার্ড ব্যাংকের ছাদসহ রেলের পার্শ্বে মোমিনের হোটেলে দুই জনকে পাকসেনারা হত্যা করে। ঐ যুদ্ধে হিটলু, ছুনু, টিটু, আজাদ, হাবিলদার রহিম উদ্দিন ও বাদশা শহীদ হয়।

২৮ মার্চ পাকবাহিনীর ২টা জঙ্গি বিমান বগুড়া শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে বোমা নিক্ষেপ করে। ঐ দিন সন্ধ্যায় গাবতলী হতে কয়েক হাজার লোক মালেক সরকার ও পিন্টুর সঙ্গে লাটিসোটা নিয়ে বগুড়া শহরে প্রবেশ করে।

২৯ মার্চ-পাকসেনারা বগুড়া হতে আবার রংপুরে ফেরত যায়। পরে প্রতিরোধ যোদ্ধারা আড়িয়ার বাজার ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে। কিছু সময় যুদ্ধ হয়। ডা. টি. আহম্মদ সাহেবের ছেলে মাসুদ শহীদ হয়। তার পরেই পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে। কয়েক দিন পরে আমার চাচা দেওয়ান ডাক্তারের সঙ্গে আমি তার গ্রামের বাড়ি কাহালু থানার তালদিঘী গ্রামে যাই।

২য় বার যেদিন পাকসেনারা বগুড়া শহরে প্রবেশ করে তার পরের দিন আমরা ৬জন ভারতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই এবং গোপিনাথপুর হাটে রাত্রিযাপন করি। রাত ২টার দিকে শরণার্থীদের সঙ্গে হেঁটে ভারতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই। পরের দিন সন্ধ্যায় ভারতের কামার পাড়ায় বিক্রুটিং ক্যাম্পে যাই। ছাত্রলীগের সামাদ ভাই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

২৬ এপ্রিল কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি হলাম। পরে মেডিকেল করেন বগুড়ার ডা. ননী গোপাল। ক্যাম্প ইনচার্জ অধ্যাপক আবু সাইদ, তত্ত্বাবধানে ডা. জাহেদুর রহমান (এম.এন.এ)। প্রশিক্ষক শাকিল উদ্দিন, দবির উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন। আমাদেরকে প্রথম জাতীয় সঙ্গীত পড়ানোর সময় ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী উপস্থিত ছিলেন।

ঐ ক্যাম্পে ১৫/১৬ দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে ৩০৩ রাইফেল এস.এম.জি ও থার্টিসিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড বানানো শেখানো হয়।

উচ্চতর প্রশিক্ষণ হয় পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। ক্যাম্প ছিল রায়গঞ্জ শহরের পশ্চিমে ছোট নদীর পশ্চিম পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্য, ক্যাম্পের পশ্চিমে নিষিদ্ধ পল্লী, দক্ষিণে রেল লাইন উত্তরে পাকারাস্তা ছিল।

প্রথমে আমাদেরকে দিয়ে জঙ্গল কেটে তাবু টাংগানোর কাজ করিয়ে নিয়েছে। পরের দিনে আমাদের চুল কেটে সিলেটে নাম ও এফ.এফ.নম্বর লিখে ছবি তোলা হয়।

২৮ দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে রাইফেল, এস,এম, জি, এল, এম, জি, ২-৩ ইঞ্চি মর্টার ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড, এন্টি ট্যাংকে, এন্টিপারসোনাল মাইন, ববি ট্রাপ, একপ্লোসিৎ কাটিং ও প্রেসার চার্জ এম্বুশ ও ক্যামোফ্লাক ছিল। প্রশিক্ষক- মেজর ডোগরা অন্য কারো নাম মনে নাই। ক্যাম্প ইনচার্জ কর্নেল মুখার্জী ছিল।

আমাদের প্রাকটিকেল করানো হয় সেনাবাহিনীর লরিতে করে নিয়ে মালদহে আমবাগানের ভিতর।

রায়গঞ্জ ক্যাম্প হতে আমাদের বিদায় দিয়ে লরিতে করে আঙ্গিনাবাদ নিয়ে যাওয়া হয়। ৩দিন পর ৭নম্বর সেক্টরের হেড কোয়াটার তরঙ্গপুর নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের গ্রুপ করে দেওয়া হয়। গ্রুপ কমান্ডার করা হয় শাহ মোখলেছর রহমান দুলু কে। ১১ জনের গ্রুপের অন্যারা আমি, ডা. এম জহুরুল ইসলাম, আব্দুল হামিদ, আশরারুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক বয়েন, মোখলেছার রহমান, আব্দুল মানিক খান, ইসরাফিল হোসেন, ওমর ফারুক, আবু বককর ছিদ্দিক, আব্দুর রহিম। প্রত্যেকের নামে নামে অস্ত্র ইসু করা হয়। প্রথমে আমাদের হিলি বর্ডারে পাকসেনার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ করানো হয়।

পরে দেশের মধ্য প্রবেশের জন্য বলা হয় এবং টার্গেট দেওয়া হলো-বগুড়া জেলার সোনাতলা, গাবতলী, ধুনট, সারিয়াকান্দী থানা এবং গাইবান্ধার শাঘাটা থানা এলাকা। আমরা গ্রুপসহ ২দিন চেষ্টা করেও দেশে প্রবেশ করতে না পেরে কামারপাড়া ক্যাম্পে ফেরৎ যাই।

পরের দিন ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প হতে ১৭ জনের আর একটা গ্রুপ করে। বগুড়ার মিছবাহুল মিল্লাত নান্নাকে গ্রুপ কমান্ডার করে দিয়ে আমাদের সঙ্গে তাদের দেশে প্রবেশ করতে বলা হলো।

পরের দিন বৈকালে দুই গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধাদের আখ পরিবহনের গাড়িতে করে বর্ডারে পৌঁছে দিল। স্থানীয় মকবুল নামে এক লোকের গাইডে চিঙ্গিশপুর বর্ডার দিয়ে দেশের মধ্য প্রবেশ করি। মঙ্গলবাড়ি হাট হয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে এক নদীর সামনে যাই। ভেলা তৈরি করে অস্ত্রসহ আমরা পার হই নওগাঁর গবরচাপা গ্রামে সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একবাড়িতে সেল্টার নেওয়া হলো।

পরের দিন সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকে যেতে যেতে কোনো সেল্টার পাওয়ার আগেই ভোর হয়ে যাওয়ায় কিছু দূর গিয়ে সরাইল গ্রামে নান্না ভাইয়ের নানার বাড়িতে উঠলাম। সন্ধ্যার পর আবার হেঁটে হেঁটে দক্ষিণে যেতে যেতে দুপঁচাচিয়া থানার গোবিন্দপুর গ্রামে সাথী যোদ্ধা ইসরাফিলের খালার বাড়িতে সেল্টার নিলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে ক্ষেতলাল থানার মোসলেমগঞ্জ হাটের উপর দিয়ে গ্রামের উত্তর দিয়ে পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়ে শেষ রাতের দিকে ফাসিতলা গ্রামে এক বাড়িতে সেল্টার নিলাম। সেখান থেকে পরের রাতে রওয়ানা হয়ে মোকামতলার পূর্ব ধারে দুলুর গ্রুপ সোনাতলা এবং নান্নার গ্রুপ ধুনট থানা এলাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু নান্নার গ্রুপে কাহারও প্রশিক্ষণ না থাকায় দুলুর গ্রুপ হতে আমাকে নান্নার গ্রুপের সঙ্গে নেওয়া হলো। আমরা রওয়ানা হয়ে আখরকান্দা গ্রামে সাথী যোদ্ধা করিমের বাড়িতে সেল্টার নিলাম।

পরে রাতে আমরা নশকরিপাড়ায় ঝিনুদের বাড়িতে সেল্টার নিলাম। তার পরের দিন গাবতলী থানার আকন্দরপাড়ায় সেল্টার নিলাম। সেখান থেকে পাঁচ মাস পর আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর আমরা বালিয়াদিঘী স্কুলে সেল্টার নিলাম। ঐদিন

রাতে মালিয়ান ডাঙ্গার লয়া মিয়ার সংবাদে কালাইহাটা হাই স্কুলে সেল্টার নেওয়া হয়।

পরের দিন সকালে শোনা গেল গত রাত ১২-৩০মি. পাকসেনারা বালিয়াদিঘী স্কুলের চারিধার ঘিরে পজিশন নিয়ে রেখেছিল ভোরে আমাদের না পেয়ে গ্রামের লোকজনদের মারধোর করে চলে গিয়েছে।

আমরা কালাইহাটা হতে অপারেশনের জন্য গাবতলী থানার সোন্দাবাড়ী গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় কদ্দুছের বাড়িতে বসে রসদপত্র রেডি করে নিয়ে চানপাড়া পাকা ব্রিজে প্রেসার চার্জ এবং ঢনঢনিয়া রেলের ব্রিজে কাটিং চার্জ লাগিয়ে এক্সপ্লসিভের মাধ্যমে ধংস করে দিলাম। কয়েকদিন পর আমরা গ্রুপ সহ নৌকা যোগে ধুনট থানা আক্রমণের জন্য রওয়ানা দিলাম। লোকবল কম থাকায় ধুনট থানার তিন পার্শ্বে পজিশন নিলাম। রাত ৩-৩০মি. ফায়ারিং শুরু হলো। এক পর্যায়ে পাকসেনার গুলিতে আমি আহত হই। ভোরে পাকসেনারা আত্মসমর্পন করে। আমাকে পার্শ্বের গ্রামে (কলারপাড়া) আজাদদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে থাকা এম.বি, বি. এস, ডা. মতিয়ার রহমান আমার গুলিবিদ্ধ পা হতে গুলি বের করার জন্য অপারেশন করে। অসুস্থ্য থাকায় আমাকে প্রথমে নশিপুরের কলারবাড়িতে মমতাজের বাড়িতে পরে বাণীরপাড়ায় তারপর বালিয়াদিঘীতে ছালিমের বাড়িতে থাকতে হয়। ধুনট থানায় আমার আহত হওয়ার তারিখ ছিল ০২/০৮/১৯৭১ইং।

কয়েকদিন পর গ্রুপ কমান্ডার (বি, এস, এফ) মমতাজ উদ্দিন ও সাইদ আমাকে সঙ্গে করে কালাইহাটা ও বড়িয়া হতে নান্নার অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে।

পরে মমতাজ ভাইয়ের সঙ্গে গাবতলী থানার রামেশ্বরপুরে সেল্টার নিয়ে পোড়াপাড়া সুখানপুকুর, চলিতাবাড়ী, সোনাতলা ষ্টেশন, রামেশ্বরপুরের পূর্ব ধারে বিলের পার্শ্বে নেপালতলী ব্রিজের পার্শ্বে, হাট ফুলবাড়ী ও শিকাঞ্জের বাড়িয়া হাটের পশ্চিমে সৈয়দপুর ও বগুড়া সদরের পীরগাছাহাটে পাকসেনাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করি সফলতার সঙ্গে। পরে আমার গ্রামের বুলু রাজাকারকে বাড়ি থেকে ধরে দূর্গাহাটায় কাতলাহার বিলে মেরে ফেলে দেই।

আমার মূল গ্রুপ কমান্ডার শাহ মোখলেছুর রহমান দুলু এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি সে মহিমাগঞ্জের ব্রিজ, সোনাতলা রেলস্টেশন, সাঘাটা থানা, ভেলুরপাড়ায় পাকসেনাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করে সফলতা পেয়েছে। সে সুখানপুকুরের উত্তরে রেল লাইনে ব্যাটারি চার্জের মাধ্যমে ট্রেন অপারেশন কবলে এক সঙ্গে ১৫৬ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং ইঞ্জিনসহ বেশ কয়েকটি বগি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংশ হয়।

সর্বশেষে আমরা গ্রুপ কমান্ডার মমতাজ উদ্দিনের সঙ্গে রামেশ্বরপুরে বিচ্ছিন্ন হওয়া ১৫জন পাকসেনাকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণ করাই। পরে তাদের মেরে ফেলা হয়।

বগুড়া শহরে মিত্রবাহিনী প্রবেশ করার পর মমতাজ উদ্দিনের সঙ্গে গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, আবু ফিরোজ, আব্দুল করিম, হাফিজার রহমান, সাহেব আলী, আমান আলীসহ আমরা ফুলবাড়ীর ভিতর দিয়ে শিববাটী হয়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে একত্রে হয়ে পাকসেনাদের সহিত সম্মূখযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

পরের দিন পাকসেনারা মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ঐ দিন রাতে কাটনারপাড়ায় মোশারফ মণ্ডলের বাড়ির উত্তর ধারে এক বাড়িতে রাত্রি যাপন করি।

পরের দিন সকালে উঠে দেখলাম বগুড়া শহরে লুটপাট শুরু হয়েছে। বাধ্য হয়ে আমি আমার অস্ত্র (এল.এম. জি) সঙ্গে করে ফতেহ আলীর বিধসু ব্রিজের নিচে দিয়ে পার হয়ে হেঁটে হেঁটে গ্রামের বাড়ি গাবতলীর বাইগুনীতে গেলাম।

পরে অস্ত্র জমা দিয়ে লেখাপড়ায় ফিরে গেলাম।

[জহুরুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা, ওয়ার্ড নং- ২০ (বগুড়া পৌরসভা)]

ভেলুর পাড়ায় যুদ্ধের একদিন

১৯৭১ সালে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়তাম। ২৫ মার্চ ছাত্র জনতার একটি মিছিল বের হয়। ঐ দিন মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণ করার সময় পাকসেনারা মিছিলটিতে আক্রমণ চালায়। আমি তখন এস.এম হলে থাকতাম। অতিকষ্টে বগুড়ায় গ্রামের বাড়িতে এলাম। বগুড়া এসে আমি আমার কিছু বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব ৭ মার্চের ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। তাঁর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হই। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ৯ এপ্রিল আমরা ৫০ জন ছেলে ভারতে যাই। সেখানে কামারপাড়া রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পে রিক্রুট হই। কামারপাড়া ক্যাম্পে ৫০ জনের মধ্যে আমরা ২ জন ছেলে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হই। জাফলং এ আরও অনেক ছেলের মতো আমরা দুজন উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেই দেড় মাস। এর আগে কামারপাড়া প্রশিক্ষণ নেই ১৫ দিনের। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। আমাদের মতো আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা তখন বাংলাদেশে ঢোকে। আমাদের কমান্ডার ছিলেন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজউদ্দিন। আমি ছিলাম ডেপুটি কমান্ডার। মমতাজ ভাই'র দায়িত্ব ছিল গাবতলী থানা, আমার দায়িত্ব ছিল সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা। আমি যুদ্ধের সময়ে তারিখ বা মাসটা হয়তো সঠিকভাবে বলতে পারব না। অনেক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ করেছি। আমার দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নানা জায়গায় অপারেশন করেছি। আমার দলের কিছু মুক্তিযোদ্ধা সারিয়াকান্দি থানার পাশে একটা গ্রামে অবস্থান করছিল। আমি আমার গ্রামের বাড়ি পাকুলিয়া ইউনিয়নের ধোয়াতলা গ্রামে অবস্থান করছিলাম। আমার বাড়িটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়। ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়িতে থাকত সবসময়। আমি ভারত থেকে আসার পর আমার বাড়ির আত্মীয় স্বজনদের অর্থাৎ আমার আপন ভাই, চাচা, চাচাত ভাই-বোন ও বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের যুদ্ধের প্রাথমিক কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। তারা প্রত্যেকেই থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এম,এল,আর স্টেনগান, রিভালভার ও গ্রেনেড থ্রোয়িং জানত। গ্রামবাসির অনেককেই (যারা ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে যায়নি) প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে যুদ্ধ করেছি। একদিন একটা অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সারিয়াকান্দি থানা রেড করব। তার আগের দিন থেকেই টের পাচ্ছিলাম ভেলুরপাড়া রেলস্টেশনের আশেপাশে গোলাগুলি চলছে। সেখানে

যুদ্ধ হচ্ছে। ভেলুরপাড়া রেলস্টেশন আমার বাড়ি থেকে মাত্র আড়াই মাইল দূরে। আমি গেঞ্জি ও লুংগী পরা অবস্থায় ছিলাম। সকাল ৮ টায় আমার এক চাচাতো ভাই এসে আমাকে জানাল দুজন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশের একটি মাঠে বসে আছে। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গেলাম। আমি তাদের বললাম তোমরা এখানে বসে আছ কেন। তোমরা কোত্থেকে আসছো। তারা বলল ভেলুরপাড়া রেলস্টেশন থেকে। আমি তাদের বলি এখানে বসে আছ কেন 'শুনছ না ভেলুরপাড়া যুদ্ধ হচ্ছে', ওরা বলল আমরা ওখানে যুদ্ধ করে কুলিয়ে (টিকে থাকা) উঠতে পারছি না। আমি তৎক্ষনাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম আমি সারিয়াকান্দি থানা অপারেশনে যাব না। ওখানে যুদ্ধ করার জন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত আছে। আমি না গেলে খুব একটা সমস্যা হবে না। আমি আমার ছোট ভাই গেদা, চাচাতভাই লালমিয়া, পটু ও ভগ্নিপতি রাজাকে নিয়ে ভেলুরপাড়া রওনা হলাম। আমাদের ঘরের ৬ জন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভেলুরপাড়া যাচ্ছি। পথে দেখলাম মাঠের ছেলেগুলো। ওদের বলতেই ওরাও আমাদের সঙ্গি হলো। আমরা মাঠ ও বাঙালি নদী পার হয়ে সোনাকানিয়া গ্রামের ভেতর ঢুকলাম। আমরা যত এগুচ্ছিলাম ততই গোলাগুলির শব্দ জোরেসোরে শোনা যাচ্ছিল। দিনের বেলা আমরা চলেছি। হঠাৎ দেখি গুলিবিদ্ধ একজন লোককে আরেকজন লোক ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে। দুজনের শরীরই রক্তাক্ত। আহত লোকটির ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। যে লোকটা আহত মানুষটিকে বহন করছে সে আমাদেরকে দেখে একটু কটাক্ষ করে কথা বলছে– 'ব্যাটারাতো পারবে না মিছাই ভীমরুলের চাকে ঢিল মাইরে আমাদেরকে শুধু মাইরতেছে।' শুনে মনে খুব ক্ষোভ হলো, কষ্টও হলো। চিন্তা করলাম হয় আজ আমি মারা যাব নইলে একটা সাকসেসফুল অপারেশন করব। ভেলুরপাড়া রেলস্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে আছে চকচকিয়া ব্রিজ। ওখানে দু' তিন দিন আগে মুক্তিযোদ্ধারা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়েছিল ব্রিজটা। পরবর্তী সময় পাকসেনাবাহিনী ব্রিজের নিচে যে পাকা প্লাটর্ফম আছে ওখান থেকে গেঁথে নিয়েছিল। একবারে রেল লাইন পর্যন্ত মেরামত করে কাঠের স্লিপার দিয়ে। ট্রেন চালাচ্ছিল মেরামত করা রেল লাইনের ওপর। কয়েকজন পাঞ্জাবী ও রাজাকার রেল লাইন পাহারা দিচ্ছিল। আমরা যে গ্রামে পৌছুলাম সেটা চকচকিয়া ব্রিজ সোজা। ওখানে একটা বাড়িতে গিয়ে চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখলাম ব্রিজের দুইপাশে নয়নজুলি। প্রচণ্ড বন্যা তখন। পানি চারপাশে। পানিতে বুনো ধান গাছ। নয়নজুলির পূর্ব পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ওই বাড়িতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দেখলাম। একজন পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হলো। ভেলুরপাড়ার রাজা। ওরা ৫/৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ব্রিজ থেকে একটু দূরে চকচকিয়া ব্রিজের পাশে। ওদের বললাম ব্রিজের সামনে যাওয়ার কথা। ওরা জানাল ব্রিজের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। হানাদাররা বাংকারের মধ্য থেকে মানুষ দেখামাত্র গুলি ছুড়ছে। ওখানে যাওয়ার কোনও প্রোটেকশন নেই। চারদিক খোলা। দুই ধারে পানি। রেল লাইনের পাশে কোন গাছ গাছড়া নেই। একেবারে ফাঁকা ভূমি। আমি ওদের কাছে কিছু গোলাবারুদ চাইলাম এবং ব্রিজটার কাছে যেতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হলাম। আমার সঙ্গে ২ জন সঙ্গি ছিল ওদের নিয়ে রওনা হলাম। যাদের সাথে মাঠে দেখা হলো। ওরা পা জড়িয়ে ধরে বলল, আমাদের মাফ করে দেন আমরা যেতে পারব না।

আমরা ৬ জন রওনা হলাম। নয়নজুলিতে পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে রেল লাইনের ওপর উঠলাম। সেখান থেকে আধা কি.মি. উত্তরে রেলস্টেশন, কোয়াটার কি.মি দক্ষিণে চকচকিয়া ব্রিজ। আমরা দু জায়গার মাঝামাঝি রেল লাইনে দাঁড়ালাম। আমি আমার ভাই ও একজন চাচাতো ভাইকে নিয়ে একটি দল ও অন্য ৩ জনের দলটি জায়গা ভাগ করে নিলাম। আমার দলটি রেল লাইনের পশ্চিম দিকে যে স্লোপিং আছে সেখানে অবস্থান নিলাম। আমার ভগ্নিপতি রাজা তার দলটি নিয়ে পূর্বপাশের স্লোপিং এ অবস্থান নিল। সবাইকে পরামর্শ দিলাম ২ জন ক্রলিং করে আগালে ১০/১৫ হাত যাবার পর একজন তোমার হাতের অস্ত্র লোড করে নিবে। কোনো মাথা বা হেলমেট দেখলেই গুলি করবে। মাথা তোলার সুযোগ দিবে না। কিছুদুর এগিয়ে দুজন ক্রল করবে পিছনের জন অস্ত্র তাক করে থাকবে। ওদের মতো আমিও ক্রলিং করে এগুচ্ছি একেবারে বাংকারের কাছাকাছি চলে গেছি। ১০টা ১১টা হবে তখন। হানাদাররা যখনই বের হবার চেষ্টা করছে তখনই আমরা গুলি করছি। হঠাৎ করে লাফ দিয়ে একজন পাঞ্জাবী আর্মি লাইনের ওপর উঠে এল। বাংকারের ভেতর থেকে। আমার ছোট ভাই গেদা এবং আরেকজন ক্রলিং করে সমানে এগুচ্ছিল।

আমি নিয়মমতো রেডি পজিশনে ছিলাম। যেই পাঞ্জাবীটি জাম করেছে অমনি আমি গুরি করে দিলাম। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 'ইয়া আলী" বলে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর আমরা বাংকারের এত কাছে গেলাম যে আমরা আর এগোতে সাহস পাচ্ছি না। আমাদের কাছে গ্রেনেডও নেই। কোনও কিছু দেখাও যাচ্ছে না। গ্রেনেড থাকলে বাংকারের মধ্যে থ্রো করার চেষ্টা করতাম। চিন্তা করছি কী করব, এমন সময় বেলা ১২টা সাড়ে ১২টার দিকে দুটি লোক বলল আপনারা সরে যান। আপনাদের পেছন দিক থেকে অর্থাৎ স্টেশনের দিক থেকে হানাদার পাকসেনারা আপনাদের দিকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। আমি খুব বিপদে পড়ে গেলাম যে আমার সামনেও আর্মি পিছনেও আর্মি, ডান ধারে পানি বাম দিকে পানি। তখন আমি আমার সঙ্গিদের বললাম তোমরা ক্রলিং করে নয়নজুলি নদী ক্রল করে পার হয়ে যাও। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমরা যখন বাংকারে ফায়ারিং করছি তখন নয়নজুলি নদীর পাশে লোহাগড়া গ্রামের হাজার হাজার মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাদের এ যুদ্ধ দেখছে। ব্রিজের বেশ কিছু দূরে মুক্তিযোদ্ধার একটি দল 2.M.G দিয়ে ব্রাশফায়ার করছিল রেঞ্জের বাইরে থেকে। আমিও চিৎকার করে মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম তোমরা কভারিং ফায়ার দাও। যেন পাক বাহিনী মাথা বের করে গুলি করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ারিং শুরু করলে আমি বুনো ধানের ভেতর দিয়ে সাঁতরে লোহাগড়া গ্রামে গেলাম। পরে শোনা গেল পাকা বাহিনীর রেলস্টেশন থেকে এগিয়ে আমাদের আক্রমণ করার বিষয়টি ভুল খবর ছিল। পাকসেনারা ভেলুরপাড়া থেকে আসেনি। যুদ্ধ শেষে যে ৫/৬ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল লোহাগড়া গ্রামের তারাও আমাদের সঙ্গি হলো। আমি যখন জানতে পারলাম আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে তখন আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমার পাশে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম, আমি আবার যাব। তখন ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে লোহাগড়ার

গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে ব্রিজের দক্ষিণ দিকে রেল লাইনের ওপর উঠলাম। আমরা ক'জন বাংকার কে কেন্দ্র করে ক্রলিং করে এগুচ্ছি। যখন ৫০ গজের মধ্যে চলে এলাম আমরা, তখন পর্যন্ত পাকসেনাদের কাউকে দেখা গেল না। কোনও গোলাগুলিও নেই। ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার (ফাঁকা আওয়াজ) করলাম কিন্তু কোনও শব্দ এল না বাঙ্কার থেকে। ভয় লাগছিল, যদি বাংকার থেকে কোনও পাকসেনা লাফ দিয়ে বেরোয়। বাংকারের খুব কাছে গিয়ে আমি আমার সঙ্গিদের একজনের কাছে থাকা স্টেনগানটা নিয়ে আমার এস এল আরটা ওর হাতে দিলাম। স্টেনগানটা অটোমেটিক নব দিয়ে গুলি করতে করতে এগুচ্ছি। দেখলাম বাংকারের ওপর হেলমেট। আমার কাছে মনে হলো ঠিক বাংকারের ওপর একজন হেলমেট পরিহিত পাকসেনা দাঁড়িয়ে আছে। আমি হেলমেট লক্ষ করে গুলি করি। গুলি করার পর হেলমেটটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। মনে হলো বাংকারে কেউ নেই। ভয়ে ওরা পালিয়েছে। নিশ্চিত হয়ে আমরা সবাই ওখানে গেলাম। দেখি ওদের একটা ছাপড়া ঘর ছিল। ঘরের ভেতর তখন রান্না হচ্ছিল। দেখি স্টোভের ওপর সসপ্যানে রান্না বসানো। তখন বিকাল প্রায় সাড়ে ৪টা। আমার খুব আনন্দ লাগল। আমি আমার দলের ছেলেদের বললাম কেরোসিনের তেল নিয়ে আস। আমি রেল লাইনের কাঠের স্লিপারগুলো পুড়িয়ে দিব। ওরা কয়েক টিন কেরোসিন নিয়ে এল। আমি তা ঢেলে দিলাম কাঠের তক্তাগুলোর ওপর। আগুন জ্বালালাম। বাংকারে থাকা কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রি গ্রামের মানুষদের বিতরণ করে দিলাম।

তখন সন্ধ্যা। ইতিমধ্যে ভেলুরপাড়া রেল স্টেশনে যুদ্ধ চলছে। আমরা সেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রওনা হলাম। সারারাত সেখানে যুদ্ধ করলাম। জানতে পারলাম যে পাকসেনাদের (যে দলটি বাংকারে ছিল) সঙ্গে চকচকিয়া ব্রিজে যুদ্ধ করলাম তারা ভেলুরপাড়ায় অবস্থান নিয়েছে। এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জয় হয়। সেখানে একজন আহত পাকসেনাকে তারা ফেলে যায়। একজন বেলুচ সেনা নাম ছিল আলী আশরাফ। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে হত্যা করব। কিন্তু যেহেতু সে বেলুচিস্তানের ছিল তাই তাকে হত্যা করলাম না। কারণ আমরা জানতাম বেলুচ ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল। বেলুচিস্তান বাংলাদেশকে একটু সহযোগিতা করেছে যে কারণে একটু সিমপ্যাথি ছিল। ওকে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলাম। ভোরবেলা তাকে মাইনকার চর পাঠিয়ে দিলাম। তারপর তার কোনও খবর রাখিনি। আমার যে ভাইরা ও ভগ্নিপতি বিচ্ছিন্ন ছিল ব্রিজ আক্রমণের সময়, তখনও তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। পরে তাদের সন্ধান পাই। আমার বাড়িতে কিছু মুক্তিযোদ্ধা থাকত। তা আগেই বলেছি। দিপু নামের আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডর। তার দলের কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিল আমার বাড়িতে। জানতে পারলাম, গণকপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের পাকসেনারা ঘিরে ফেলেছে। আমরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই এবং সদলবলে আরেকটি সফল অপারেশনের জন্য সবাই এগিয়ে যাই সারিয়াকান্দির গণকপড়ার দিকে।

[সাক্ষৎকার : রেজাউল করিম মুন্টু। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বগুড়া সদর]

আমার দেখা '৭১

আমি যে সময় ঢাকায় লেখাপড়া করি সে সময় মার্চ '৭১। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেওয়া হয় রেসকোর্স ময়দানে। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। ঢাকায় এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বগুড়ায় যুদ্ধ শুরু হয়নি। তবে যুদ্ধের আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সুবাদে বাড়ি আসার পর বগুড়াতে যখন পাক আর্মিরা আক্রমণ করে তখন তারা রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ও বগুড়ার আড়িয়া বাজার ক্যান্টেনমেন্টে ছোট আকারেও আসে। বগুড়ার জনগণ সাহসী ভূমিকা রাখে। সারা শহর ঘেরাও করে রাখে। পাক আর্মিরা এলেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। যুদ্ধ চলে। এক সময় বগুড়াবাসি তাদের যুদ্ধকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পাকসেনাদের বগুড়া থেকে বিতাড়িত করে। এবং পাকসেনাদের বগুড়ায় প্রথমবার আক্রমণের পরে শান্তি কমিটি বগুড়ায় যখন গঠন করা আমাদের পরিবারের লোকেরা আমাকে বললেন তুমি যেহেতু ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, '৭০ এর নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করেছো এখন তোমার অসুবিধা হবে। তুমি চলে যাও। আমি ভারতে গেলাম। ভারতে থাকার পর ওখানে গঙ্গারামপুরে গিয়ে উঠলাম, আমার পরিচিত দিনাজপুরের কিছু লোকদের সাথে দেখা হয়ে গেল। আমরা একসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করেছি। আমরা সবাই মিলে গঙ্গারামপুর কংগ্রেস অফিসে থাকাতাম। কাজ করতাম। বাংলাদেশ থেকে যেসব শরণার্থি যেত এবং মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং-এর জন্যে যেত তাদের ক্যাম্পে অন্তর্ভূক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতাম। যখন বাংলাদেশে পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন, দিনাজপুরে আমার যে নেতা ও নেতৃবৃন্দ ছিলেন তারা আমাকে দেশে আসার কথা বললেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী যাচ্ছে তোমাদের এলাকা রেড করতে। তিনি M.P সাহেব ছিলেন। তিনি বললেন। তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি থাক এখানে। তোমার পরিবারের অধিকাংশ লোকই যখন ওখানে (বাংলাদেশে) রয়েছে সেহেতু তাদের নিরাপত্তার জন্য তোমার এখানেই অবস্থান যুক্তিযুক্ত। যুদ্ধ শেষের দিকে দেশ এখনও পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়নি। উড়ো উড়ো সংবাদ পেলাম যে আমাদের বাড়িতে একটা অপারেশন হয়েছে। সে সময় শুনে আমি বুঝতে পারিছিলাম না। সত্য মিথ্যার দ্বন্দে ছিলাম। চলছিল এভাবেই। পরবর্তিতে দেশ স্বাধীনের কিছু আগে আমার পরিবারের তিনজন, জেঠামশাই আমার ছোটভাই ও আর একজন বড়ভাই এদের সবাইকে হত্যা করা হয়। ভাগ্যক্রমে আমার বাবা বেঁচে যায়। আমাদের ঘরের ভিতরে একটি ঠাকুরঘর ছিল। পূজা আর্চনা হতো। পাকআর্মি যখন আমাদের বাড়িটি রেড করে তখন প্রায় ভোররাতে সবাই ঘুমিয়েছিল। আমার মা, বাবা ও একজন বোন-ওরা ভয়ে লুকিয়ে ছিল ঠাকুর ঘরে। পাক আর্মিরা ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে দেখে বলে- কেয়া বাত। বিছানা থা মাগার আদমী নেই। কোনো লোক না পেয়ে তারা ফিরে যায়। এখানে ঘটনা ঘটেছিল অন্য। পাক আর্মিরা যখন আমাদের দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে তখন ওখানে কিছু সাইকেল রাখা ছিল। ভাঙা দরজাটা গিয়ে সাইকেলের ওপর পড়ে। এবং সাইকেলগুলো ঠাকুর ঘরের দরজার ওপর। সুতরাং ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। একরূপে আমার মা, বাবা ও বোন বেঁচে যায় এভাবে। পিছনে যে ঠাকুর ঘর

পাক-আর্মিরা তা খেয়াল করেনি। আমার বাবা ড. ক্ষীতিশ চন্দ্র চৌধুরী। সে দিন আমার বাড়ির অন্যঘর থেকে আরেক জেঠামশাই ও ভাইকে ধরে নিয়ে যায় পাকসেনারা। দেশ স্বাধীনের পর এ ঘটনাগুলো এসে শুনলাম। আমার আত্মীয়দের বাড়ির কাছেই মাদলা ইউনিয়ন বোর্ডের কাছেই আমার ভাইদের হত্যা করা হয়। সেদিন আমাদের আশেপাশের গ্রাম থেকে আটক করা অন্যান্যদের ওখানে পিছনে হাত বেঁধে হত্যা করা হয়। আমার যে তিনটা জ্যেঠামশাই ছিল তাদেরসহ অন্যান্য শিক্ষিত বয়স্কদের ধরে নিয়ে যায় শহরে। এদের অনেকেই বগুড়া শহর থেকে এখানে এই মাদলায় এসে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সব মানুষগুলো নিরাপরাধ মানুষ ছিল। যেদিন মাদলা রেড হয় সেদিন আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদীর ওপর কোনো ব্রিজ ছিল না। সারাদিন নৌকা পারাপার চলত। সেই সময় মাদলা গ্রামবাসিরা পাক আর্মিদের ভয়ে খেয়া নৌকা এপার এনে রাখত। পাক আর্মিরা বগুড়া শহর থেকে নদীর পূর্ব-পশ্চিম পার হয়ে বহু পাক মিলিটারি ও বেজোড়া ঘাটের ওদিকে থেকে বেশকিছু সৈন্য এনে মাদলা ঘেরাও করে। গ্রামে যত পুরুষ মানুষ ছিল সবাইকে ওরা আটক করে। বাড়ির ছোট ছেলেরা রক্ষা পায়। আমার এক জ্যেঠাতো ভাই ছিল। তার বয়স ছিল ১২-১৩ বছর। আমরা তাদের আর খোঁজ পাইনি। লোকমুখে শোনা যায় আমাদের এখান থেকে যাদের নেয়া হয়েছিল তাদের বেজোড়া ঘাটের পশ্চিম পারে এদের সবাইকে মেরে পুতে রেখে চলে যায় প্রবীণদের। মাদলা ইউনিয়ন বোর্ডের সেই দিনের হত্যাযজ্ঞের স্তুপ থেকে আলৌকিকভাবে বেঁচে যায় কয়েকজন। তারা হলেন শশী, তার বুকে গুলি লেগে বুকের এফোঁড় ওফোড় হয়ে যায়। পুর্ণেন্দু সাহার ঘাড়ের ওপর দিয়ে গুলি চামড়া ছিড়ে চলে যায়। আর রুবাকীনী কর্মকারের (৬০) গুলিই লাগেনি। তিনি অক্ষতই ছিলেন। পাকসেনারা চলে যাওয়ার পর এত লাশ দেখে এরা ভীত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে। বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে অনেকে।

যেদিন মিলিটারি টিমের একদল আমাদের বাড়ি ঘেরাও ও অন্য দলগুলো গ্রামের অন্য বাড়িগুলো ঘেরাও করে। আমাদের প্রতিবেশি ও শহরের অন্যান্যদের জিজ্ঞেস করে "মুক্তি ক্যাহা হ্যায়।" পাকআর্মিদের হয়তো information দেওয়া হয়েছিল যে এখানে মুক্তিবাহিনী শেলটার নিয়েছে। প্রায় ৫০০ মুক্তি এখানে রয়েছে। আমাদের বাড়িসহ গ্রামের অন্যান্যদের জীবনে সেদিনের মর্মান্তিক পরিণতির কথাই বলছি। আমরা শুনতে পেলাম ঘোড়াপাড়া গ্রামের মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট সিরাজুল ইসলাম। তার শ্যালক কালাম বাবু ও জনু ওরফে জয়েন উদ্দিন ও নজমল এরা পাক আর্মিদের সাহায্য করে। রাস্তাঘাট ও হিন্দু এলাকাগুলো দেখিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় মাস খানেক আগে এ ঘটনাটা ঘটে।

সম্ভবত ৭ নভেম্বর আমাদের বাড়িতে আক্রমণ ও হত্যা এবং ৯ নভেম্বর আমাদের জ্যেঠামশাই, বাবাসহ এলাকার অন্যান্য বয়স্কদের বেজোড়া ঘাটের কাছে একটা খোলা জমিতে হত্যা করেছে। পাক সেনারা ২১জনকে ধরেছিল তাদের মধ্যে ১৪জনকে বোর্ডের সামনে এবং ৭ জনকে বেজোড়ায় হত্যা করেছে।

[সাক্ষাৎকার: দিলীপ চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা, মাদলা]

অমরনাথ চৌধুরী প্রত্যক্ষদর্শী

ফজরের আজানের পরপরই আমি দেখলাম মিলিটারিরা আমার বাড়ি ঘেরাও করেছে। আমি তখন বাড়ির ভেতরেই ছিলাম। আমার বাড়ির পিছনে একটা গাড়া (গর্ত) ছিল। তার ভেতরে আমি দৌড়ে গিয়ে নামলাম। শীতের দিন। ভয়ে বুক সমান পানিতে পানার ভেতর লুকিয়ে ছিলাম। আমার মাথার ওপর খুদি পানায় ঢাকা ছিল। আমার মতো আর দুইজন এভাবে লুকিয়ে ছিল। শৈলেন্দ্র ও ওয়াকিল আহমেদের ছেলে। প্রায় আধঘণ্টা চলে ধরপাকড় চলে। বাড়ীর সব ছেলেদের ধরে নিয়ে মাদলা ব্রিজের কাছে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। মিলিটারিরা যখন আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়, তখন মাদলার দিকে চলে গেলে আমি নিজ চোখে দূরে দাড়িয়ে এই হত্যাকাণ্ড দেখেছি। আমাদের বয়স্ক আত্মীয়সহ অন্যান্য বয়স্কদের মিলিটারিরা একটা গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। আমরা সহ আশেপাশের সব হিন্দুরা গৃহস্থপাড়া অর্থাৎ পাশের গ্রামের মুসলমান পাড়ায় দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি।

আমার যুদ্ধে যাওয়া

আমার কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেল। আমি তখন ২০–২২ বছরের যুবক। গাবতলী গ্রামের বাড়িতেই থাকি। কৃষিকাজ করি। একদিন গাবতলীর নারুয়ামালা হাটে গরু বিক্রি করতে যাই। তখন দুপুরে গনগনে রোদ। হঠাৎ চলন্ত ট্রেন থেকে গুলি ছোড়া হয় হাটের মানুষকে লক্ষ করে। তাকিয়ে দেখি ট্রেনভর্তি পাকআর্মি। আমার কানের পাশ দিয়ে শীষ্ দিয়ে একটি বুলেট মাটিতে পড়ে যায়। আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। প্রতিজ্ঞা করি এভাবে পড়ে পড়ে মার আর খাব না। পাকহানাদার বাহিনীকে এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। বাড়ি এসে প্রতিবেশিদের, নিজের বাড়ির ভাগি–শরীকদের পাকহানাদার বাহিনীর বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অবহিত করলাম। আমার যুদ্ধে যাবার কথা শুনে অনেকেই যুদ্ধে যেতে আগ্রহি হয়। বলে, লন বাহে, হামরাও দেশের লাগি যুদ্ধ করবার যামু। আমার সঙ্গে আমার চাচাতো ২ ভাই, একজন ভগ্নিপতি আর গ্রামবাসী ২ জন যেতে রাজী হলেন। আমি তাদেরসহ আর ২৫–২৬ জনের একটি দলের সঙ্গে ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে চলে যাই। ভারতের মরণটিলা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে সারিয়াকান্দি হয়ে ফিরে আসি উত্তর-পূর্ব বগুড়ায়। প্রথমদিনেই ভেলুরপাড়া রেলস্টশনের আমাদের দলের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ হয় পাকসেনাদের। ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা লড়ে যাই হানাদার পাকসেনাদের সাথে। এভাবে আমরা লড়াই করতে থাকি দেশকে হানাদারমুক্ত করার জন্য। পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি। শেরপুর থেকে পায়ে হেঁটে ঠাকুরপাড়া গ্রামে এলাম। শুনলাম খানসেনারা এদিকটায় হামলা চালিয়েছে। লুটপাট চলছে। অস্ত্র নিয়ে আমরা এগুলাম সেদিকে।

রোজার ঈদ। বাড়িতে এসেছি যুদ্ধের এক ফাঁকে। গ্রামে ঘরের মধ্যে বসে আছি। এলাকার কিছু আত্মীয় এল। বলল তোমরা ঈদের নামাজ পড়ো না। খানেরা এদিকে ঈদের নামাজ পড়তে আসবেই। তোমরা পালিয়ে যাও। গ্রামে মুক্তি আছে জানলে গ্রাম

পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে। আমরা কয়েকজন ঘরে লুকিয়ে থাকলাম। বেলা একটার দিকে আমরা বের হলাম। আকন্দ পাড়া, নতুন পাড়াসহ আমার আশেপাশের গ্রামে পাক সেনারা আগুন জ্বালিয়ে দিল। গ্রামবাসিরা আমাদের নিয়ে আতঙ্কিত ছিল। গ্রামবাসিদের সাহস দিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ স্বাধীন হবে। ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করে নি। আমরা সিন্‌টার (পাটখড়ি) মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে পুটুলী মতো বেঁধে এবং লাকড়ির ভেতর অস্ত্র নিয়ে লাকিড় বিক্রেতা বেশে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পাক আর্মিরা রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে ওদের সামনে দিয়ে পার হয়ে এলাম। খড়ির মধ্যে গ্রেনেড, মাইনও পার করছিলাম। ওরা টের পেলে ফাটাতাম। হাতে কোদাল, মাথায় গামছা। তার ওপর ঝাকি (টুকরি)। ছেঁড়া কাপড়। খানসেনারা আমাদের নিরীহ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ ভেবেছিল হয়তো।

একদিন আমরা কয়েকজন ঠাকুরপাড়া থেকে ট্রেনে দিঘলকান্দি পৌঁছি। আমাদের অপারেশন টার্গেট ছিল শিবগঞ্জ। পায়ে হেঁটে আমরা যখন দিঘলকান্দি পৌঁছি। তখন রাত ৯টা। ওখানে বাসেদ নামে একজন পীরবংশের লোক ছিলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন নানাভাবে। আমাদের দলটি তার বাড়িতে উঠল। ওখানে আরও ৩জন মুক্তিযোদ্ধা আগে থেকেই অবস্থান করছিল। আমরা খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় শোনা গেল রাজাকার ও খানেরা আমাদের থাকার জায়গাটি ঘিরে ফেলেছে। আমরা কোনো রকমে দৌড়ে পালালাম। খাবার ওভাবেই পড়ে রইল। দৌড়ে পাশের ঝোপ ঝাড়ে লুকিয়ে ছিলাম।

শুনলাম ভেলুরপাড়ার টুকু সরদারের বাড়িতে ২৫টি মুক্তিযোদ্ধার দল এসেছে। ওখানে মিটিং হবে। আমরা সেখানে সবাই উপস্থিত হলাম। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল অপারেশন চালানো হবে গাবতলীর চারপাশে। আমাদের ২১ জনের দল ২ ভাগে ভাগ হয়ে একদল গেল বাজারে। অন্যদল ভেলুরপাড়া ছেড়ে অদূরে বাঁশ ঝাড়ের কাছে। ওখানে আমরা একটি বাংকার করি। যুদ্ধ শুরু করি আমরা। ফায়ার শুরু হতেই পাল্টা গুলি চলতে থাকে। চারিদিকে হামলা শুরু হলো। সারারাত এ যুদ্ধ চলেছিল। ফজরের আযানের পর কিছু সময় গোলাগুলি কমল। আমরা বাংকারে থেকেই গুলি চালাচ্ছিলাম। বগুড়া থেকে একটা রেলগাড়ি রেললাইনে বাড়ালো। আমাদের দিকে লক্ষ্য করে রেলের কামরার ভেতর থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। দুপক্ষের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের একটা গুলি এসে লাগল আমার এক সহযোদ্ধার বুকে। সে লুটিয়ে পড়ল। আমরা পিছু হটতে লাগলাম। সে বন্ধুটির নাম ছিল আব্দুর রহিম। বাড়ি ঠাকুরপাড়া। আবার পাল্টাপাল্টি গোলাগুলি আরম্ভ হলো। সকাল থেকে প্রায় দুপুর বারোটা পর্যন্ত চললো। এ সময় আমাদের সহযোগিতা করেছিল গ্রামের জনগণ। আমরা বুদ্ধি করে গ্রামবাসীদের বললাম বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে তোমরা একবার বাঁশটাকে সামনে আনবে আর একবার পিছনে। শত্রুরা যেন ভাবে আমরা দলে ভারী। অনেক লোক। শব্দছাড়া গ্রামবাসীরা আমাদের এভাবে সাহায্য করেছিল। দুপুরের দিকে যোহরের আযানের পর ওদের গোলাগুলির চাপ কমে এল। আমাদের দলটি ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে চকচকিয়া ব্রিজের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ব্রিজের ওপাশ

থেকে পাল্টাগুলি আসতে লাগল। আমরা ক্রলিং করে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ শুনি কারা যেন বললে ভাই সারেন্ডার। তাকিয়ে দেখি একটি লোক বাংকারের ভেতর থেকে বলছে। আমি ওকে দেখে বললাম আমাকে একটা গুলি দাও। ও কি বুঝল কে জানে। আমার কথা শুনে জোরে দৌড় দিল। আসলে লোকটি ছিল আলবদর। আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার L. M. G থেকে ১১৮ রাউণ্ড গুলি সত্যই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার বন্ধু যোদ্ধা লোকটিকে গুলি করে হত্যা করে তখন। এদিকে আলবদরদের অন্যরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসল। আমি একা পড়ে গেলাম। আত্মরক্ষার জন্য লাফ দিয়ে নামলাম রেললাইনের পাশে। গ্রেনেড রেডি করে রাখলাম। ভাবলাম ৫০ গজ দূরে থাকতেই আমি বাঁচার জন্য গ্রেনেড ছুঁড়ে মারব। ওদের দলটি আমার দিকে না এসে উল্টেদিকে কলেজ স্টেশনের দিকে দৌড় মারল। দেখি পাক আর্মিরা কেউ রেলের কামরায় নাই। সবাই বিলের ধার দিয়ে পশ্চিমদিকে পালাচ্ছে। আমরা তখন সবাই একত্রিত হতে থাকলাম। গাবতলী থেকে সোনাতলা পর্যন্ত রেল লাইন এদিক ওদিক উড়িয়ে দিলাম। রেল চলাচল অযোগ্য হয়ে পড়ল। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। গ্রামবাসিদের ২ জন আমাকে ধরে নিয়ে গেল সোনাকান্দি। রাত প্রায় ১০-১১টার দিকে আমার দলের কাছে গ্রামবাসিরা পৌঁছে দিল।

পরের দিন সকালে চৌকিঘাট চণ্ডীহারার দিকে আমাদের দলটি এগুলো। আমরা উজগ্রামে হাটের ওপর গেলাম। মোকামতলা যখন পার হচ্ছি তখন খবর এল খানেদের ছয়টা খাবার ভর্তি ট্রাক শহরের দিকে রওনা দিচ্ছে। যাবার প্রস্তুতি চলছে। আমরা ট্রাকগুলোর কাছে গেলাম। দেখলাম বিহারী। বাঙালি ও রাজাকার এরা। ওদের খাবার ট্রাক আমরা লুট করলাম। ট্রাকগুলো পড়ে থাকল। ওদের ছয় চালকসহ মোট ৭জনকে আমরা পেলাম। দলনেতা বলল ৭ রাজাকারকে ৭ মুক্তিযোদ্ধা ভাগ করে নিয়ে তাদের ওপর অপারেশন চালাবে। এটাই দেশদ্রোহীর শাস্তি। আমার ভাগে যে রাজাকারটি পড়ল তার মুখে কোনো কথা নেই। আমাদের দলটি উজ গ্রামের পাঠান পাড়া বড় মসজিদের পেছনে একটি পুষ্কুরিনীর কাছে। ওখানেই রাজাকারদের অপারেশনের জায়গা নির্বাচিত হলো। আমার দলের ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা ওদের ছয় রাজাকারকে পুকুর পাড়ে নিয়ে গিয়ে মেশিনগান দিয়ে হত্যা করে। মেশিনগানের গুলির শব্দে চানপাড়া ও কাটাখালি থেকে শেল-মর্টারের গুলি ভেসে আসতে থাকে। আমরাই আমাদের বিপদ ডেকে আনলাম। ভীষণ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। রাজাকারটিকে নিয়েই আমি যুদ্ধ করতে লাগলাম। যুদ্ধ শেষ হলো। আমরা পাঠান পাড়া হয়ে গাবতলীর দিকে চললাম। আমার দলের রাজাকারকে নিয়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

আমার ভাগের রাজাকারটির নাম ছিল ইয়াসিন। ওর বাড়ি পাবনা সদরে। ও মূলত গাড়ির ড্রাইভার ছিল। তার নিজস্ব গাড়ি নিয়ে সে বাড়ির দিকে ফিরছিল পথিমধ্যে খান সেনারা ওকে গাড়িতে করে পাকসেনাদের খাবার সরবরাহ করতে বাধ্য করে ইয়াসিনের তখন বয়স ছিল প্রায় ৪৫–৫০ বছর। সে আমাকে বলল, তুই হামার ছোলের মত। হামার ছোলওক কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে পাঠাছি মুক্তিযোদ্ধা হবার লাগি। ওই পাক আর্মিরা হামাক জোর করে ধরে হামার ট্রাকেও মাল তুলে দিছে। তুই হামাক বাঁচা আমি বাঙালি।'

ওর কাকুতি মিনতি শুনে আমার দয়া হলো। আমার দলের অন্য মুক্তিযোদ্ধারা ওকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। আমি ওদের এই বৃদ্ধ লোকটিকে বাঁচাতে বললাম। একসময় ইয়াসীন আমাদের ক্যাম্পের নানা ধরনের ফুট ফরমায়েশ খাটত। ওর প্রতি আমাদের সবার মায়া জন্মে যায়। লোকটিকে এক সময় আমরা ছেড়ে দেই। ও জীবন বেঁচে যায়।

[সাক্ষাৎকার মোসলেম উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা।]

বাল্যযুদ্ধ – মোজাম্মেল হক

মুক্তিযুদ্ধ চলছে, শেষের দিকে রাজাকারদের উড়ো চিঠি দেওয়া হচ্ছিল। পাশের বাড়ির দালালদের উৎপাতে আমার মনটা খুব বিক্ষুব্ধ থাকত। তারা আমার দুই চাচাকে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার অপরাধে পাকসেনাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এমনি পরিস্থিতির মধ্যে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমার বয়স তখন দশ বছর, বঙ্গবন্ধু লিখতে অসুবিধা হচ্ছিল। অন্যদিকে বিষয়টা কাউকে বলাও যাচ্ছিল না। সংগত কারণে সাহায্য নেওয়া যাবে না, তবুও বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হয়ে রাজাকারদের উদ্দেশ্য করে একটা উড়ো চিঠি লিখলাম। যার বিষয়বস্তু ছিল, আমরা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক। রাজাকার তোমরা যেখানেই যাও, আমাদের হাত হতে তোমাদের নিস্তার নেই। সন্ধ্যার পর চিঠিটা কম্পমান হৃদয়ে রাজাকারদের বাড়ির দেয়ালে লাগিয়ে দিলাম। ভোরের দিকে চিঠি লাগানোর স্থানে রাজাকারদের আনাগোনা চোখে পড়ল। তারা ভয়ে চুপসে গিয়েছিল। ওদের বাড়াবাড়ি বন্ধ হয়েছিল। পাড়ার লোকজন স্বস্তি পেল। চিঠিটার জন্য কাউকে কাউকে দোষারোপ করল। এমনি করে এক সময় ওদের দিন ফুরিয়ে এল।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ওই রাজাকাররা ভয়ে আতংকে আত্মগোপন করল। এক সময় ওদের অনুনয়-বিনয় ও অনুশোচনা দেখে ওদের জীবন বাঁচাতে চাচাই বেশি সাহায্য করল।

কিন্তু আজ ওদের অনেক শাখা-প্রশাখা দেখে মনে হয় যদি যুদ্ধটা আবার ফিরে আসত। তবে রাজাকারমুক্তি আরেকটি বিজয় ফিরিয়ে দিতাম, নতুন প্রজন্মের হাতে। তারা দৃঢ় হস্তে সে বিজয় সমুনত রাখত। ধর্মীয় প্রতারণা থেকে এদেশের মানুষ মুক্তি পেত। তাহলেই হয়ত আমার বাল্যযুদ্ধ সার্থক হতো।

মকবুল হোসেন মুক্তিযোদ্ধা (বিহার। শিবগঞ্জ)

বিজয়ের পতাকা প্রথম ওড়াই আমি

১৯৭১ সালের ২৫মার্চ রাতে যখন সারাদেশে ক্রাকডাউন হয় তখন আমরা দেশকে বাঁচাতে উদ্বুদ্ধ হই। ২৬ মার্চ বগুড়ায় আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলি পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে যুদ্ধকৌশল ও পারদর্শিতার জন্য ভারতে ট্রেনিংয়ে যাই। ট্রেনিং শেষে দেশে আসি। আমি যেদিন দেশে এসে বগুড়ায় আমার বাড়িতে আশ্রয় নেই সেদিন সকালে বগুড়া থেকে কুখ্যাত মুমিন হাজী ও দুই গাড়ি পাকআর্মি এসে আমাদের পুরো বাড়ি ঘেরাও করে। আমার খোঁজ করা হয়। আমি তখন বাড়ির বাইরে ছিলাম। আমাকে ধরতে না পেরে আমার বাড়িসহ আশেপাশের সব বাড়ির মেঝে ৬ ফুট করে গর্ত খুঁড়ে

তল্লাশী চালায়। মেঝেগুলো মাটির ছিল। তাদের ধারণা ছিল বাড়ির মেঝেতে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা আছে। কিন্তু কিছুই না পেয়ে পাকআর্মিরা গ্রামের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পরবর্তিতে আমি আমার গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার কমান্ডার চুন্নু ভাই ও তার সহ-কমান্ডার জিন্নাহসহ আরও অনেকে নন্দীগ্রামসহ নানা জায়গায় পাক আর্মিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। নন্দীগ্রামের বিজড় হাসপাতালের পশ্চিম দিকে প্রথম আমরা পাক আর্মিদের ওপর আক্রমণ চালাই। নন্দীগ্রামের আশেপাশে ভাদ্র মাসের গরমের তীব্রতা উপেক্ষা করে আমরা প্রায় ১৫ দিন সেখানে অবস্থান নেই। এরপর তালোড়ার দিকে আমাদের দলটি এগুতে থাকে। ডেগরা নামের একটা হিন্দুপাড়া ছিল ওখানে। আমরা সেখানে প্রায় ২০/২২ দিন অবস্থান নেই। ওখানে থাকাকালীন নন্দীগ্রাম, শিবগঞ্জ, দুপঁচাচিয়া ও কাহালু থানার সব ছেলেরা একত্র হই। দুপঁচাচিয়ার পশ্চিমে আমাদের মিলন ঘটে। পরিকল্পনামাফিক আমরা বিভিন্নভাবে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ি। রমজান মাসের শেষ। ঈদুল ফিতরের আগে অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথমদিকে আমরা শিবগঞ্জে আক্রমণ চালাই পাক আর্মিদের শিবিরে। শিবগঞ্জ থানায় ঢোকার পর যার যার এলাকা ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধারা ভাগ হয়ে যায়। আমাদের দলটি মাঝিরহাট ইউনিয়নের নলডুবি গ্রামে। মাঝিরহাটের পূর্বদিকে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের গতিবিধি লক্ষ করি। পরে নামুজা, চাদমুহা হাট হয়ে গোকুল ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থান নেই। ওখানে থাকাকালীন আমাদের ওপর হাই কমান্ডের নির্দেশ আসে পতাকা উত্তোলনের জন্য। আমি ও আমার দুই সহযোদ্ধা মো. হামিদ হোসেন ও তোতামিয়া আমরা মহাস্থান মাজারে পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব পাই। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে আমরা মহাস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী আয়েজ মেম্বর নামে একজন লোকের নিকট যাই। আমাদের Information দেয়া ছিল ওখানে গেলে আমাদের পতাকা দেওয়া হবে। পতাকা তৈরিই করা ছিল। আমরা কমান্ডারের কথা মতো তার কাছে গেলাম এবং পতাকা নিলাম। আমাদের জানানো হল আমরা মাগরিবের নামাজের আজানের সময়টা পাব। অর্থাৎ যখন আযান হবে 'আল্লাহ্ আকবার' বলবে তখনই মাজারের সমস্ত বাতি নিভে যাবে। আমরা ৫–৭ মিনিট সময় পাব। এবং এর মধ্যেই আমাদের পতাকাটা উত্তোলন করতে হবে। এবং প্লাকার্ড লাগাতে হবে। আমি দৌড়ে গিয়ে কমান্ডের নির্দেশ মতো পতাকাটি উত্তোলন করি। ওদিকে আমার দুই সহযোদ্ধা আমার দু'পাশে স্টেনগান নিয়ে পাহারা দেয়। আমরা দ্রুত কাজ শেষ করে মাজারের পশ্চিমদিকে রওনা হই। আমরা চলে যাবার পরপরই মাজারের ২ দিক থেকে পাক আর্মিরা এসেপড়ে। নিরীহ মানুষদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং বলতে থাকে পতাকাটা কিভাবে তোলা হলো। এবং কারা এ পতাকা উড্ডয়ন করেছে। আমরা দেখলাম এত অত্যাচারেও কেউ মুখ খুলল না। এ ব্যাপারে একটি কথাও উচ্চারিত হলো না। আমরা সেদিন আমাদের ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

ওখান থেকে দেশ স্বাধীন হবার এক সপ্তাহ আগে আমরা শিবগঞ্জ থানার বিহার হাট গ্রামে আশ্রয় নেই। শুনতে পাই এখানে পাক আর্মি রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৪ দিন

আগে বিহারহাটের দক্ষিণ পাশে যে ব্রিজ আছে সেখানে আমরা অবস্থান নিলাম। একজন গাইড এসে জানাল ৫–৭ জন আর্মি Back করে শহরের দিকে যাচ্ছে। আমাদের কমান্ডার আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন অপারেশনের জন্য। আমরা ২টা মেশিন গান, এবং কয়েকটা এস.এল.আর ও খি-নট থ্রি রাইফেল নিয়ে ব্রিজের পাশে অবস্থান নিয়েছি। এমন সময় আরেকজন এসে জানাল পাক আর্মিরা সংখ্যায় কম নয় প্রায় ৫০/৬০ জন। কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। কারণ আমরাও ২০/২২ জন ছিলাম। আমাদের জনবলও ভালো ছিল। আমরা প্রস্তুতি শেষ করেছি তখন শোনা গেল পাক আর্মিরা প্রায় ৭০০/৮০০ জন। ওদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রপাতি। অটোমেটিক মেশিনগান ছিল, মর্টার শেল ও রকেট লানসার ছিল। তখন আমরা ঘাবড়ে গেলাম। দেখলাম সামনে বিপদ। কি করা যায়। আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের বাঁচার কোনো পথ নাই। আমরা তখন ব্রিজের পাশে ২২ জনই দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম পাক আর্মিরা এগিয়ে আসছে। ওরা এসে আমাদের জিজ্ঞেস করল 'তুমলোগ কিঁউ লোগ হ্যায়'। আমরা বললাম আমরা রাজাকার। ব্রিজ পাহারা দিচ্ছি। পাক আর্মিরা তখন জানতে চাইল 'টাউন কী ধার হ্যায়।' আমরা হাত ইশারায় দেখালাম এবং বললাম টাউন ইধার হ্যায়। ওরা আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। কিছু দূর যাবার পর আমরা ওদের পিছু নিলাম আক্রমণের জন্য। আক্রমণ করলাম। পাক আর্মিরাও আমাদের দিকে গুলি ছুড়ে মারল। শুরু হলো যুদ্ধ। আমরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারছিলাম না। পিছু হটলাম।

দেশ স্বাধীন হবার ২ দিন আগে শিবগঞ্জের বিহার ইউনিয়নের পূর্বদিক দিয়ে ২ জন পাক আর্মি পালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা কয়েকজন তাদের ধাওয়া করি। তাড়া খেয়ে আর্মি দুটি গোকুল ইউনিয়নের পাঁচপীর নামের একটা মাঠের মধ্যে চলে যায়। দুপক্ষের মধ্যে সারাদিনব্যাপী যুদ্ধ চলে। সারাদিনের এ যুদ্ধে আমাদের দুজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। রাত নেমে এলে রাতের অন্ধকারে ওরা পালিয়ে যেতে চাইলে পাক আর্মিরা গণপিটুনির শিকার হয়। সাধারণ জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের হত্যা করে।

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া জেলায় এমন হাজারো ইতিহাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পাক আর্মিদের অত্যাচারের কাহিনী যেমন আছে তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের ও সাধারণ মানুষদের অদম্য-সাহসের অনেক বীরত্বগাঁথাও এখানে রয়েছে।

[সাক্ষাৎকার : মকবুল হোসেন মুক্তিযোদ্ধা, শিবগঞ্জ]

মোফাজ্জল হোসেন : যুদ্ধের সেই দিনগুলি

আমি বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি। কাহালু ও তালোড়ায় পাক আর্মিদের সঙ্গে প্রতিরোধ যুদ্ধ করি। আমার বাড়িতে তখন মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিত। তাদের নানা ধরনের সহযোগিতা করতাম। আমার আত্মীয় স্বজনরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আমরা আমাদের বাড়িতে বসে অপারেশনের আগে নানা প্রস্তুতিমূলক আলোচনা ও পরিকল্পনা করতাম। আমাদের গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামে পাকসেনারা যখন আক্রমণ চালাতো তখন আমরা সুবিধামতো সেসব গ্রামে আশ্রয় নিতাম। গ্রামবাসী সহ সাধারণ জনতা আমাদের নানাভাবে সহযোগিতা করত। একদিনের একটা অপারেশনের কথা

বলছি। আমরা তখন কাহালুর জৈতল গ্রামে একটা অপারেশনে যাবার পরিকল্পনা করছি। গিয়ে দেখলাম পাক আর্মিরা গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। লুটতরাজ হচ্ছে। আমরা ১০০ জন যোদ্ধা এ অপারেশনে অংশ নিলাম। দীঘস্থায়ী যুদ্ধ হলো আমাদের সঙ্গে পাক আর্মিদের। আমাদের একজন সৈনিক গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়। বাটুল নাম ছিল তার। আমরা আমাদের সাথিকে ওখানে রেখে পিছু হটি। নিশ্চিন্তপুর হাটে এসে উঠলাম। তারপর পায়ে হেঁটে চলে এলাম নলডুবির আব্দুল সাত্তারের বাড়িতে। আমার সঙ্গে তখন ছিল শাহনাজ চুন্নু, শাহজাদা চৌধুরীসহ আরও অনেকেই। এভাবে যুদ্ধের সময়গুলো পার করি। আমি আমার অন্যান্য সহযোগিদের সাথে দেশকে মুক্ত করার জন্য ভারতে ট্রেনিং নেই।

[সাক্ষাৎকার মোফাজ্জল হোসেন। শিবগঞ্জ (বিহার) মুক্তিযোদ্ধা।]

আমাদের দেশ বাঁচানোর লড়াই– টি. এম. মুসা (পেস্তা) মুক্তিযোদ্ধা

২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ৮ –৮.৩০ মিনিট হবে। মালতীনগরে আমাদের অফিস ছিল। সে অফিসের হাবিলদার মোসলেম এসে জানাল S. P সাহেব দেখা করতে বলেছেন। আমি তার কাছে গেলাম। বলল, পাকিস্তানি মিলিটারি রংপুর থেকে রওনা দিয়েছে বগুড়ার দিকে। তাদের (মিলিটারিদের) Receive করতে হবে। পুরো বগুড়ায় ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। তৎকালীন D. C ছিল খানে আলম খান এবং S.D.O. ছিলেন আব্দুল হাই। আমরা কয়েকজন ওনার বাসায় যাই। গিয়ে দেখি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। সমবেত সকলে আলোচনা করে আমরা কি করব। এক পর্যায়ে তৎকালীন বগুড়ার ওসি মিজান সাহেব বললেন, আমাদের বের হয়ে যাবার কোনও পথ নেই। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। হয় মরব নয় বাঁচব।' এ কথার ভিত্তিতেই ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃস্থানীয়রা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন কি করা হবে। আমরা জানালাম আমরা প্রতিরোধ করব। আমরা বগুড়া ছাড়ব না। হয় আমরা মরব নয় আমরা বগুড়াবাসিকে রক্ষা করব। এই সিদ্ধান্তের পর আমরা বের হয়ে যাই।

বগুড়া শহর থেকে মোকামতলা ও মহাস্থানগড় পর্যন্ত মানুষকে চিৎকার করে জানিয়ে দিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের বগুড়া অভিমুখে আসার কথা। জানানো হলো, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আসছে। আপনারা জেগে ওঠেন, আসুন সব জায়গায় বেরিকেড সৃষ্টি করি। রাস্তা-ঘাটে যাতে গাড়ি চলাচল করতে না পারে সেজন্য বেরিকেড তৈরি করা হয়। এদিকে বগুড়া শহরের স্টেশন মাস্টার সাহেব আমাদের সংবাদ দেয় স্টেশনে একটা মালগাড়ি এসে আটকে আছে। ঐ মালগাড়ি টেনে বগুড়া শহরে যে রেল লাইন গেছে তার এপার–ওপার আড়াআড়ি করে রেখে দিলাম। এসব ব্যবস্থা করতে করতে সকাল হয়ে যায়। বন্দুকসহ যার যা ছিল তা নিয়ে সবাই রাস্তায় নেমে আসে। অস্ত্র কিভাবে চালাতে হয় তা আমরা জানি না। আমি, ছুনু, শহীদ, হিটলু, আমার ছোট ভাই টিটু, সবাই বন্দুকসহ যার কাছে যা ছিল তা নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। যাওয়ার পথে আমরা প্রথমে বড়গোলার দিকে অগ্রসর হলাম। দত্তবাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই জানতে পারলাম পাকসেনারা মাটিডালী ক্রস করে। বগুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন আমরা

পিছিয়ে এসে বড়গোলায় অবস্থান নেই। ৩টি দলে ভাগ হয়ে যাই। এক দল জনতা ব্যাংকের ওপর, একদল ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ওপর এবং অপর দলটি ক্যালকাটা বেকারি (যেখানে আলমাস হোটেল) র ছাদে অবস্থান নেই। এদিকে গাজীউল ভাই ও তপনের নেতৃত্বে দুটি দল কালিতলা থেকে শুরু করে দত্তবাড়ী পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সুবিল পার হয়ে বগুড়ার দিকে এগুতে থাকে। আমাদের দলের সঙ্গে পাকসেনাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। এতে পাকসেনাদের গুলিতে নিহত হয় দশম শ্রেণীর ছাত্র টিটু। ছুনু আর হিটলুকেও ধরে নিয়ে যায় পাক আর্মিরা। আমরা যদি জানতাম যুদ্ধ কৌশল তবে আমাদের ছেলেরা এভাবে শহীদ হতো না। আমরা যখনই মাথা উঁচু করে দেখে নিয়ে গুলি করতাম তখন পাকসেনারা এসএল আর চালাত। যাতে ২৮ বা ৩২টা গুলি থাকে। তারপরও বাঙালিদেরযুদ্ধ কৌশল আর বুদ্ধিমত্তার কাছে পাকিস্তানিরা খুব একটা সফল হতে পারেনি। ওদের আমরা শহরের রেল লাইন পার হতে দেইনি সেদিন। বগুড়ার পুলিশ বাহিনী আমাদের সে সময় খুব সাহায্য করেছে। আজাদ গেস্ট হাউস, থানা এবং রেললাইনের পাশ দিয়ে যেন কেউ পার হতে না পারে। যেহেতু রেললাইনের ওপর বগি দেওয়া ছিল। পাকিস্তানিরা যে কনভয়গুলো নিয়ে এসেছিল তা পার করতে পারেনি। যখনই পাকসেনারা গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে তখনই আমরা ফায়ার করেছি। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ করতে করতে বিকাল হয়ে যায়। ওরা বগুড়া শহরের দিকে আর সেদিন এগুতে পারে না। ফায়ার করতে করতে Back করে পাক আর্মিরা। তারা মজিবুর রহমান মহিলা কলেজে ক্যাম্প ও আজিজুল হক কলেজে ক্যাম্প তৈরি করে।

২৬ মার্চে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। বগুড়া শহরে যখন তারা এগুতে পারেনি তখন তারা ক্যাম্পে ফেরার সময় ফজলুল বারীকে হত্যা করে। পাক আর্মিরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ক্যাম্পের দিকে তখন ফজলুল বারীর বাড়ি থেকে গুলি এসেছিল। পাকিস্তানি আর্মিরা Back করে ফজলুল বারীর বাড়িতে ঢোকে। এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে ফজলূল বারী নিহত হয়। পাকসেনারা ফজলুল বারীর ছেলে ডিনাকেসহ আরও অনেককে বেঁধে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ডিনা বারবার অনুনয় বিনয় করতে থাকে, বলে আপনারা আমাদের ছেড়ে দেন। পাকসেনাদের বলে আমার বাবা ফাজলুল বারী মুসলিম লীগের মন্ত্রী, আপনারা ভুল করছেন। পাকসেনারা এ কথার তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ওদের বাড়িতে আসে। কাগজ পত্র ও তথ্যানুসন্ধান করে প্রমাণিত হয় যে ডিনার কথা সত্য। তখন ডিনাকে ছেড়ে দেয়। বলে তোমার বাবাকে দাফন কর। কোনও অসুবিধা নাই। আমরা আজ আর কিছু করব না।' এ খবর শোনার পর আমরা আমার ভাই টিটু, আজাদ এদের লাশ দাফন করি। রাত্রে আমরা বগুড়াবাসি মিলে শহর পাহারা দেই। আমাদের যারা একটু অভিজ্ঞ ছিল তারা আমাদের তা দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। যারা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য ছিল তারাও আমাদের প্রশিক্ষণ দিতেন।

পাকসেনারা ছিল নদীর ওপার। মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ থেকে শুরু করে আজিজুল হক কলেজ পর্যন্ত নদীর ওপার। আর আমরা ছিলাম নদীর এপার অর্থাৎ সুবিলের পর। আমরা সুবিলের এপারে বাংকারে করে পাকসেনাদের সঙ্গে নিয়মিত যুদ্ধ

করি। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় বগুড়া থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দেই। বগুড়া প্রায় ১ মাস মুক্ত ছিল। ১৭ এপ্রিল আমরা বগুড়া ত্যাগ করি। বগুড়া সার্কিট হাউসে টেলিফোন অপারেটিং করত B D R সদস্যরা। নজরুল ইসলাম ছিল এর দায়িত্বে। উনি তখন ছিলেন নওগাঁয়। আমাদের উনি জানালেন পাক আর্মিরা তিন দিক থেকে বগুড়া আক্রমণ করছে। আমাদের তখন তিনটি ক্যাম্প ছিল– সেন্ট্রাল হাই স্কুল ক্যাম্প, করনেশন স্কুল ক্যাম্প ও মালতীনগর হাই স্কুল ক্যাম্প। পিটি স্কুল ক্যাম্প ছিল আমাদের Store. এখানে সকাল হলেই চারদিক থেকে খাবার আসত। রান্না হতো অস্ত্র জমা ও প্রশিক্ষণও হতো। আমাদের দলটি নগরবাড়ি গিয়ে পাকসেনাদের অবস্থান জানতে চায়। এতে পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। এতে আমরা পরাজিত হই। আমাদের কাছে সংবাদ আসে, আমরা যেন নগরবাড়ি ত্যাগ করি। আমাদের জানানো হয় আমাদের চারদিক ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন জয়পুরহাট পার হচ্ছি তখন দেখতে পারি রেলগাড়ি ভর্তি পাকআর্মি তখন যাচ্ছে।

আমরা যখন হিলি বর্ডার ক্রস করছি। পরবর্তীতে কামারপাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছি, এভাবেই বগুড়ায় শত্রুদের প্রথম মোকাবেলা করি আমরা। প্রশিক্ষণ শেষে নদী পথে সারিয়াকান্দি দিয়ে বগুড়ায় প্রবেশ করি। সময়টা অক্টোবরের মাঝামাঝি। যুদ্ধের সময় আমরা জনগণের সহযোগিতা আর দেশবাসির যে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন পেয়েছি, তা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

একটি ঘটনার কথা বলছি, আমরা যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করতে করতে বগুড়া শহরের দিকে এগুচ্ছি। হঠাৎ করে খবর পেলাম ফুলবাড়ী দিয়ে কয়েকজন আর্মি যাচ্ছে। সে আর্মিরা আমাদের অস্তিত্ব টের পায়নি। আমরাও জানালাম যে, আর্মিদের গাড়ি এ পথ দিয়ে কিছুক্ষণ আগে গিয়েছে। আর ৯জন আর্মি পায়ে হেঁটে এ পথ পার হচ্ছে। আমরা পরিকল্পনা করলাম এদের কিছুতেই পার হতে দেওয়া যাবে না। আমরা ৩দিক দিয়ে ওদের আক্রমণ করলাম। রেজাউল করিম মুন্টুও তার দল নিয়ে আক্রমণ করল। পাক আর্মিদের তিনদিক থেকে দাবড় (তাড়া) দেওয়ায় তারা নদীতে গিয়ে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষা করতে চাইল। ওরা সম্ভবত সাঁতার জানত না। নদীর পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিল সাধারণ জনতা। জনতা হোলেঙ্গা (বাঁশের টুকরা) দিয়ে পাক আর্মিদের মারতে থাকল এলোপাতাড়ি। ওরা নদীর পানিতে টিকতে পারছিল না আবার পাড়ে উঠতেও পারছিল না। সে এক বীভৎস অবস্থা। এরপর পাক আর্মিদের তুলে এনে সাধারণ জনতা রাম দা (বড় দা) দিয়ে কুপিয়ে ৯ জনকেই হত্যা করে।

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাধারণ জনতার আরও সহযোগিতা আর পাক আর্মিদের প্রতি ঘৃণার একটা উদাহরণ দেই। বগুড়ার আড়িয়া বাজার ছিল আর্মিদের সাব ক্যান্টনমেন্টে। মুক্তিযোদ্ধারা ওখানের আর্মিদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘস্থায়ি এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের জয় হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যখন আনন্দে উল্লাস করছিল তখনই পাক আর্মিরা মাসুদ নামের একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। এক পর্যায়ে পাকআর্মিরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। মাসুদ ছিল সুত্রাপুরের কসাইপট্টির টি. আহম্মেদের ছেলে। পাকসেনাদের সারেন্ডার করে যখন শহরে জেলখানায় এনেছি তখন বিক্ষুব্ধ জনতা যারা

কসাইপট্টির ছেলে ছিল তারা চাপাতি, রাম দা নিয়ে জেলখানার গেটে এসে আমাদের কাছ থেকে পাক আর্মিদের ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওদের কুপিয়ে হত্যা করল। আমরা বাধা দিতে পারলাম না। পাক আর্মিদের স্ত্রী ও সন্তানদের জেল খানার ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওরা বেঁচে গিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। পাক আর্মিদের নিষ্ঠুরতার নজির একটি দুটি ঘটনায় শেষ হবে না।

আমাদের ওপার বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং দিয়েছে। বগুড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করেছি। রানিহাটে যেদিন আক্রমণ করব সেদিন আমাদের সবাই একজায়গায় মিটিং করি। আমাদের মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন বগুড়ার ডিস্ট্রিক্ট জাজ। সবাই তখন ব্রত ও শপথ নিয়েছিলাম। আমরা যখন যুদ্ধের শেষদিকে শিবগঞ্জে নদীর মধ্যে দিয়ে ট্যাংক নিয়ে পার হচ্ছিলাম তখন পাক আর্মিরা আমাদের আক্রমণ করল। আমি আমার পায়ের উরুতে দুটো গ্রেনেড বেঁধে রেখেছিলাম ওদের দেখে তা ছুঁড়ে মারলাম। এতে অনেক পাক আর্মিই নিহত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধাই বগুড়া রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এর মধ্যে এ. টি. এম জাকারিয়া সাহেবের কথা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের পর ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনী বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ex-ray মেশিন নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমরা সে সময় ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছিলাম, প্রতিবাদ করতে পারিনি। আমরা ছিলাম ফ্রিডম ফাইটার। আমাদের ক্ষমতা ছিল কম। জাকারিয়া ভাই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিল ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। জাকারিয়া ভাই বলেছিল, আপনারা মিত্র বাহিনী হিসেবে এ দেশকে স্বাধীন করতে এসেছেন, আমাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু আপনারা এ মেশিন কিছুতেই নিয়ে যেতে পারেন না। আমি কিছুতেই নিতে দিব না।

যুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী একটা কথা বারবার বলছিল– একটি দেশে যুদ্ধের পর রেপ ও লুট কমন বিষয়। আপনাদের দেশকে আমরা স্বাধীন করে আসছি। রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের দেশের লোকদেরই। যুদ্ধের সময় বগুড়ায় নারী ধর্ষণের মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে। জয়পুরহাটের হিলিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতায় হিলির মানুষ ভয়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা সর্ষের ভুঁইয়ের (ভূমি) তলে পাক আর্মিদের বাংকার ট্রেস করতে পারছিল না। আমরা অনেক কষ্টে বাংকারটা খুঁজে বের করি এবং যখন বাংকারে প্রবেশ করি তখন দেখি একজন মেয়ে উলংগ। বলছিল কোনো জিনিসে হাত দিবেন না– এ কথা বলে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা ১৪টা মেয়েকে একেবারে উলংগ অবস্থায় উদ্ধার করি। পরে ওদের কোনও রকমে কাপড় পরিয়ে হিলি সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই। ওই অসহায় মেয়েদের বয়স ছিল কম। আমরা ঐ বাংকার থেকে ১৯জন পাকসেনাকে আটক করি। আমরা উদ্ধারকৃত মেয়েদের লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারছিলাম না। জেনেভা চুক্তি অনুসারে কাউকে হত্যা করা মানবাধিকার লংঘন। কাউকে মারা যাবে না এমন নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। কিন্তু আমরা ওদের ১৯জনকে হত্যা করি। ওদের জন্য আমাদের কোনও করুণা ছিল না। নারীদের ওই অবস্থায় দেখে আমরা শিউরে উঠেছিলাম। পরে আমরা ব্রিগেডিয়ার শাহ্ সাহেবের কাছে

গিয়ে ঘটনার কথা বলি। এবং পাক আর্মিদের পরিণতির কথা বলে তাকে বলি আমাদের যা সাজা দিবেন দেন। আমাদের কোনও কিছু বলার নাই। উনি শুনে শুধু বললেন মার্চ, আর কিছুই বললেন না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মানুষ বিপদে পড়ে রাজাকার হয়েছিল। সব রাজাকারই যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তা নয়। অনেকেই আমাদের সাহায্য করেছিল। একবার এক গ্রামে যুদ্ধ করতে গিয়েছি ওখানের এক রাজাকার বলেছে, হেরিকেন যদি বড় করে জোরে জ্বালানো থাকে তবে বুঝবেন আর্মিরা আছে। আর ডিস করে (কম জ্বলা) থাকলে বুঝবেন আর্মি নাই। এটা বুঝে আপনারা জায়গা বদল করবেন।

এভাবে যুদ্ধের নয়টা মাস আমরা কাটিয়েছি। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা আর আমাদের দেশেপ্রেম জাগ্রত না হলে আমরা এ দেশটা মুক্ত করতে পারতাম না পাক আর্মিদের কবল থেকে। ১৩ ডিসেম্বর বগুড়া সদর ছাড়া সব এলাকা মুক্ত হয়। বগুড়া জেলা মুক্ত হয় ১৫ ডিসেম্বর।

[সাক্ষাৎকার : টি. এম. মুসা (পেস্তা)]

নয় মাসের যুদ্ধটি অনিশ্চিত ছিল

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি পাকিস্তান থেকে ফেরত আসি। ওখানে পড়াশুনা করতাম। পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে আমি আমার বন্ধু এস. এম ফারুকের বাসায় ছিলাম। বগুড়া আযিযুল হক কলেজের জি. এস বাদশা, আমি ও ফারুক, আযিযুল হক কলেজের পাশের বাসায় ঘুমিয়ে ছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম দেশে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। যে কোনও সময় কিছু একটা ঘটবে। ঐ দিন রাতে অর্থাৎ শেষ রাতের দিকে একদল ছেলে এল, বারবার বাদশা ভাইকে খুঁজছিল। আগন্তুক ছেলেগুলো বলছিল, বাদশা ভাই ওঠেন বগুড়ায় মিলিটারি আসছে। রাস্তায় বেরিকেড দিতে হবে। এটা শোনার পর আমি দেখলাম কামারগাড়ী রেল ঘুমটির ওপর ট্রেন নিয়ে এসে রাস্তায় বেরিকেড দিয়েছে। সকাল হয়েছে আমি সাতমাথার দিকে এলাম একা। দেখি একটা গুলিবিদ্ধ লোককে কাঠের ওজার ওপর করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম মিলিটারিরা রংপুর থেকে মাটিডালী পর্যন্ত আসছে। রাস্তায় গাছ কাটছিল তাকে গুলি করছে সে পড়ে গেছে। তারপর ওখান থেকে ছোটাছুটি শুরু হলো। আমি তখন সাতমাথায় অগ্রণী ব্যাংকের ভেতরে গেলাম। যেয়ে দেখি বন্দুক নিয়ে দারোয়ান চুপ করে বসে আছে। দারোয়ান ছিল নন বেঙ্গলি। ওকে বললাম, চল উপরে যাই মিলিটারি আসছে আমরা এখান থেকে গুলি করব। আমাদের উল্টোদিকে সপ্তপদী মার্কেট যেখানে তখন ঐ বিল্ডিং পুরোপুরি নির্মাণ হয়নি। ওখানে কিছু টু টু বোর রাইফেল নিয়ে কয়েকজন যুবক প্রস্তুত ছিল। যখন পাক মিলিটারি মাটিডালী থেকে বগুড়া শহরের দিকে আসছে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য। কিছুক্ষণ পর আমি ঐ দারোয়ানের কাছে বন্দুক চাইলে সেও আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলো অগ্রণী ব্যাংকের ছাদে। আমরা দুজনে বন্দুক নিয়ে ছাদে পজেশন নিলাম। ঐ দিন ছিল শুক্রবার, এদিকে পাকসেনারা গুলি করতে করতে বগুড়া শহরে প্রবেশ করছে। মহাস্থান থেকে একদল দরবেশও সাতমাথায় চলে আসছে। সাতমাথার মাঝখানে বসে ওরা (যেখানে বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠ স্কয়ার) দোয়াদুরুদ

পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর যখন মিলিটারিরা শহরের সাতমাথার কাছাকাছি চলে আসছিল। তখন ভয় পেয়ে চলে গেল দরবেশরা। মিলিটারিরা রেল লাইন পার হতে পারছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা বাঁধা দিচ্ছিল। ওই সময় শুক্রবারের যোহরের আজান পড়ল। সে সময় পাক আর্মিরা পিছু হটে চলে গেল। আমি ১ নং রেল ঘুমটির কাছে এলাম। দেখলাম ওখানের একটি হোটেলে কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। এবং তার আগে ঝাউতলা মোড়ে ব্যাংকের ওপর ছিল টিটুর লাশ। মিলিটারি তখন পিছিয়ে যেয়ে কটন মিল রেস্টহাউসে অবস্থান নিল এবং টি এণ্ড টির কাছেও শেলটার নিল। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত আমাদের ও মিলিটারিদের মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ চলে। মাঝে মাঝে আমরা নামাজগড় থেকে ময়েজ মিয়ার ইটের ভাটা পর্যন্ত হয়ে সুবিল পর্যন্ত গিয়ে ওদের রেস্টহাউসে গুলি করতাম। আব্দুল করিম নামের একজন পুলিশ ছিল সোনাতলা তার বাড়ি। সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নিল। আমাদের সামনে তিনি ঐ দিনই খানসেনাদের গুলিতে শহীদ হন। তাঁর সঙ্গে আমি, সোনাতলার রাজু ও বাদশা ছিলাম। রাতের বেলার ঘটনা। এ ঘটনার পর আমরা নামাজগড় গোরস্থানে শেলটার নিলাম। আমরা তখনো বুঝিনি কোথায় এসে লুকালাম। সকালে উঠে দেখি আমরা কবর-স্থানের ভিতর। মিলিটারিরা ওদের কটন মিল ক্যাম্প থেকে শেলিং করছিল আর শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল। ৩০ তারিখে মিলিটারিরা আগের চেয়ে বেশি রকম এগ্রেসিভ হয়ে গেল। তারা শেল মারল। অত্যাচার করছিল। আমাদের দলটা ছিল তখন চেলোপাড়া। ওখানে একদল BDR এসে জিজ্ঞেস করল ভাই আমরাতো নওগাঁ থেকে এসেছি সারাদিন খাইনি আপনারা আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। আমরা তখন তাদের জন্য চাল চুলায় দিয়ে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি এমন সময় একটা শেল এসে আমাদের কাছেই পড়ল। আমরা তখন চিন্তা করলাম যারা আমাদের কাছে ভাত খেতে চেয়েছে তারাই এই শেলিং করেছে। পরবর্তীতে আমরা তাদের চার্জ করলাম। তারা বলল, না আমরা এ কাজ করিনি।' পরে আমরা ওদেরসহ চলে গেলাম সুবিল রেস্ট হাউসের নিচ দিয়ে খানদের আক্রমণ করার জন্য। রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা দেখলাম চারদিক নীরব। সারারাত অপেক্ষা করলাম তাদের প্রতি লক্ষ করে গুলি ছুড়লাম। কোনো উত্তর এল না ওদিক থেকে। এদিকে ভোর হয়ে গেছে, আমরা দেখলাম সুবিল রেস্ট হাউসেও কোনও আর্মি নাই, কটন মিল রেস্ট হাউসেও নাই। আমরা স্লোগান দিতে দিতে বগুড়া শহরের দিকে চলে এলাম। আমাদের স্লোগান ছিল, পালাইছে, পালাইছে–মিলিটারিরা পালাইছে। আমরা জয়ী হয়েছি। আমাদের শহরের দক্ষিণ দিকে আড়িয়া বাজারে একটা মিলিটারি ক্যাম্প আছে। ৬৫' র ওয়ারের সময় এটিকে আর্মস ডিপো হিসেবে ব্যবহার করত আর্মিরা। এখানে মাটির নিচে কিছু আর্মস আছে এবং আর্মড এম্যুনিশনও আছে। পি. টি. আই হলের দিকে এসে এটা আমরা রেড করার জন্য চিন্তা করলাম। তখন আমরা কয়েকজন লোক বাছাই করে আড়িয়া বাজার রওনা হলাম। সকাল তখন নয়টা কি সাড়ে নয়টা হবে। তখন থেকে দুপুর বারোটা কি সাড়ে বারেটা পর্যন্ত ওখানে আমাদের সঙ্গে পাকআর্মিদের সম্মুখযুদ্ধ হলো। এমন সময় সম্ভবত বারোটার দিকে ঢাকা থেকে দুটা প্লেন এল। প্লেন থেকে বৃষ্টির মতো গুলি শুরু হলো। আমরা আত্মরক্ষার জন্য পাশের বাঁশ ঝাড়ের নিচে শেলটার নিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখা

গেল প্লেন দুটো ফেরত গেল। আমাদের দলে ছিল মাসুদসহ আরও অনেকে। ঐদিন মাসুদ শহীদ হন। মাসুদ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন আলমকে সারেন্ডার করাতে। এমন সময় মাসুদের বুকে গুলি লাগে। মাসুদ নিহত হয়। এমন সময় পাকআর্মিরা সারেন্ডার করল। আমরা বন্দিদের সবাইকে নিয়ে ট্রাকে করে বগুড়া চলে এলাম। জেলখানার দুইগেটের মাঝখানে ওদের (বন্দি পাকসেনা ও তাদের পরিবারবর্গ) ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। আমরা শহরের দিকে ফিরে এলাম। আমরা যে সতের জন পাক আর্মিকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিলাম উত্তেজিত জনতা তাদের জেলাখানার ভেতর ঢোকার আগেই হত্যা করে। আমরা এসব ঘটনা দেখে একটা মোটর সাইকেল নিয়ে আড়িয়া বাজারে গেলাম অস্ত্র আনতে, গিয়ে দেখি একটা আর্মি রয়ে গেছে। ও আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছিল, আমরা চিন্তা করলাম ওই আর্মিকে কীভাবে ধরা যায়। আমাদের অস্ত্রে কিন্তু কোনও গুলি নাই। আমার কাছে থ্রি নট থ্রি এবং দুলুর কাছে একটা চায়নিজ রাইফেল। আমরা যখন জিতে যাচ্ছিলাম তার কিছু সময় আগে আমাদের গুলি শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা কৌশলে without গুলিতে ওকে সারেন্ডার করালাম এবং ওকে ফারুকের (আমাদের সহযোদ্ধা) বাড়িতে নিয়ে এলাম। বিকেলের দিকে জেলখানার দিকে নিয়ে গিয়ে ওকে বটগাছের নিচে দাঁড় করালাম। ওর কাছে একটা রিভালবার ছিল ওটা ওর কাছ থেকে আমরা নিয়ে নিলাম। ওই পাক আর্মিটি যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল তখন তাকে ওরই রিভলবার দিয়ে গুলি করলাম। ওই পাক সৈন্যটি মারা যায়, আমরা ওখান থেকে ফিরে এসে নতুন করে Camp চালু করি। আমি, কাদের ভাই, হারুন ভাই, মফিজ ভাই ছিল। কয়েকদিন পর আওয়ামী লীগ থেকে সম্ভবত নির্দেশ ছিল, মিলিটারিরাতো বগুড়া দখল করবে তখন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকাটা হিলিতে নিয়ে গেলে যুদ্ধের সময় কাজে লাগবে। এ Information টা আমরা জানতাম না। একটি দল ব্যাংক থেকে টাকাটা নিয়ে ট্রাক লোড করছিল অন্য একটা গ্রুপ মনে করেছিল টাকাটা লুট হচ্ছে। আমাদের ক্যাম্প ছিল করনেশন স্কুলে। ঐ দলটি আমাদের কাছে অস্ত্র চাইতে এসে বলল, বাংলাদেশ ব্যাংক লুট হচ্ছে চল আমরা প্রতিরোধ করি। পরবর্তিতে ওরা আমাদের কাছ থেকে হাতিয়ার নিয়ে যায় এবং ওদের সারেন্ডার করায়। টাকাগুলো কোন দিক দিয়ে নিয়ে যাবে এমন সিদ্ধান্ত কেউ জানত না। তখন ঐ দলটি সান্তাহারের দিকে যেতে লাগল। তখন সান্তাহার রোড ছিল কাঁচা। চব্বিশটি কাটা জায়গা ছিল। ট্রাক যেতে পেরেছিল মুরইল পর্যন্ত। মুরইল স্কুল মাঠে ট্রাকসহ টাকা রাখা হয়। যখন মিলিটারিরা বগুড়ায় এল তখন কিছু টাকা স্থানীয়রা লুট করে। কিছু টাকা ভারতে যায়। আমাদের Camp থেকে বলা হলো আমাদের এদিকে মিলিটারি নেই ওরা রংপুরের দিকে চলে গেছে। অন্য একটি দল ঢাকা থেকে বগুড়ার দিকে আসছে। ওদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। আমরা কয়েকজন ওখানে চলে গেলাম। আমাদের ৪ জন ও কিছু BDR, পুলিশ, E P. R আমাদের সহযোগিতা করল।

ওখানে আমরা যুদ্ধের ২দিন পর পিছু হটে বগুড়া আসি। পরে ভারতে ট্রেনিং নিতে চলে যাই। ফিরোজ নামে আমার একজন বন্ধু ছিল ওখানে। আমি, ফিরোজ, দৌলত, দুলু আমরা একটা জিপ নিয়ে ভারতে রওনা দিলাম। কামারপাড়া ক্যাম্পে গেলাম। যারা ছাত্র ইউনিয়ন করত তাদের জন্য ছিল Camp টা। তখন ওখানে কোনও মুক্তিযোদ্ধাদের

ট্রেনিং Camp হয়নি। আমরা একদিন সন্ধ্যার আগে আগে Camp এ আছি। এমন সময় BSF এর জোয়ানরা এসে আমাদের Camp টা ঘেরাও করে। ওটা ছিল বিমান বাবুর বাড়ি। আমাদের সবাইকে অর্থাৎ হায়দার ভাই, বিন্থু, পেস্তা ভাই, লতিফ ভাই, তারা ভাই, কাদের ভাই, সবাইকে একসঙ্গে গ্রেফতার করে। আমি আর দুলু ছিলাম বাইরে। আমরা ভেতরে ঢুকছিলাম, আমাদের তখন বলল, ভেতরে যাবেন না। আমরা বললাম যাবোনা মনে, আমরা তো এখানেই থাকি। ভেতরে ঢুকতে দিল। গিয়ে দেখি সবার কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাইন ধরে বসিয়ে রেখেছে। B S. F এর একজন আমাকে বসতে বলল। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম আমাদের কী অপরাধ, বসতে পারব না। আমাদের দোষটা কি? ঐ জোয়ান তখন বলল, এই ছেলে তুমি কী কর। বললাম পড়াশুনা করি। পাকিস্তানে ছিলাম। বলল, তোমার বাড়ি কোথায়। বললাম সোনাতলা। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি জিল্লুরকে চেন? ল্যাফটেন্যান্ট জিল্লুর?

আমি বললাম কেন? চিনি। বললাম আমি জিল্লুরের ভাই ইলিয়াস, তখন উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি আমার সঙ্গে দুলুকেও টান দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দুজনকে বাদ দিয়ে ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। সেদিন রাত্রে যাবার সময় মোকলেস দা বলে গেল। তুমি এক কাজ কর এ খবরটা E.P.R -এর তপনদাকে দিবা। বলবা আমাদের ধরে নিয়ে গেছে। আমি ও দুলু সে রাত্রেই ওখান থেকে ১০ কি. মি দূরে কামারপাড়া থেকে বালুরঘাট তপনদার বাড়ি খোঁজ করে তাকে খবরটা জানালাম। তার পরদিন সকাল ১০টার মধ্যেই তপনদা ওদের রিলিজ করে নিয়ে এল। বিজয় শ্রী নামক একটা এয়ারপোর্ট আছে যেখানে ওদের Camp করে দিল। আর আমাদের দুজনকে ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেব বিজয় শ্রীতে কিছুদিন থাকতে বললেন। আমরা দেখি ওখানের ক্যাম্পের সবাই থাকে আর খায়। যুদ্ধের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেই ওখানে। আমরা ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমাদের উনি চলে আসতে বললেন এবং তখন কামারপাড়া Camp চালু হলো। Camp incharge ছিলেন অধ্যাপক আবু সাঈদ। আনোয়ার সাহেব ছিল। এরপর যারা হায়ার ট্রেনিং এ যাবে তাদের বাছাই করা হলো। প্রথমে হায়ার ট্রেনিং টা হতো রায়গঞ্জে। বন্যা হবার কারণে পরবর্তীতে তা শিলিগুড়িতে স্থানান্তর করা হলো। কিছু লোক ট্রেনিংয়ের জন্য রিক্রুট করা ছিল, তাদের মধ্যে ছাত্রলীগ কর্মীরাও ছিল। তাদের মধ্যে সামাদ ভাই, জুলফিকার হায়দার, সোনাতলার মকবুল, গাবতলীর পিন্টুভাই ছিলেন। এরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের দক্ষতার জন্য হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য রিক্রুট করত। ওটা লিডার ট্রেনিং ছিল। কিছুদিন পর আমরা আমাদের Camp টা ওখান থেকে ট্রান্সফার করে মালঞ্চায় নিয়ে আসলাম। B.E.D ট্রেনিং সেন্টার ছিল ওটা। যেহেতু ওটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাই ওখানে না উঠে আমরা খড় দিয়ে ঘর তৈরি করে Camp বানালাম। ওখানে টিলার মতো ছিল জায়গাটা। যারা বাংলাদেশ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ট্রেনিং নিতে যেত তাদের ট্রেনিং করিয়ে হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠাতাম। ওখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে তারা এ Camp এ আসত। তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র নিয়ে দেশে চলে আসত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ঘটনা এটা।

একদিন দেখি সাঈদ ভাই'র মন খারাপ, জিজ্ঞেস করলাম কারণ টাকি। তিনি বললেন ইন্ডিয়া আমাদের আর Help করবে না। কি করা যায়? বলল আজ মিটিং আছে

যাবে কি না? আমি রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে Camp এর incharge ছিলাম। সাঈদ ভাই'র সঙ্গে গেলাম। ওইদিনের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন। ওনারা মিটিং করে বলল, আমরা আপনাদের আর Help করতে পারব না। মিটিং এর প্রথম পর্যায়ে এটা বলল। আমাদের বড় ভাইরা মন খারাপ করল। কান্না কান্না ভাব। পরে দ্বিতীয় দফায় আবার মিটিং এ বসল। বলল, ঠিক আছে আমরা Help করতে পারব। তবে এখন নয় ডিসেম্বর মাসে। আমরা জানতে চাইলাম কেন? ওনারা বললেন ডিসেম্বরে শীত পড়বে, চায়না বর্ডারটা বন্ধ হয়ে যাবে। Withron ইন্ডিয়ান Force ওখান থেকে আসবে ঐদিকে আর যুদ্ধ করতে হবে না, ওখানকার Force দের এদিকে (বাংলাদেশের জন্য) Apply করতে পারব। তোমরা এখন শুধু গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধটা টিকিয়ে রাখ। এভাবে তাদের কথামতো আমরা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধটা টিকিয়ে রাখলাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি ১০ বছর পর্যন্ত চলে তবে কী করতে হবে। এ জন্য আমাদের Leadership ট্রেনিংয়ের জন্য প্রত্যেক এলাকার M.P দের নির্বাচন করল। তারা ঐ ট্রেনিংয়ে যাবে। বগুড়ায় আমাদের এ্যাডভোকেট হবিবর রহমান। উনি পাকিস্তান পাক আর্মির কাছে সারেন্ডার করেছিলেন। যার জন্য বগুড়ার কোন লোকও ঐ ট্রেনিংয়ে যাবার জন্য আমার এলাকায় ছিল না। আমি ওনার গ্যাপে ট্রেনিংয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক আবু সাঈদ, সাবেক বগুড়া সদরের মহাতাব, S.P. সুইটসহ হায়ার ট্রেনিং করলাম শিলিগুড়িতে। ওখান থেকে কিছুদিনের জন্য সাঈদ ভাইর সঙ্গে মালদহ গেলাম। মালদহ থেকে শিবগঞ্জ থানায় ঢুকলাম। শিবগঞ্জ ছিল বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর সাহেবের এরিয়া। জাহাঙ্গীর সাহেবের একটা বাতিক ছিল যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অপারেশনে গিয়ে পিছপা হয়ে ফিরে আসে তাদের তিনি হত্যা করেন। এভাবে তিনি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছেন। সাঈদ ভাই বললেন দেখা হোক কিভাবে মারে। আমি সাঈদ ভাইর সঙ্গে গেলাম ও জাহাঙ্গীর ভাইর সাথে একটা অপারেশনেও ছিলাম। ঐদিন একটা ছেলে মারা গিয়েছিল। নাম ছিল কামাল, বাবা-মার একমাত্র পুত্র ছিল। কামাল অপারেশনে যেতে রাজী নয়। কামালের বিয়ে। কামালের বাবা বললেন, কামাল অপারেশনে যাবে না। সাঈদ ভাইকে দেখে ওর বাবা বললেন সাঈদ সাহেব যখন আসছে তখন আমরা কামালের বিয়ে দেব। তখন বলল ঠিক আছে বিয়ে হবে কিন্তু অপারেশনে যেতে দিতে হবে। বিয়ে হলো। কামাল অপারেশনে যেতে রাজি হলো। ঐদিন রাতেই অপারেশনে গিয়ে গুলি খেয়ে কামাল মারা গেল। ঐ অপারেশনে আমি ছিলাম। নব বিবাহিত কামালের এই মৃত্যু নিয়ে খবর বেরিয়েছিল 'জয়বাংলা' পত্রিকায়। হেডিং ছিল– 'কামাল একগুলিতে মরে না' প্রথমবার কামালের ডানহাতে গুলি লাগে। পরের গুলিটি তার বা হাতে লাগে। বা হাতে ছিল এস.এল আর। এ জন্যই ওই News টি আসে। ঐদিনই আমি আমার একজন সাথীকে হারিয়েছি। কামাল ছিল শিবগঞ্জের ছেলে। ওর লাশ শিবগঞ্জেই দাফন করা হয়েছে। ঐ অপারেশনের পর আমরা Back করে Camp এ ফিরে আসি। তারপর Camp পরিচালনার দায়িত্বে আসি। এর কিছুদিন পরই দেশ স্বাধীন হয়।

[সাক্ষাৎকার : মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ।]

মনযূর উল করীম : একাত্তরের শিলালিপি থেকে

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। বগুড়া শহরটা কেমন যেন উতলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু মালতীনগরের এক কোণে অবস্থানের কারণে শহরে যে কত লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছিল তা টেরই পাইনি। সকালের দিকে মেজর সালমান ওর ফোকসওয়াগন কার নিয়ে এসে হাজির হলো। বললো : "চলিয়ে শহর দেখকে আঁয়ে। বিহারী লোগ সব ভাগরেহে হেঁ। পাতা নেই উনলোগ এতনা ডরগসে কিউ। মেরা খেয়াল হায় উনসবকো সাচ হি সাচ বাতা দেনা কে ডরনে কা কুছ নাহি হায়।"

ব্যাপারটা বোঝার জন্য শহরে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় তখন মানুষের ঢল নেমেছে। বোচকা প্যাটরা নিয়ে কে যে কোন দিকে ছুটছে তার ঠিক নেই। যখন কেউ উত্তর দিকে যায় তখন সব ছুট দেয় উত্তর দিকে। যদি পশ্চিম দিকে একদল ছুটলো তো সব পশ্চিম দিকে। থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কি? জবাব অস্পষ্ট। তবে বোঝা গেল যে স্বাধীনতা বিরোধী এই "বিহারী" রা আগামীতে তাদের ভাগ্যের লিখনে অশনিসংকেত ঠাহর করতে পেরে এমন দিশেহারা হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

মেজর সালমান মাহমুদ এবার গাড়ি ছুটালো ওর নিজের বাসার দিকে। ও থাকতো সরকারি অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ফ্লাটে। ফ্লাটটি খুব সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের সাজগোজে যুদ্ধাবস্থার কোনও চিহ্ন নেই। এ্যালবাম খুলে বউ-বাচ্চার ছবি এগিয়ে দিলো আমার দিকে। ওর চোখ তখন অশ্রুসিক্ত। ছোট্ট মেয়েটার জন্য ওর মন খারাপ হয়ে উঠেছে। বলল, কেমন সাজানো গোছানো আমার বাগানটা। দেখুন, ওই ছবিতে। পাথরগুলো নানারঙে রঙ করেছে আমার স্ত্রী। ওর বাগান করার খুব শখ। ওর কথায় যা বুঝতে পারলাম তার সারমর্ম এই যে, অন্তিম মুহূর্তের আশংকা করছে সে। তাই বউ-মেয়েকে ওর ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে।

শহরের অন্য অংশে তখন আবার একদল "বিহারী" লুটপাট শুরু করে দিয়েছে। কিছু কিছু আলবদরের লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে গ্রামের দিকে কেটে পড়ছে বলে খবর এল।

বাসায় ফিরে এলে সহকর্মি এম, এ সিদ্দিক (এডিবিডি), আবদুর রহমান (যুগ্ম পরিচালক, শ্রম বিভাগ), এসডিও (সদর) জনাব হাই সবাই পরামর্শ দিলো যে এখন কেটে পড়ার সময় হয়ে এসেছে। তারা গ্রামাঞ্চলে চলে যায়। কেবল আমার অনুমতি হলেই সবাই মিলে যাত্রা শুরু করবে। আলাপ আলোচনার পর ঠিক হলো তারা সবাই চলে যাবে। কিন্তু আমি থেকে যাবো। আব্দুর রহমানের পুরোনো ডাটসান ১৩ গাড়িটা আমার কাছে ফিরে আসবে। পরে প্রয়োজন হলে যেনো তাদের আশ্রয় স্থলে আমাদের ও নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে। আমার সহকর্মিরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। শহরে অফিসারদের মধ্যে থাকলাম কেবল আমি। সন্ধ্যা নাগাদ ড্রাইভার ফিরে এসে ডাটসান গাড়িটা আমার উঠোনেই রেখে চলে গেল।

১২ ডিসেম্বর। দিনটি কেমন অস্বস্তির মধ্যে কেটে গেল। ড্রাইভার এক সময়ে এসে অনুমতি নিয়ে গেল, সে তার পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবে। পাওয়ার হাউজের কাছেই ওদের বাসা এই যাবে আর আসবে। সকালে মেজর ইকবাল এবং মেজর সালমান মাহমুদ সোজা বাসায় এসে হাজির। জানতে চাইলাম কি হুকুম? বিগ্রেডিয়ার তাহাম্মুল হুকুম করেছেন শহরের একটি ম্যাপ চাই। জিজ্ঞেস করলাম; কেন? ওরা বললো, সময় এসে গেছে ডিনায়াল প্ল্যান কার্যকরী করার। সরকারের যুদ্ধ বইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধাবস্থায় যদি শত্রু আক্রমণ থেকে কোনও এলাকাকে রক্ষার প্রয়োজন হয়, তবে সেই অঞ্চলের প্রবেশপথে ব্রিজ, রেল লাইন বা গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা কে, পি, আই (কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন) ইত্যাদি অকেজো করে দিতে যেন শত্রুর কবলে পড়লেও এসবের সদ্ব্যবহার করতে না পারে। এই অপারেশনকে "ডিনায়াল প্ল্যান" হিসেবে অভিহিত করা হয়। আর ওপরের নির্দেশ অনুযায়ী সিভিল প্রশাসনকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমার অফিস রুমে বগুড়া শহরের একটি ম্যাপ ছিল। মেজরদ্বয় কোনও অনুমতি না চেয়েই ওটা খুলে নিয়ে গেল। ওই ধরে ধরে "ডিনায়াল প্ল্যান" এর ছক আঁকবে। যাবার সময় বলে গেল তারা শেষ নির্দেশ নিয়ে পরে আসবে। ওদের কথা মতো আমি ওদের অপেক্ষায় থাকলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু মেজর দু'জনের আর দেখা নেই। বেলা সাড়ে এগারো কি বারোটার দিকে তারা হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো। দু'জনেই যুদ্ধবেশে, মাথায় হেলমেট কোমরে গোজা রিভলবার, চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। ওদেরকে এভাবে আসতে দেখে বললাম; সিভিলিয়ান বেশেই মার্শাল-ল ডিউটি করছিলেন। তখন বেশ ভালোই লাগতো। এখন আবার এই লেবাস কেন? তারা যা বললো তার অর্থ এই যে, এখন সবাইকে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে। তাই বেসামরিক বেশ এখন সম্পূর্ণ বেমানান এবং তাদের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বুঝলাম শেষ মুহূর্ত অত্যাসন্ন। মেজর ইকবাল এবং মেজর সালমান দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলো-ম্যাপ দেখিয়ে, হুকুম হুয়া হ্যায় কে আপ স্টেট ব্যাংক চলে আয়ে আওর ডিনায়াল প্ল্যান চালু করে। আমি ওদের কাছ থেকে চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যে ঢাকা থেকে এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই হুকুম এসে গেছে। এই নির্দেশ সম্বলিত তারবার্তার অনুলিপি ওরাও পেয়ে গিয়েছিল। আর এটাই হলো আমার কাল। ব্রিগেড কমান্ডার এবং সাব এ্যাসিসটেন্ট মার্শাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ব্রিগেডিয়ার তোহাম্মল অনুরোধ করেছেন আমি যেন এ ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ যথা শিগগির তামিল করি। জবাবে বললাম; ঠিক হায়; চলিয়ে; শহরেতো স্টেট ব্যাক চালে। স্টেট ব্যাংক আমার বাসার খুব কাছাকাছি ছিল। আর ভাগ্যক্রমে স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার মোল্লা আব্দুল মজীদ সেই সময় আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তার পরিবারের সদস্যরা থাকতো ঢাকার বনানীতে। শহরটা একেবারে জনমানবহীন হয়ে যাওয়াতে আমরা কয়েকজন অফিসার একসঙ্গেই ওঠা-বসা করতাম, গল্প করতাম, আড্ডা মারতাম, আর স্ট্র্যাটেজিক জাল বুনতাম। মোল্লা মজীদ আমার সঙ্গে শামিল হলেন স্টেট ব্যাংকে। গেটের কাছে পৌঁছে ভদ্রলোক ওদের জন্য সৃষ্টি করলেন এক ফ্যাকড়া। মেজরদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন দেখিয়ে ব্যাংক কা ম্যানেজার

ম্যয় হু মাগার স্ট্রংরুম কী চাবি মেরা পাস নাহি হায়”। মেজর সালমান অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকাতেই তিনি ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছেই একটা করে চাবি থাকে। ম্যানেজার নিজের কাছে কখনো চাবি রাখেন না। অতএব ক্যাশিয়ার এবং এ্যাকাউন্ট্যান্ট ছাড়া স্ট্রংরুম খোলা যাবে না। তাদের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু ক্যাশিয়ার আর এ্যাকাউন্ট্যান্ট কে কোথায় থাকে আমি তো জানি না। ব্যাংকের দারোয়ান ছিল এক দাড়ি অলা। দেখেই মনে হচ্ছিলো তার সমস্ত গা ভর্তি পাকিস্তানের গন্ধ। লোকটা গায়ে পড়ে বলে উঠলো, আমি জানি ওরা কোথায় থাকে। আমি তাঁদের এক্ষুণি নিয়ে আসছি। বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাইসাইকেলে চেপে সে ছুটলো উল্লিখিত ভদ্রলোক দু'জনকে পাকড়াও করে আনার জন্য। ক্যাশিয়ার এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুব কাছাকাছি থাকতো। তাদের নিয়ে আসতেই স্ট্রংরুম খোলা হলো। সত্যি বলতে কি, প্রবেশনার হিসেবে সেই কবে ট্রেজারি পরিদর্শন করা শিখেছিলাম। আর পরবর্তীকালে এস,ডি,ও হিসেবে ট্রেজারি পরিদর্শন করেছি। তখনকার দিনে সাব ডিভিশনের ট্রেজারিতেই সব সরকারি টাকা পয়সা মজুদ থাকতো। এসব টাকা নোট হলে সাজানো থাকতো শেলফে, থাকে থাকে। কিন্তু থাকে থাকে সারি সারি এমন করে সাজানো কাগজের টাকা একসঙ্গে আগে কখনো দেখিনি। ছাদের সিলিং পর্যন্ত কাগজের টাকার নোট। তুমার দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমি এই টাকার পাহাড় দেখছিলাম আর ভাবছিলাম যে এগুলো ধ্বংস করার মতো বোকামি আর কি হতে পারে এবং এগুলো পোড়ানই বা যাবে কেমন করে? আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ঢাকা থেকে প্রেরিত টেলিগ্রাফিক নির্দেশটি মেজর ইকবাল তুলে ধরলো আমার সামনে। ওতে আদেশ করা হয়েছে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে আমি যেন “ওয়ার বুকের” বিধি অনুযায়ী ডিনায়াল প্ল্যান কার্যকর করি। আগেই বলেছি ডিনায়াল প্ল্যান এর তাৎপর্য হচ্ছে যে শত্রু সেনারা গুরুত্বপূর্ণ শহর বা প্রশাসনিক কেন্দ্র দখল করবে বলে অনুমতি হলে সেই অঞ্চলের সবকিছু ধ্বংস করে দিতে হবে যেন শত্রুর আয়ত্বে কোনও কিছুই না আসে। আমি কলম বের করে গট গট করে ব্যাংকের টাকা পয়সা যা কিছু আছে সব ধ্বংস করার নির্দেশ লিখে দিলাম।

মেজর সাহেবরা আমার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিবাদ না পেয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। আমি বললাম আমি তো নির্দেশ দিয়েছি এখন তোমরা তা কার্যকর করবে। ওরা তো আকাশ থেকে পড়লো। দু'জনে একসঙ্গেই বলে উঠলো কেন? এই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আপনার। আমি বললাম, দেখুন, আপনারা কি ভাবছেন এই গাট্টি গাট্টি কাগজের নোট কাঁধে করে নিজেই নামিয়ে আমি ওতে আগুন ধরাবো? ওরা বললো না, তা হবে কেন? আপনার লোকজনকে নিয়ে করাবেন। আমি বললাম, আমার লোকজন বলতে আপনারা ছাড়া এখন তো আর কেউ নেই। মেজর একজন বললো, তার মানে? আপনার পুলিশ ফোর্স আছে, আপনার অফিসের লোকজন রয়েছে। জবাবে জানালাম, জনাব, উনলোগ কাঁহা হায় আভি। সবতো শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি বরং AID TO CIVIL POWER প্রয়োগ করে আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি এই টাকা কড়ি সব আপনারা বিনষ্ট করার ব্যবস্থা নিন। ওরা তো মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। আমাকে

বোঝাবার চেষ্টা করলো যে, বিগ্রেডিয়ার সাহেবের হুকুমেই তারা এসব করতে বলছে। এখন উপায় কি হবে? আমি বললাম, দেখুন, মেজর সাহেব, কেতাবে লেখা আছে যে কাঁচা টাকা-পয়সা হলে, সেগুলো শত্রুপক্ষ আসার আগে গালিয়ে ফেলতে হবে। বগুড়া শহরে জাহেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ হচ্ছে একমাত্র স্থান যেখানে "ব্লাস্ট ফার্নেস" আছে। ওটাতো এই মুহূর্তে বেকার। তাছাড়া ওখানে কোনো শ্রমিকও এখন পাওয়া যাবে না। অন্য কোনও মানুষ পাওয়া যাবে না। অতএব, "ব্লাস্ট ফার্নেস" চালু করার কথা ভুলেও তুলবেন না। এর বিকল্প হচ্ছে যে করতোয়া নদীতে এই কাঁচা টাকাগুলো ফেলে দেয়া। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তো নদী শুকিয়ে যাবে। তখনতো সবটা সম্পদই "শত্রুর" হাতে গিয়ে পড়বে। এবার ধরুন, কাগজের টাকার কথা। এই এতো "লক্ষ লক্ষ" নোটের বান্ডিল আপনারা কোথায়, কিভাবে, কাকে দিয়ে নামাবেন। আর মনে করুন, তা হয়তো সম্ভব হলো। কিন্তু এগুলো পোড়াবেন কি দিয়ে? এতো জ্বালানি কাঠ কোত্থেকে সংগৃহীত হবে? এসব কি চাট্টিখানি কথা? ধরুন যে, এসব আয়োজন না হয় হলো। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এসব ব্যাপারে আপনাদের চাইতে বেশি। আমার কথা একটু মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন। আপনারা আগুন ধরিয়ে যেইমাত্র নোট পোড়াতে থাকবেন তখন সেই আগুন এক বিরাট এলাকা জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন, আকাশ ছেয়ে শকুনের মতো ভারতীয় উড়োজাহাজ আপনাদের ওই এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন কেমন হবে? আর আপনারাই বা পালাবেন কোথায়? আমি তাই স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। আমি মিলিটারি অফিসার নই। পৈত্রিক প্রাণটা এভাবে খোয়াতে আমি রাজি নই। বরং টাকা পয়সা যেভাবে যেখানে আছে সেখানে থাক। এখন আমরা ফিরে যাই চলুন।

মেজর সাহেবদের টনক নড়লো। ওরা ততক্ষণে ঘেমে উঠেছে। মোল্লা মজীদ আমার দুরভিসন্ধি বুঝে একেবারে খল্লা মাছের মতো চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁটের কোণায় তাঁর স্বস্তির হাসি ছোবল মেরে গেল। তিনি ভাবলেন, হয়তো এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

মেজরদ্বয়ের মনে হলো বোধোদয় হয়েছে। তাঁরা বললো, ঠিক হ্যায়, হায় সমঝ গয়ে ইয়ে ইতনা সিধা কাম নাহি হায়। ব্রিগেডিয়ার সাহাবকা পাস যাকে রিপোর্ট তো করকে আয়ে। এই বলে ওরা সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে উধাও হয়ে গেল। ব্যাংকের স্ট্রং রুমটা প্রচণ্ড আওয়াজ করে বন্ধ করে দিলো ক্যাশিয়ার আর এ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমি মোল্লা মজীদকে নিয়ে ফিরে এলাম বাসায়।–

এদিকে প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে শহর জুড়ে। ত্রাহি অবস্থার মধ্যেও শহরে বেশ কিছু বিহারী লুটের রাজত্ব সৃষ্টি করলো। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আলবদর রাজাকাররা শহর থেকে কেটে পড়তে লাগলো। আমার 'লিয়াজোঁ-ম্যান' সেই ফার্নিচারওয়ালার মাধ্যমে কথা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সঙ্গে আলোচনা করে আমার পরবর্তি কর্মসূচি নির্ধারণ করবো। কিন্তু সেই ফার্নিচারওয়ালারও কোনও হদিস নেই। দিন গড়িয়ে রাত এলো। শহরে এক ভৌতিক নিস্তব্ধত নেমে এল। পাতা নড়ার শব্দটিও নেই। দূরে কখনো কখনো প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিলো, পৃথিবীটা ভূমিকম্পে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে

ফেটে পড়ছে। শহরের বাইরে যুদ্ধ চলছিল। একদিকে গগণ বিদীর্ণ করা তোপ কামানের শব্দ, অন্যদিকে ডিনামাইট আর বোমা বর্ষণের আওয়াজ। মনে হলো যেন এ রিয়েল ওয়ার চলছে। এরই মধ্যে রাত আটটার দিকে মোজাফফার ফোন করলো। মোজাফফারের পরিচয় দিয়ে রাখি এখানে। টেনিস লনে আমরা একসঙ্গেই খেলতাম। সে ছিল ওয়াপদার ইলেকট্রিসিটি বিভাগের টেকনিক্যাল অফিসার। ওর শ্বশুর ছিল সে সময়ের ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার অফ ফুড। মুজাফফার বললো স্যার ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি। আমার বাসার আঙ্গিনায় সৈন্য সামন্ত নিয়ে এক পাক সুবেদার হুমকি ধমকি শুরু করছে। সাত মাথায় নাকি বিদ্যুৎ লাইন ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। ওরা সন্দেহ করছে যে, ওপরে উড্ডীয়মান ভারতীয় উড়োজাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি এই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এখুনি সাতমাথায় গিয়ে লাইনটা ঠিক করে দিতে হবে। আপনার জিপ গাড়িটা পাঠিয়ে দিলে এই কাজটা সেরে আসতে পারি।

মোজাফফার কাকুতি মিনতি করতে লাগলো যেন অনতিবিলম্বে আমার জিপ গাড়িটা পাঠিয়ে দেই তাকে উদ্ধার করার জন্য। ও গাড়ি নিয়ে সাতমাথায় যাবে আর আসবে। নয়তো মহামান্য সুবেদার বাহাদুর মুহূর্তের মধ্যে তাঁর খুলি উড়িয়ে ধূলি করে ছেড়ে দেবে। মনে পড়ে গেল মোমেনশাহীর সহকর্মি সারওয়ার জাহান চৌধুরীর একটি কথা। সহকর্মী সারওয়ার জাহান চৌধুরী বলতেন, ভাইসাব, হিউম্যানিটি ইন ডিস্ট্রেস শুনলে আর কোনো কথা নেই। ব্যস, মানুষের ভালোর জন্য জানটা দিয়ে দিবেন। নিজেকে কুরবান করে দেবেন। মোজাফফারকে বাঁচাবার তাগিদে আমার একমাত্র বাহন লাল রংয়ের উইরিস জিপটা পাঠিয়ে দিলাম। এরপর শুরু হলো আমার অপেক্ষা করার মুহূর্ত। রাত আটটা গড়িয়ে ন'টা ছাড়িয়ে দশটা-এগারোটা-বারোটা-একটা। জেগেই আছি, আর অপেক্ষায় আছি কখন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরবে। অথচ মোজাফফার বলেছিল যে, সে সাত মাথায় যাবে আর আসবে। ওই বিপদ সঙ্কুল সময়ে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন যেন মুহূর্তের নোটিশে সটকে পড়তে পারি। অথচ একমাত্র বাহনটির কোনও হদিস নেই। রাত দেড়টায় টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের অন্যদিকে থেকে কর্কশ কণ্ঠে আওয়াজ এলঃ হাঁ জী! ডি.সি. সাহাব বোল রাহে হেঁ, কর্নেল সাঈদ। কর্নেল সাঈদ ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কমান্ডার। বগুড়া এলাকা জুড়ে তাঁর দায়িত্বসীমা। কর্নেল বললো, ইওয়ার ড্রাইভার ইজ উইথ আস। ইউ ডোন্ট ওয়ারি। হি শুড বি এবেল টু রিপোর্ট ব্যাক টু ইউ ইনদ্য মর্নিং। তথাস্তু বলা ছাড়া ওই অবস্থার কি আর গতি!

গাড়ির আশা সে রাতের মতো ছেড়ে দিয়ে ঘুমাতে গেলাম। ভোর হতেই দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ালাম আর অপেক্ষায় রইলাম শ্রীমান ড্রাইভার কখন আসবে। বেলা সাড়ে সাতটার দিকে শীতে জবুথবু হয়ে কালো ইউনিফর্ম পরে সদর দেউড়ি দিয়ে এসে ঢুকলো আমার ড্রাইভার। ওপরের দিকে তাকাতে চোখে চোখ পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, তুমি গাড়ি ফেলে চলে এসেছো কেন? প্রশ্ন করতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বর হয়তো একটু উচ্চমাপেই উঠে গিয়েছিল। গিন্নী তাই বেরিয়ে এসে বললেন, নিশ্চয় ওর কোনও সমস্যা হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা আগে শুনে নাও। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে, সে দেখি থর থর করে কাঁপছে। ঠিক যেন শৃগাল ধাবিত ভয়ার্ত এক

খরগোশ। ঠোঁট দুটো একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর। গাড়ির কি হলো-জানতে চাইলে সে এক বিরাট গল্প এনে হাজির করলো। ও বললো- সন্ধ্যায় আমি গাড়ি নিয়ে মোজাফফার সাহেবকে তুলতে গিয়ে দেখি সেখানে বন্দুক উচিয়ে একদল সেনাবাহিনীর লোক। আমি পৌছাতেই মোজাফফার সাহেবকে নিয়ে ওরা সবাই হুড়মুড় করে আমার গাড়িতে চেপে বসলো। গাড়ি ছুটালাম সাতমাথার দিকে। ওখানে গোলচক্করে আইল্যান্ডের ওপর মোজাফফার সাহেবকে দাঁড় করিয়ে ওরা যেন কি বলাবলি করলো। ঠিক সেই সময়ে সেই কর্নেল সাহেব মোজাফফার এবং আমার প্রতি হুকুম হলো তার সঙ্গে বগুড়া কলেজ ঘাঁটিতে গাড়ি চালিয়ে যেতে। সেনাঘাটিতে অনেক রাত অবধি আটকে রেখে তারা তাকে ওদের ট্রুপের সঙ্গে নিয়ে গেল কাটাখালী ব্রিজের দিকে। রাত দু'টা নাগাদ ওই ব্রিজের কাছাকাছি পৌছাতেই শুরু হলো বিপক্ষীয় আক্রমণ। তারা আমার গাড়ি ছেড়ে নামতেই আমার ড্রাইভারের দু'পায়ের মধ্য দিয়ে একটা গুলি ছুটে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির আড়ালে আশ্রয় নিল। দেখতে না দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট আওয়াজ তুলে বিরাট ব্রিজটা সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়লো। গোলাগুলিও থেমে গেল। কোত্থেকে পাক সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন আমাকে ওদের গাড়িতে উঠতে নির্দেশ দিলো। তাঁকে নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে শহরের দিকে আবার ফিরে আসতে লাগলো। শহরে ঢুকতেই গাড়ি থামাতে বলে গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে ড্রাইভার আমাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলো। ক্যাপ্টেন বলে দিলো যে, তোমার গাড়ি পরে পাবে। এখন সটকে পড়ো। এখন তোমার জান সামলাও। এই পর্যন্ত বলে ড্রাইভার আবার হাঁপাতে শুরু করলো এবং একেবারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লো।

ড্রাইভারের এই গল্প অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। যা হোক, সে বেচারার হাল দেখে বড়ো মায়াই হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ হলো এই যে, কোনো জরুরি অবস্থাতেই আমার আর কোথায় চলে যাবার পথ থাকলো না। বাহনই যদি না থাকলো আমি কোথায় যাবো, কিভাবে যাবো। এখন সম্বল কেবল সেই ডাটসান গাড়িটা। কিন্তু এমন অবস্থা যে, ওটাকে ধাক্কা না দিলে ওটা স্টার্ট নেয় না।

ড্রাইভার তো আমার জিপ পাক সেনার কাছে সমর্পন করে এল, এখন আমরা যাই কোথায়? সেদিন ১৩ ডিসেম্বর। সকালের দিকে মেজর সালমান মাহমুদ আর মেজর ইকবাল এল বিগ্রেডিয়ার তোহাম্মেলের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে। আমরা যেন তাদের সঙ্গে যাই। বললাম বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারছি না, What do you mean? আমরা কি লটবহর নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসবো?

সালমান জানালো যে, নির্দেশ অনেকটা তাই। জবাবে বললাম, আপনি এমন এক প্রস্তাব দিচ্ছেন যে, আমি তাতে মোটেও সাড়া দিতে পারছি না। যদি এই মুহূর্তে শহরের অবস্থা তেমন সঙ্গীন হয়ে ওঠে, তবে আমি তো আশ্রয় নেবো আমার নিজস্ব লোকের কাছে আপনাদের কাছে কেন?

মেজর সালমান আর মেজর ইকবাল অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ওদের মধ্যে কে যেন একজন প্রশ্ন করে উঠলো- Do you think that you would feel safe if you look for shelter in the villages? জবাবে বললামঃ Why

not? I would be going to my own people, তোমরা কি ভেবেছ, ওদের সঙ্গে আমার কোনও যোগসূত্র নেই? এতদিন যে তোমাদের যুদ্ধের এত কাহিনী শোনালাম, আমার সোনার বাংলা গান শেখলাম, মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার বর্ণনা দিয়ে এলাম, এদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করলাম, এসব থেকে কি তোমরা একটুকু আঁচ করতে পারনি আমি তোমাদের কি বলতে চেয়েছি? আমাকে তোমরা এই মুহূর্তে হয়তো ফিফথ কলামনিস্ট ভাবতে পারো। কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে যে, আমি রক্তেমাংসের বাংঙালি। অতএব, তোমরা এখন চলে যেতে পারো। তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ। সালমান ও ইকবাল তখন হেলমেট আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রীতিমতো "যুদ্ধ-যুদ্ধ" রূপ নিয়ে আমার উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। হঠাৎ ওরা বলে উঠলো, তাহলে ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

অল্প সময় পর ওরা ফিরে এসে বললো, ব্রিগেডিয়ার বলেছেন স্টেট ব্যাংকের সব টাকা পয়সা ধ্বংস করে দিতে। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা এবার আর সময় অপচয় করবো না। ক্রাইসিস আওয়ার এসে গেছে। ব্যাংকের ম্যানেজার মোল্লা মজীদ আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকালেন। আমি বললাম, চলুন যাই বাঙ্গালির বুদ্ধির তো ঘাটতি নেই। আমি সামলে নেবো, আপনি ঘাবড়াবেন না। ব্যাংকের ভেতর ঢুকতেই আবার স্ট্রংরুমের চাবির কথা উঠলো। সেই দাড়িআলা দারোয়ান নিজের থেকে ট্রেজারার আর অ্যাকাউন্টকে খুঁজতে গেল। কিন্তু সেদিন ওর দুর্ভাগ্য। দু'জনের একজনও শহরে নেই। ঘরবাড়ি তালাবদ্ধ করে চলে গেছে গ্রামে। মেজররা জিজ্ঞেস করলো, কোন গ্রামে? দারোয়ান বললো, শাবরুল। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চলুন শাবরুল থেকে ওদের নিয়ে আসি। বললাম, মাথা খারাপ। আমি কি আপনাদের মত মিলিটারি অফিসার নাকি? শাবরুলের এই ছয় মাইল পথে প্রতি ফুটে মাইন পুতে রাখা হয়েছে। আমি এত সহজে মরতে রাজী নই। আমার পৈতৃক জানটা আমার বড়ো প্রিয়। দেখলাম মেজর সালমান একটু ভড়কেই গেছে। বললাম, কোই পারওয়া নাহি হ্যায়। ডিনামাইট দিয়ে ব্যাংকটারে উড়িয়ে দিন। ওরা দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, ডিনামাইট কোথায়? আমাদের ডিনামাইট বা ওই ধরনের কোনও ব্যবস্থাই নেই। আর লোকবলই বা কোথায় এসব কাজ করার, এহেন অবস্থায় ব্যাংক প্রাঙ্গণ থেকে প্রস্থান করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। আমার সঙ্গে ওরা আমার বাসায় চলে এল। হঠাৎ সালমান আমার আর্দালী পিয়নকে ইশারা করলো আমার মেয়ে ফারযানাকে নিয়ে আসতে। আর্দালী আমার দিকে তাকাতে আমি ওকে নিয়ে আসতে বললাম। ফারযানাকে কোলে নিয়ে মেজর সালমান ওর দু'গাল চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো। আর ওর দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে এল। অন্তিম মুহূর্তে এসে গেছে এ কথা ভেবে হয়তো। ঠিক ফারযানার বয়সী ওর নিজের মেয়ের কথা ওর মনে পড়ে গেছে। সময় নষ্ট না করে আমাদের দ্রুত শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে ওরা গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়ি ছাড়বার আগে হাত তুলে বিদায় দিতে বললো, 'ইনশাল্লাহ ফের মিলেঙ্গে'।

ওরা চলে যেতেই সহধর্মিনী মাকসুদাকে বললাম চলো, আর দেরী নয়। আগেই বলেছি যে, শ্রম দপ্তরের যুগ্ম পরিচালক আব্দুর রহমান গ্রামে গিয়ে তাঁর ডাটসান ১৩০০

আমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ড্রাইভার তখন একজনই ছিল। সেও উধাও। তাড়াহুড়ো করে এক কাপড়ে মাকসুদা ও ফারযানাকে নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবো, এমন সময় করীম নামে এক ভদ্রলোক এসে হাজির।

করীমের পুরো নাম ছিল ফজলুল করীম। স্থানীয় বর্ষীয়ান নেতা ডাক্তার হাবিবুর রহমানের আত্মীয় এবং আমার বন্ধু ও ভায়রা মঈনুদ্দীন মাহমুদের (বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের ছেলে) অন্তরঙ্গ বন্ধু, বগুড়ায় পাটের ব্যবসায় জড়িত ছিল। ভদ্রলোক একটি পুরানো ভোকসল-সুপার ১০১ গাড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ওর সঙ্গে এস,পি আওলাদ হোসেনেরও কি একটা আত্মীয়তা ছিল। এদিকে এস,পি, আওলাদ হোসেন তাঁর বিরাট পরিবার নিয়ে আমার সঙ্গে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার দশটি কন্যা। একজন বিবাহিতা ও তার সঙ্গে ছিল দুধের শিশু। বেচারীর স্বামী করাচীতে আটকে ছিল। তাদের সবাইকে একত্র করে করীমের পথ নির্দেশে আমরা ছুটলাম। যে ভুলটা করেছিলাম, তা হলো আমার সহকর্মীরা কোন গ্রামে গিয়ে আস্তানা নিয়েছিলেন বা ড্রাইভার তাদের কোথায় নামিয়ে দিয়ে এসেছে, সে খবরটা আর কেউ আমাদের বলেনি। তাই করীমের নেতৃত্ব গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। রওয়ানা হবার আগে এস,পি'র দুই বিহারী বডিগার্ড আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আবদার করলো। একেই যাচ্ছিতো লক্ষ্যহীন পথে হয়তো কোন গ্রামে, আবার বিহারীদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এতো এক মহাবিপদ। আর এমন বিহারী ব্যাটারা-দেখতে একেবারে খাঁটি পাঞ্জাবীদের মতো। অসহায় মানুষ দুজন। নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় চাচ্ছে। 'না' বলা ঠিক হবে না-মনুষ্যত্ব বলেতো একটা জিনিস আছে। 'ঠিক হায়' চলো আমাদের সঙ্গে। যা হবার হবে। বলে ওদেরও সঙ্গে নিয়ে নিলাম। এদিকে গাড়ির অবস্থা তো করুণ। সেল্ফ স্টার্টার, নষ্ট। দুটো ছেঁড়া তার জোড়া লাগিয়ে গাড়ি চালু করতে হয়। চাবিতে অটোমেটিক স্টার্ট নেবে না। মোল্লা মজিদ, আমি, মাকসুদা, ফারযানা, করীম, আওলাদ হোসেন আর তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চললাম এক সঙ্গে। এস.পি আর তাঁর পরিবার পরিজন তাঁর জিপে, করীম আরো কয়েকজনকে নিয়ে তার ভোক্স হল সুপার-১০১ এ, আর আমি সপিরবারে ডাটসান-১৩০০ তে।

শহর ছেড়ে তখনো বাইরে এসে পড়িনি। চারদিকে বোমা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজ। দুটো ভারতীয় প্লেন ওপর দিয়ে উড়ে যেতেই গাড়ি থেকে নেমে ইশারা করলাম বলতে চাইলাম আমরা শত্রু নই, কে জানে ফট করে যদি গুলী করে দ্যায়। একটা কাঠের পুল অতিক্রম করতে গিয়ে ডাটসান-১৩০০ বিদ্রোহ করে বসলো। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে ব্যাটারি ডাউন হয়েছিল। ধাক্কা মেরে গাড়িটাকে চালু করতে হয়েছে। এখন আমার পথে যদি রুখে যায় তাহলে উপায় হবে কী। আল্লাহ মেহেরবান। গাড়িও ক্ষেপে গেছে। ধাই করে কাঠের পুলের উঁচু বাধা উতরে চলে এলেন পুলের ওপারে দ্বিগ্বিজয়ী বীরের মতো। সেই যে ছুটলাম, তো ছুটলাম, অন্য কোনদিকে আর তাকাইনি। নাটোর রোডে পড়ার পর দেখি পাক সেনাদের ট্রাক একটার পর একটা ছুটছে নাটোরের দিকে। কয়েকটি ট্রাক থেকে এলোপাতাড়ি গোলাগুলির ফলে আশে-পাশের গ্রামের কিছু লোক আহত ও নিহতও হয়েছিল বলে পরে জানা গেছে। ওপরে উড়োজাহাজ একপক্ষের আর নিচে

অন্যপক্ষের বন্দুক দাগানো। গাড়ি এমনি অবস্থায় আমাদের গাড়িগুলো প্রাণে বাঁচার গতিতে ছুটে চলছিল। নাটোর রোডে দশমাইল অতিক্রম করবার পর হঠাৎ করীমের গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিয়ে এবড়ো থেবড়ো কাঁচামাটির পথে নেমে গেল। সেই সঙ্গে আমার ডাটসান-১৩০০ আর, এস,পি উইলিস জিপ। এই দুই গাড়িও চললো বিদ্যুৎগতিতে। কখনো ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে, কখনো আলের ওপর দিয়ে আমরা ছুটছি তো ছুটছিই। এমন হালের গাড়িটা কি চমৎকার চড়াই উৎরাই পার হয়ে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলছিল। কিছুদূর আসার পর এক গ্রামে এসে আমাদের গাড়ি তিনটে থামলো। আমাদের আসতে দেখে গ্রামের মানুষগুলো আপ্যায়নের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভীড়ের মধ্যে দেখি আনসার এ্যাডজুট্যান্ট শামসুজ্জামান দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গাড়ি থেকে আমাদের নামতে দেখে তিনি তো অবাক। আমরাও খুব ভরসা পেলাম যাক একেবারে অপরিচিতদের মধ্যে এসে পড়িনি। তিনিই এগিয়ে এসে একটি বাড়ির ভেতরে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাড়িটা ছিল এক স্কুল হেডমাস্টারের। কম হলেও বাড়িটাতে রেলগাড়ির মতো একের পর এক উনিশ-বিশটা ঘর ছিল। হেডমাস্টার সাহেব মারা গিয়েছিলেন অনেক আগেই। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রহণ করলেন। আমরা একটা ঘর পেলাম। ভেতরটা চমৎকারভাবে দুইতিন রঙের মাটির প্রলেপ দিয়ে রঙ করা, সাজানো গোছানো। দেয়ালের সঙ্গে সাঁটানো বাঁশের খুঁটি নিখুঁত ভাবে লাগানো ছিল। তাই আমাদের আর চৌকি বা খাট জোগাড়ের ঝামেলা করতে হয়নি।

বগুড়া থেকে প্রায় দশমাইল দূরে-শান্ত সমাহিত রূপ এই বনভিটি গ্রামের। খর্না ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত এই গ্রামটি। যে বাড়িতে আমরা আশ্রিত ছিলাম তার মালিক মরহুম সৈয়দ আলীর স্ত্রী নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন সাহসী মহিলা। বর্ধিষ্ণু পরিবার তাঁদের। এপ্রিল '৭১ থেকেই সেই একটা বাড়িতেই প্রায় ২৩টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলো। এরপর আবার জুটলাম আমরা। সবাই মিলে এক বিরাট দল। আমার স্ত্রী অল্প সময়ের মধ্যেই সুন্দর সংসার গুছিয়ে নিলেন। এটা ওর স্বভাবজাত। মোল্লা মজীদ আমাদের অতিথি হিসেবেই থাকলেন। তাঁকে একটা পৃথক ঘর দেয়া হলো। গল্পগুজব করে, জাতীয় সমস্যার আলোচনা করে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ছক এঁকে আমাদের প্রায় দিন দশেক বনভিটি গ্রামেই বাঁচতে হয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর। রেডিও ঝনঝনিয়ে উঠলো। মনে হলো কোটি কোটি বাঙালি সমস্বরে ঘোষণা দিয়ে উঠেছে "বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ মুক্ত।" পাকসেনাবাহিনী ঢাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বাংলাদেশ মুক্ত এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে। আট কোটি বাঙালি মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। কি অদ্ভুত আনন্দ লাগলো। আমরা আত্মহারা হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। শহর থেকে এতদূরে এই নির্জন পল্লীতে স্বাধীনতার স্বাদ যেন মেটাবার কোনও সুযোগ নেই। তাই মনটা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। উসখুস করতে লাগলাম শহরের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বিকাল ৪-১০ মি. মুক্তিবাহিনী ও তার সহযোগী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষর করলেন পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং

ভারতিয় ইস্টার্ন কমান্ডের জি,ও,সি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। এই আত্মসমর্পণ হয়েছিল বিনাশর্তে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সে সময়ের বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান আবদুল করিম খন্দকার। মনযূর উল করীম সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব।

লেখক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (২৪-০৭-১৯৭১ থেকে ২৩-১২-১৯৭১) বগুড়ায় জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

[তথ্যসূত্র : মুক্তপ্রাণের আড্ডা। বিজয় দিবস সংখ্যা - ২০০৭ বগুড়া জেলা প্রশাসন। মহান মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি]

স্মৃতিচারণ

১৯৬৭ সালে আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। ছোট বেলা থেকেই ছাত্র রাজনীতি আমার খুব ভালো লাগত। তৎকালীন বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবর্গ মরহুম আব্দুস সামাদ ও মরহুম খাদেমুল ইসলাম তাদের সুসাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন "বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দক্ষিণ বগুড়া আঞ্চলিক শাখা" গঠন করেন। সেই সংগঠনে আমি ছাইদুজ্জামান তারা সভাপতি ও আমার সহপাঠি আব্দুল মান্নান সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্বে ছিলাম। '৬৯ সালে এস, এস, সি পাশ করি। '৬৯ এর ছাত্র গণআন্দোলন ও '৭০ এর নির্বাচনে একজন কর্মি হিসাবে কাজ করি। এর মূলে ছিলেন আমার মামাতো ভাই এ, কে, মজিবুর রহমান তৎকালীন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক, বঙ্গবন্ধু তাকে মিতা বলে ডাকতেন।

'৭১ এর জানুয়ারি মাস, বঙ্গবন্ধুর ডাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। আমার বড় বোন জেবুন নেছা বেগম তার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকত। সেই সুবাদে আমি '৭১ এর জানুয়ারি মাস থেকে ঢাকা আগারগাঁও আমার বোনের বাসায় থাকতাম। ঢাকায় থাকাকালীন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন কর্মি হিসাবে বিভিন্ন কাজে যোগদান করি। তৎকালীন ঢাকা সিটি ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব মনিরুল হক মনির সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। যার প্রেক্ষিতে ঢাকায় ছাত্রলীগের যে কোনও কর্মকাণ্ডে একজন কর্মি হিসাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। '৭১ এর মার্চ মাসের প্রথম থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ঢাকার তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে অস্ত্র চালানোর শিক্ষা শুরু হয় সেখানে আমি অংশগ্রহণ করি। সেখানে ছাত্রনেতা ঢাকা কলেজের ভি,পি আব্দুল আজিজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেই অস্ত্র শিক্ষার সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ঢাকার ছাত্রনেতা "মার্শাল মনি" ভাই ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ। সেখানে শরীরচর্চাসহ ডামি রাইফেল দিয়ে যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের বঙ্গবন্ধু ও মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র জনতা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে পল্টন ময়দানের দিকে যাচ্ছিল। আগারগাঁও এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ও জনতার একটি মিছিল পল্টন ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, আমি সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করি।

রাস্তার পার্শ্বে মাঝে মাঝে পাক হানাদার বাহিনী পাহারা দিচ্ছে। আমাদের মিছিলটি আস্তে আস্তে ফার্মগেটে পৌঁছলে পাক বাহিনীর একটি গাড়ি এসে ফার্মগেটে পৌঁছে। তখন পাহারারত পাকবাহিনী এবং গাড়িতে আসা পাকবাহিনী মিলিত হয় এবং একপর্যায়ে মিছিলকারিদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে তখন বেলা আনুমানিক ৩টা। ফার্মগেট অগ্রণী ব্যাংক বরাবরে মিছিল নিয়ে আমরা এগোতে থাকি। তখন আকস্মিকভাবে পাক বাহিনী গোলাগুলি শুরু করে। তখন আমার পার্শ্বে থাকা একজন সংগ্রামী বন্ধুর বুকে গুলি বিদ্ধ হয়। গুলি লাগার সাথে সাথে লোকটি কাতরাতে থাকে। আমরা তাকে ড্রেনের মধ্যে থেকে অনেক কষ্টে উপরে তুলি। লোকটির গা রক্তে লাল হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় আহত লোকটি নিজের রক্ত তার ডান হাতের আঙ্গুলিতে নিয়ে ব্যাংকের দেয়ালে ৩/৩৭১ লেখে এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তখন আমরা তাঁর লাশ কাঁধে নিয়ে মিছিল সহকারে পল্টন ময়দানের দিকে যাওয়া শুরু করি এবং লাশ সহকারে সভাস্থলে পৌঁছি।

৭ মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভা। তখন সারা ঢাকায় মানুষের ঢল। শুধু মিছিল আর মিছিল। আমি একইভাবে আগরগাঁও এলাকার ছাত্র, জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে মিছিল করতে করতে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হই। আমার মনে আছে রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতার ভিড়, বঙ্গবন্ধু মঞ্চে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুকে ভালো করে দেখার জন্য মঞ্চের ডান দিকে মাটিতে বাঁশের যে বেড়া দেওয়া আছে সেই বেড়ার মধ্যে আমি বসে পড়েছি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুরু হয়েছে, কিছুক্ষণ ভাষণ দেওয়ার পর বিকট শব্দের একটি প্লেন আসে এবং ঢাকা বিমান বন্দরে তা অবতরণ করে। আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সেই প্লেনে পাকিস্তানের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছেন মাঝে মাঝে উপস্থিত জনতা তাদের হাতে থাকা মিছিলের লাঠি বাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার সঙ্গে একাত্বতা ঘোষণা করছেন।

৭ মার্চের কয়েক দিন পর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শেষ করে বাসায় ফেরার পথে ফার্মগেটে বাস থেকে নেমে দেখি আগারগাঁ যাওয়ার কোনও রিক্সা নাই। তখন পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম, রাত আনুমানিক ৯টা, বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আবহাওয়া অফিসের কাছে যেতেই দূর থেকে দেখি একজন লোককে পাক আর্মিরা ভীষণ ভাবে মারপিট করছে। মারপিট শেষ করে কিছুক্ষণ পর উক্ত লোককে অজ্ঞান অবস্থান রাস্তায় ফেলে দিয়ে বিমান বন্দরের ভিতরে চলে যায়। তখন আমি ঐ আহত লোকটার কাছে যাই এবং আরো একজন পথচারীর সহযোগিতায় তাকে সেকেণ্ড ক্যাপিটাল মার্কেটের কাছে নিয়ে যাই। সেখানে আওয়ামী লীগের কয়েক জন কর্মি উক্ত আহত লোককে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলে। আমি উক্ত আহত ব্যক্তিকে নিয়ে ধানমণ্ডি ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। তখন বঙ্গবন্ধু তাঁর দোতলার ড্রাইং রুমে আওয়ামী লীগ নেতা বর্তমানে মরহুম কোরবান আলী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আমি কিছু বলার আগেই বঙ্গবন্ধু বললেন, "আরে বগুড়ার লোকের খবর কি? আমার মিতা কেমন আছেন? আমি তো শুনে হতবাক। বঙ্গবন্ধুর মিতা মানে আমার মামাত ভাই এ, কে, মজিবুর রহমান বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার পর

আমি ঐ আহত লোকটির কথা বিস্তারিতভাবে বললাম। তখন বঙ্গবন্ধু আমার বুকে থাবা দিয়ে বলে উঠলেন যে, "এই রকম বেশ কয়েক জন লোককে অহেতুক ওরা মার ধর করছে। যা তোরাও প্রস্তুত হয়ে যা। মারের বদলে মার দিতে হবে।" তারপর বঙ্গবন্ধু পকেট থেকে ২০টি টাকা বের করে দিলেন। বেবি টেক্সি ভাড়া এবং ঐ আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করার জন্য। যাইহোক ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে আমাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এইভাবে দেখতে দেখতে কয়েক দিন চলে গেল।

আমাদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তাতে বগুড়ার শহীদ চিশতী শাহ হেলালুর রহমান প্রধান দলপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। হেলাল ভাই আমার খুব পরিচিত, কারণ আমার বগুড়া শহরের বাড়ির পার্শ্বেই ছিল হেলাল ভাইয়ের বাড়ি। সেই জন্য ছোট বেলা থেকে আমি তাকে চিনতাম। আমার পরিচিত বগুড়ার আরও একজন ছাত্র ছিলেন যার নাম শাহ আলম, আমি অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের পর তাকে কোনো দিন দেখি নাই। ২২ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত ট্রেনিং চলার পর রাতে মনিরুল হক মনি ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের "শাসনতন্ত্র দিবস" তাই উক্ত ২৩ মার্চে "প্রতিরোধ" দিবস পালন করা হবে। সেই মর্মে আমাদের নেতৃবর্গ বলে দিলেন যে, আগামীকাল সকালে সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট ও সাদা জুতা পায়ে সকাল ৭টার মধ্যে পল্টন ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি সেই মোতাবেক সকাল ৭টায় পল্টন ময়দানে উপস্থিত হলাম। সেই দিন পল্টন ময়দানে মার্চ পাস্ট করার জন্য ৩৩ জন করে দাঁড়িয়ে ১১টি গ্রুপ করা হয়। আমি অবশ্য ১১নং গ্রুপের দায়িত্বে ছিলাম। আমাদের প্রধান দলপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন শহীদ চিশতী শাহ হেলালুর রহমান। প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে "মার্চ পাস্ট" এ গার্ড অব অনার নিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতা আ, স, ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম ছিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুছ মাখন এবং সিটি ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল হক মনি ভাই। গার্ড অব অনার প্রদান করার পর একটি ডামি করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতা খসরু মন্টু ও সেলিম ভাই। তাঁরা পাকিস্তান আর্মি হন এবং আমরা মুক্তিবাহিনী হিসাবে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকিস্তান আর্মিরা মৃত্যুবরণ করে। আর মুক্তি বাহিনীরা জয়লাভ করেন। কুচকাওয়াজ এবং ডামি শেষ করে নেতৃবর্গের নির্দেশে আমরা পায়ে হেঁটে মার্চ করতে করতে পল্টন ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ির দিকে রওনা হই।

সেই দিন আমাদের আরো উৎসাহিত করার জন্য গায়ক আব্দুল জব্বার হাত মাইকে জয় বাংলা বাংলার জয় সহ বিভিন্ন দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করতে করতে আমাদের সংগে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা হন। বেলা ২টার পর আমরা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাই। তখন বঙ্গবন্ধু তাঁর ছাদ থেকে ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনে আমরা যার যার গন্তব্য হল না গাবতলী বিউটি সিনেমা হল পার হতে না হতেই কয়েক জন লোক হাত নেড়ে নিষেধ করছে যে, আপনারা মিরপুর ব্রিজের দিকে যাবেন না। কারণ ওখানে বিহারীরা বাঙ্গালিদের ধরছে আর জবাই করছে। তখন আমি লক্ষ করলাম দূর থেকে কিছু লোক ওখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের

মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা। সাদা কাপড় বেঁধে চিহ্নিত করছে যে এরা বিহারী এবং তারা পাক আর্মিদের দলের লোক। আমাদের আর যাওয়া হলো না। আমার চাচা গাড়ি ফিরিয়ে নিল, তখন কি করা যায়, সময় আর নাই। এখনই আবার কার্ফু দিয়ে দিবে। অনেক চিন্তা করে আমার চাচা বললেন যে, চল আমার এক বন্ধু আছে কলাবাগানে থাকে তার বাড়ি এমন ছোট গলির মধ্যে যে পাক আর্মিদের গাড়ি ওখানে যাবে না। এখন অন্তত ওখানে গিয়ে ওঠা যাক তারপর ব্যবস্থা হবে। সেই হিসাবে চাচার বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার মাহবুর সাহেবের বাসায় যাওয়া হলো। সেখানে রাত্রি যাপন করা হলো।

২৭ মার্চ আবার কার্ফিউ শিথিল হলো মাত্র ১ ঘণ্টার জন্য। ঐ ফাঁকে শুধু জীবনে বেঁচে থাকার কারণে, আমার বোন, দুলাভাই চাচাসহ আমরা পালিয়ে চলে গেলাম বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে, পায়ে হেঁটে আঁটি নামক স্থানে। ঐখানে আমরা রাত্রিযাপন করলাম। আঁটির হাট থেকে মাটির পাতিল কিনে তাতে রান্না করে খাওয়া হল। পরের দিন ২৮ মার্চ সকাল থেকে চিন্তা যে, কি করে যাওয়া যায়। তার পর একটা নৌকা ভাড়া করলাম, সাভার পার করে নয়ারহাট পর্যন্ত। সেই মোতাবেক নৌকা যোগে রওনা দেওয়া হল। নদী পথে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম বহু লাশ ভেসে যাচ্ছে। এমন কি বেশ কয়েকটি লাশ আমরা ঠেলা দিয়ে পার হয়ে চলে এলাম। নয়ারহাট নদী পার করে আমাদের নৌকা থেকে নামিয়ে দেয়। তারপর নয়ারহাট থেকে ট্রাক যোগে চলে এলাম আরিচা ফেরিঘাটে। ফেরিঘাটে একটামাত্র ফেরি আছে কিন্তু তাতে তেল নাই। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম একটামাত্র ফেরি আর ওখানে উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার লোক পার হওয়ার অপেক্ষায় আছে। যাই হোক যাত্রীগণই অনেক কষ্ট করে তেল এর ব্যবস্থা করল এবং ঐ ফেরিতে করেই নগরবাড়ী চলে গেলাম। নগরবাড়ী আসার পর সত্যিই বুকটা যেন ফুলে উঠল কারণ নগরবাড়িতে দেখি বাংলাদেশের নতুন পতাকা পত পত করে উড়ছে। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্রলীগের ছেলে পেলে ট্রাকের ব্যবস্থা করে যাত্রিগণকে যাতায়াতে সহযোগিতা করছে। ট্রাকের মাধ্যমে অতি কষ্টে আমরা সন্ধ্যায় বাঘাবাড়িতে পৌছিলাম। বাঘাবাড়ি থেকে শাহজাদপুর আসা হলো রিক্সা করে। শাহজাদপুর কলেজে আমরা রাত্রিযাপন করলাম। তারপর শাহজাদপুর থেকে কখনও পায়ে হেঁটে কখনও রিক্সায় এইভাবে কষ্ট করে চান্দাইকোনা নামক স্থানে এসে আবার রাত্রিযাপন করা হল। এইভাবে কষ্ট করতে করতে ১ এপ্রিল আমরা আমাদের দেশের বাড়ি বগুড়ার দক্ষিণে ডেমাজানীর ঝালোপাড়া গ্রামে পৌছিলাম। তখন সকাল অনুমান ১০টা বাজে।

আমরা বাড়ি গিয়েই দেখতে পাই যে দক্ষিণ বগুড়ার আড়িয়া বাজার সেনানিবাসের প্রায় ১৮/২০ জন বাঙ্গালি সৈনিক আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছে। আমাদের বাড়িতে বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর লোকদের জন্য রুটি ও খাবার তৈয়ার করা হচ্ছে। তখন বাঙ্গালী সৈনিক নায়েক শহিদুলের মুখে আড়িয়া বাজার সেনানিবাসের অর্ডিনেন্স ডিপুর বিস্তারিত সংবাদ শুনলাম। নায়েক শহীদুল আমার হাতে একটা রাইফেল তুলে দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেনানিবাসের দিকে রওনা দিল। তারপর বাঙ্গালি সৈনিক এবং মুক্তিবাহিনী ছাত্র-জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে সেনানিবাসে অবস্থানরত পাক আর্মিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করি।

দীর্ঘক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পাকসেনারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে ছাত্রলীগের নেতা মাসুদ শহীদ হন। সুবেদার মেজর আলী আকবরসহ বাঙ্গালি সৈনিক এবং মুক্তিবাহিনীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আড়িয়া বাজার সেনানিবাস থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ আমরা বগুড়া পুলিশ লাইনে পৌছে দিই। পাকিস্তানি সৈনিকদের আটক করে বগুড়া জেলখানায় পাঠান হয়। পরবর্তিতে অবশ্য তাদের মুক্তিবাহিনীরা মেরে ফেলে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পাক বাহিনীর সঙ্গে এই আমার প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জেলার ছাত্র, জনতা, শ্রমিক, অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। আড়িয়া বাজার সেনানিবাসের ঐ যুদ্ধে অনেক অস্ত্র এদিক সেদিক চলে যায়। ২রা এপ্রিল থেকে অত্র এলাকায় আমি এবং আমার সংগঠনের ছেলেদের নিয়ে সেই সব অস্ত্র খুঁজে খুঁজে বের করে বগুড়া পুলিশ লাইনে নিয়ে গিয়ে জমা দেই। এপ্রিল মাসে বগুড়ায় কোনও পাক আর্মি ছিল না। ১৯ এপ্রিল পাক আর্মি বগুড়ায় ঢুকে পড়ে। তখন আমি এবং এক বড় ভাই আহমেদুর রহমান টুনু, ২০ এপ্রিল সকালে একসঙ্গে ভারতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে রওনা দেই। পথিমধ্যে মহাস্থানের ধাওয়া গ্রামে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গোলাম জাকারিয়া রেজাদের বাসায় রাত্রিযাপন করি।

পরের দিন আবার পায়ে হেঁটে মঙ্গলবাড়ী বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য যেতে থাকি। পথিমধ্যে বগুড়ার শহীদ সুফিয়ান এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগের সম্মানিত এম.এন.এ ডা. জাহিদুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা হয়। তখন বগুড়ায় জামাত ও শান্তি কমিটির লোকজন পথচারিদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে, মারধর করে পাক আর্মিদের ধরিয়ে দেয়। আবার কখনও কখনও লুটপাট করে মেরে ফেলে। সেই কারণে আমি, টুনু ভাই এবং সুফিয়ান একসঙ্গে ডা. জাহিদুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ নিয়ে মঙ্গলবাড়ি বর্ডার দিয়ে ভারতের বালুরঘাটে প্রবেশ করি। ভারতে প্রবেশ করার পর প্রথমে বালুরঘাটে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ. কে. মজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ভারতে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের একটা পরিচয় পত্র প্রদান করেন। আমি প্রথমে ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক কাজে যোগদান করি। তারপর বি, এল, এফ মুজিব বাহিনী হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জেলার তান্দুয়া ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ২৮ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে, বি, এল, এফ এর উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর কমান্ডার সিরাজুল আলম খাঁন (সরোজদা) এর মাধ্যমে ৭নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার ভারতের তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র নিয়ে গ্রুপ লিডার আব্দুল্লাহেল কাফীর সঙ্গে বগুড়া জেলার ধুনট থানা, সারিয়াকান্দি থানা, দক্ষিণ বগুড়া এবং শেরপুর থানা এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। কাফির গ্রুপে আরো ছিল, আমার মামাত ভাই, লিয়াকত আলী, আব্দুল মান্নান ও শহীদ মোখলেছুর রহমান, আব্দুল হালিম (লাড্ডু) এবং সুশিলচন্দ্র দাস সহ ১০ জন। পরবর্তীতে এই গ্রুপে মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯ জনে। এই গ্রুপে সেকেণ্ড ইন কমান্ডের দায়িত্ব পালন করেন লিয়াকত আলী। অক্টোবর মাসের আনুমানিক ১৭ তারিখ দিবাগত রাতে দক্ষিণ বগুড়ার নয় মাইল

নামক স্থানে সম্মুখযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমার সহযোদ্ধা শহীদ মোখলেছার রহমান মন্টু শহীদ হন। আরও শহীদ হন আড়িয়া গ্রামের শহীদ মকবুল হোসেন।

অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহে দক্ষিণ বগুড়া এলাকায় মহাসড়কে অপারেশন করার উদ্দেশ্যে আমরা ধুনট এলাকা থেকে প্রস্তুত হয়ে চলে আসি। সারা রাত হেঁটে আসার পরে, ধুনট থানার পশ্চিম এলাকা নিমগাছি নামক গ্রামে অবস্থান গ্রহণ করি। এদিকে নিমগাছি গ্রামের পার্শ্বের গ্রাম নান্দিয়ান পাড়ায় ঐ দিন খুব ভোরে পাক হানাদার বাহিনী আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গ্রামে নিরীহ লোকজনদের উপর অত্যাচার শুরু করে। ঐ গ্রামে আমাদের সহযোদ্ধা প্লাটুন কমান্ডার মরহুম আব্দুস সবুর সওদাগর তার দল নিয়ে অবস্থান করছিল। আকস্মিকভাবে পাক বাহিনী আসায় তারা কিছু বুঝে উঠতে পারে নাই। যার প্রেক্ষিতে ঐ দিন আমাদের গ্রুপ, সবুর ভাইয়ের গ্রুপ সহ আরো অনেক সহযোদ্ধা ভাইদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকাল থেকেই পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটে গিয়ে ধুনট থানায় চলে যায় এবং বগুড়া জেলা হেড কোয়াটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও কয়েক প্লাটুন পাক আর্মি নিয়ে এসে আবার আমাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়। সারা দিন যুদ্ধ করার পর যখন সন্ধ্যা হয় তখন পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটে যায়।

সে সময় আমরাও খুব ক্লান্ত। দিন রাত কোনও খাওয়া দাওয়া নেই। যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে ঐ জায়গাটা ধুনট, গাবতলী এবং বগুড়া থানার সংযোগস্থল। এই যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা আব্দুস সবুর সওদাগরের গ্রুপের সেকেন্ড ইন কমান্ড মোকছেদুর রহমান (বাবলু) হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমরা ধুনট থানার গোসাইবাড়ি থেকে ১৮/২০ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ভোর রাতে সদর থানার পরানবাড়িয়া এবং ফুলকোট গ্রামে পৌছি। আগেই রেকি করা আছে যে, সারা দিন সেখানে থেকে রাতের বেলা বগুড়া–ঢাকা মহাসড়কে যাতায়াতকারি আর্মির গাড়িকে লক্ষ করে অপারেশন করা হবে। সেই মোতাবেক আমাদের গ্রুপের ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা ২ ভাগে ভাগ হয়ে ৫ জন থাকবে ফুলকোট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা রাজিবুল ইসলামের নিয়ন্ত্রণে এবং আমরা থাকব পরানবাড়িয়া তপনদাদের বাড়িতে। আমার গ্রামের বাড়ি ঐ তপনদাদের বাড়ির নিকটেই। সেই কারণে আমার সহযোদ্ধা ৬ জনকে তপনদাদের বাড়িতে রেখে আমি আমার মায়ের সাথে দেখা করতে যাই। কারণ দীর্ঘ কয়েক মাস বাড়িতে যাওয়া হয়নি। মার সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছিল। সারাদিন যদি মায়ের কাছে থাকতে পারি তাহলে কত মজাই না হবে। এই ভেবে লোক মারফত খবর নিয়ে তারপর ঐ ভোর রাতে আমি আমার গ্রামের বাড়ি ঝালোপাড়ায় যাই। সিদ্ধান্ত নিলাম সারাদিন সেখানে থাকব এবং রাতে অপারেশন শেষ করে তারপর আবার অন্য এলাকায় চলে যাব। যেহেতু ঐ দিনটা লুকিয়ে থাকার পর রাত্রিতে অপারেশন হবে সেই মোতাবেক রেকির লোক রেডি আছে। তাকে বলে দেওয়া আছে যে, আমরা যেখানে অবস্থান করছি সেখান থেকে হাইওয়ে রোড প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে, মাঝখানে নৌকায় করে করতোয়া

নদী পার হতে হয়। সেই নদীর ঘাটে সে সাইকেল নিয়ে সারাদিন চলাফেরা করবে এবং খবর রাখবে যে দিনের বেলায় কোনও আর্মি আমাদের এদিকে আসে কি না।

এইভাবে প্রায় সারদিন চলেই গেছে। বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে আকস্মিকভাবে আমাদের লোক এসে খবর দিল যে, ২ গাড়ি পাক আর্মি এদিকে আসছে। সেই কথা শোনা মাত্রই আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লাম আর ওকে বললাম যে তুমি পরানবাড়িয়া তপনদাদের বাড়িতে যাও আমি ফুলকোটে রাজিবুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে খবর দিচ্ছি। সাথে সাথে সে খবর দেওয়ার জন্য চলে যায়। আমি ঘর থেকে বের হয়েই দেখি পাক আর্মির একটি দল আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়েছে। তখন আমি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে নিজেকে কেমোফ্লাক্স করে অর্থাৎ আমাকে যেন কেউ চিনতে না পারে সেভাবে মাথায় চাঁদর বেঁধে একটু বিকৃত ভাবে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে ধানের জমির মধ্যে দিয়ে ফুলকোট গ্রামের দিকে রওনা হলাম। এদিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি পাক আর্মির আরও একটা দল রাজিবুল ইসলামের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। সেই দলের সাথে আছে পার্শ্বের বিষ্ণুপুর গ্রামের জামাত আলী নামের এক রাজাকার।

আমি তখন দৌড়ে উল্টো দিক দিয়ে রাজিবুল ভাইকে খবরটা দিলাম। ইতিমধ্যে আর্মিরা এলোপাথাড়ি গুলি করা শুরু করে দিয়েছে। আমার কাছে তখন একটা স্টেনগান, ২টা ৩৬ এম, এম, হ্যান্ড গ্রেনেড আছে এবং একটা খালি ডেটনেটর আছে যা কোনও বিপদে পড়লে আত্মহত্যার কাজে লাগবে। কিন্তু আমি তখন সম্পূর্ণ একা। সবাই এক সঙ্গে নেই তাই গুলি না করে সবাই একত্র হতে পারি কিনা সেই চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তা সম্ভব হলো না। তখন কোনও উপায়ান্তর না দেখে আমি ঐ গ্রাম সংলগ্ন একটা বড় বিল (জলাশয়) এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জলাশয়টা ছিল অনেক বড় এবং কচুরিপানায় ভরপুর। এদিকে আর্মিরা গোলাগুলি মারপিট চালিয়ে যাচ্ছে। যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন আর্মিরা বগুড়া শহরের দিকে চলে গেল। সন্ধ্যার পর আমি জলাশয় থেকে উঠে আগে আমার বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলাম যে ঐ আর্মিদের সঙ্গে আমার পার্শ্বের কুন্দইশ গ্রামের একজন রাজাকার এর লিডার আব্দুল খবির জোয়ারদার ও রাজাকার আতাউর রহমান জোয়ারদার ছিল। ঐ জোয়ারদাররা প্রকাশ্য দিবালোকে আর্মি নিয়ে আমার বাড়িতে আসে এবং আমাকে ধরার চেষ্টা করে। আমাকে ধরতে না পেরে আমার বাড়িতে যায় এবং বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভাংচুর করে। আর্মির ভয়ে গ্রামের লোকজন সব পালিয়ে গেছে। জোয়ারদার আমার এক বন্ধু হাফিজারকে দেখিয়ে দিয়ে বলে যে, এই হাফিজারকে ধরলে মুক্তি বাহিনীর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তখন আর্মিরা হাফিজারকে ধরে এবং বেদম প্রহার করে। মেরে ফেলার জন্য হাফিজারকে ধরে আনলেও এক ফাঁকে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আমি বাড়ি যাওয়ার সাথে সাথে মা আমার কাছে ছুটে আসল এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল বাবা তুমি চলে যাও। একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, জলাশয়ে ১ ঘণ্টা কাল থাকার কারণে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যে শতশত জোঁক ধরে আছে তা আমি বুঝতেই পারিনি। মা এবং অন্যান্য লোকজন মিলে আমার শরীর থেকে জোঁকগুলি তুলে দিল।

এরপর আমি ঐ রাতেই আমার সহযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে এক সাথে অন্য এলাকায় চলে যাই। ঐ দিন রাতে আমাদের আর অপারেশন করা হলো না। কিন্তু রাজাকারদের মারফৎ খবর পেয়ে আর্মিরা আমাদের ধরতে না পেরে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি পুঁড়িয়ে দেয় এবং গ্রামাবাসীদের প্রতি চরম অত্যাচার করে।

এরপর নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে আমরাসহ বেশ কয়েকটি মুক্তিবাহিনী দল ঐক্যবদ্ধভাবে একই দিনে একই সময় ধুনট এবং সারিয়াকান্দি থানায় অপারেশন চালাই। ধুনট থানা এলাকায় ২ রাত ২ দিন যুদ্ধ করার পর ৪ জন পাক হানাদার বাহিনী আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঐ যুদ্ধে ১০/১২ জন আর্মি মৃত্যুবরণ করে। উক্ত ৪জন পাক বাহিনীকে আমরা ধরে নিয়ে আসি। ধুনট থানার পূর্ব এলাকা গোসাই বাড়ি নামক স্থানে নিয়ে আসার পথে সহযোদ্ধা ভাইয়েরা তাদের মারপিট করে এবং তাতে ২জন পাক আর্মি মারা যায়। বাকী ২ জনকে আমি এবং আমার সহযোদ্ধা সুশীল চন্দ্র দাস সহ আরো কয়েকজন আমাদের গ্রুপ লিডারের নির্দেশে আমাদের সেক্টর হেড কোয়ার্টার ভারতের তরঙ্গপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়। সেক্টর হেড কোয়ার্টারে পাক আর্মিকে জমা প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, জীবিত অবস্থায় পাক আর্মিকে নিয়ে গেলে আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য অনেক অস্ত্র প্রদান করবে। সেই মর্মে আমরা ঐ দিন রাত্রিতে নৌকা যোগে ২ জন পাকআর্মিসহ ভারতে মারন টিলায় পৌছি। সেখান থেকে বাসযোগে ধুপড়ি শহরে যাই। ধুপড়ি শহরের থানা হেড কোয়ার্টারে রাত্রি যাপন করি। পরের দিন ভোর রাতে ধুপড়ি থেকে ট্রেন যোগে তরঙ্গপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। ট্রেনে যখন আমরা পাকআর্মি নিয়ে যাই তখন হাজার হাজার ভারতীয় লোক ভিড় জমায় পাক আর্মিকে এক নজর দেখার জন্য। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে জংশনে পাকআর্মিসহ আমরা নেমে পড়ি এবং ওখান থেকে বাস যোগে তরঙ্গপুর ৭নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারে যাই এবং সেখানে সাবসেক্টর কমান্ডারের নিকট ২ জন পাক আর্মিকে হস্তান্তর করি। তারপর আমরা সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও গুলি নিয়ে আবার ঐ একই পথে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি।

তারপর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে শেরপুর থানা অপারেশন করি এবং ঐক্যবদ্ধভাবে অপারেশনে শেরপুর যখন মুক্ত হয়, আমরা শেরপুর থানা দখল করি। তারপর বগুড়া ঢাকা মহাসড়কের মাঝিড়ায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সেখানে অনেক পাকআর্মি মারা যায়।

এভাবে ১৬ ডিসেম্বর আমরা আমাদের চির আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করি। ফিরে পাই একটি স্বাধীন দেশ। যা মুক্ত করতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ করে, অনেক রক্তের বিনিময়ে। আমরা মুক্তিযোদ্ধা এ পরিচয় আমাদের রক্তের দামে কেনা।

আমার বাবার সেই সংগ্রামী দিনগুলো- জেব-উন নেসা আমাল

১৯৭০ সালের কথা। রোজার ঈদ প্রায় এসে গেছে। এর মধ্যে আব্বা' হঠাৎ ঢাকা এলেন ঈদ করতে, সঙ্গে মা নেই। আমরা পাঁচবোনই তখন ঢাকায়, এক ভাইও। আব্বার

আসাতে সবাই ভীষণ খুশি, কিন্তু একটু অবাকও। বগুড়ায় ঈদ না করে বাবা ঢাকায় এলেন কেন। আব্বা তা বুঝাতে পেরে বললেন বুঝলি, হঠাৎ মনে হলো তোদের সবার সঙ্গে ঢাকায় এবার ঈদ করবো। যেই না মনে হল আমি রওনা হলাম। এত তাড়াতাড়ি যে, তোর মা আসতে পারলেন না, আমিই চলে এলাম। বুঝলাম অন্তরের অপ্রতিরোধ্য একটা তাগিদ আব্বাকে ঢাকায় ঠেলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে-তাগিত তো ভেবেছিলাম স্নেহ ভালোবাসার। সে-তাগিত যে আমাদেরকে শেষ দেখার তা তো ভানিনি! স্বপ্নেও না।

এরপর দিনের পর দিন পেরিয়ে যেদিন এলো একাত্তরের ৩১ মে, সেদিন দুপুরবেলা ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোনটা বেজে উঠলো। তখন সারাদেশের মানুষের মতো আমরাও সর্বদাই উৎকর্ণ ও উদগ্রীব। ছুটে গেলাম ফোনটা ধরতে। ধরেই সুনি বুবার (কণ্ঠশিল্পী : আঞ্জুমান আরা বেগম) আকুল কান্না– আব্বা নেই, বড়–পা, আব্বা নেই, আব্বাকে পাকিস্তানি আর্মিরা মেরে ফেলেছে।

কিন্তু কেন? আজো তার জবাব পাই না। আব্বা বিশ্বাস করতেন দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। তাই ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মার্চের গণজাগরণে মিছিলে অগ্রণী হয়ে ২৩ মার্চ বগুড়ার 'সাতমাথা' মোড়ে বক্তৃতা করেছিলেন, দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– এদেশকে স্বাধীন করতেই হবে। আব্বা বিশ্বাস করতেন চিকিৎসা একটি মহৎ পেশা। তাই বগুড়া প্রবেশের চেষ্টায় বাধাপ্রাপ্ত ও ক্রুদ্ধ হানাদারবাহিনী যখন মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক ই. পি. আর বাহিনীকে বহুসংখ্যায় হতাহত করতে লাগলো তখন চিকিৎসকের কর্তব্যবোধ সেই সঙ্গে মনুষ্যত্ববোধ তো বটেই, তাঁদের চিকিৎসার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিরনন্দিত এই দেশপ্রেম, চিকিৎসার এই সেবাব্রত যে একদিন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে আব্বা তা জানতেন না। কিন্তু একথাও ভাবি-জানলেই বা কী হতো। বগুড়া থেকে গ্রামের বাড়িতে সরে গিয়ে অনেক কিছুই তো ইতোমধ্যে জেনেছিলেন। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে সারা দেশে পৈশাচিক কান্ড চলেছে, অগণিত নির্দোষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, বগুড়ায় তাঁর বাড়ি ও ডাক্তারখানা লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে। তা সত্ত্বেও ২১ মে তিনি বগুড়ায় ফিরে যাচ্ছে শুনে গ্রামবাসীরা যখন মিনতি জানালো– ডাক্তার সাহেব, আপনি বগুড়ায় যাবেন না; পাকসেনারা আপনাকে মেরে ফেলবে- তখনো তো আব্বা বিচলিত হলেন না, ভয় পেলেন না। তাঁর 'নিরপরাধ বৃদ্ধকে ওরা মারবে না' এই বিশ্বাস বুকে করে মাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে গরুর গাড়িতে বগুড়া রওনা হয়ে গেলেন। এর পরের ঘটনা এই। বগুড়া পৌছুবার আটদিন যেতে না যেতেই জিজ্ঞাসাবাদের এক প্রহসনের পর আধঘণ্টার মধ্যেই হানাদার বাহিনীর লোকরা বগুড়ার ৬ মাইল দক্ষিণে মাঝিড়ার এক বধ্যভূমিতে একটি পুরোনো কবরের মধ্যে ফেলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয় লোকেরা তাদের অতি পরিচিত ডাক্তার সাহেবকে চিনে ঐ পুরোনো কবরেই তাঁকে সমাহিত করলেন।

আব্বার স্মৃতিচারণ করতে বসে জানি না তাঁর অতি প্রিয় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির কথা বারবার মনে পড়ছে আজ। আগাগোড়া মুখস্থ এই কবিতাটি আপন মনে

আবেগময় কণ্ঠে কতবার যে আবৃত্তি করতে শুনেছি তাঁকে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু নয়, আব্বার জীবনের গান। পাছে তাঁর বিবেদিতপ্রাণ কখনো কর্তব্য ভূলে যায় তাই বুঝি মাঝে মাঝে কবিতাটি আবৃত্তি করে নিজেকে সজাগতার বাণী শুনিয়েছেন তিনি এবং বাস্তব সংসারে পূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিণতি লাভ করে পরিবার পরিজন ও জীবনপথের যতো মানুষকে নিরন্তর ভালোবেসে, কাছে টেনে এগিয়ে চলেছেন, চলতে চেয়েছেন।

নিজের কথা নিজেই শুরু করা যাক। আব্বার স্মৃতিচারণে শুনেছি–প্রথম সন্তান হিসেবে দুনিয়ার বুকে আসছি এ-সংবাদে কলকাতা থেকে আব্বা অনেক মহৎজীবনী গ্রন্থ মাকে পাঠাতেন। মা তখন রাজশাহীতে পিত্রালয়ে আর আব্বা হোস্টেলে থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন। শুনেছি আব্বার পাঠানো জীবনীগ্রন্থগুলো নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করতেন ষোল বছরের ভাবী জননী সৈয়দা জেয়াউর নাহার।

মা'র সঙ্গে আমরা কথাবার্তা ও ব্যবহারে যেমন খোলামেলা, আব্বার সঙ্গে ছোটাবেলায় তেমন ছিলাম না। তাঁকে আমরা বেশ একটু ভয় ও সমীহ করেই চলতাম, দরকার ছাড়া ধারে কাছে যেতাম না, যদিও অনুভব করতাম আমাদের প্রতি সন্তানবা সৎ তাঁর অন্তহীন। আমাদের প্রতি মুখের কথায়, স্নেহানুভূতি প্রকাশে এক ধরনের অপারগতা ছিল তাঁর। অনেক পিতার মতো মেলেমেয়েদের বাবা-বাছা-মা ইত্যাদি বলে ডাকতে পারতেন না। তবে ছুটির দিনে রাতে খাবার টেবিলে যখন সবাই একত্র হতাম তখন কিন্তু আব্বাকে বেশ একটু উদ্দীপ্ত মনে হতো। অনেক সময় সোৎসাহে কথাবার্তা বলতেন; অনেক স্মৃতিকথা, হাসির কথা। আব্বা এম. বি বি. এস. পাস করার পর ১৯৩০ সালে যখন বগুড়ায় প্র্যাকটিস শুরু করেন তখন নাকি তাঁর অর্থবিত্তশালী জমিদার পিতা নকীবউল্লাহ তালুকদার তাঁর হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বলেছিলেন, এই তোমার টাকা এটা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। এক হাজার টাকার কথা শুনে আমরা হেসে ফেলেছি– মাত্র এক হাজার টাকা? আব্বা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, তখন জানিস এক হাজার টাকার কতো মূল্য ছিল? ঐ টাকার দিয়ে কত জিনিস কিনেছি? মাইক্রোসকোপ, সাইকেল, পেট্রোম্যাক্স, গোটা চারেক কাঠের আলমারি-আরো কত কি? তারপর কতকটা আপন মনেই যেন যোগ করেছেন, আরো বেশি টাকা হাতে দিয়ে অপদার্থ বানাবেন বাপজান কি এতই বোকা? মার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– আর তোমাদের মা? তারও তো সাহায্য পেয়েছিলাম। এই খাবার টেবিলে বসেই জেনেছি মার কিছু গহনা বন্দকের টাকাতেও অনেক কাজ হয়েছিল এবং ব্যাংক থেকে পাঁচশ টাকার মতো লোন নিয়ে ওষুধ কিনে আব্বা এমন কায়দায় একেবারে সামনের দিক থেকে ওষুধগুলো আলমারির থাকে থাকে সাজিয়ে ফেলেছিলেন যে, দেখতে মনে হচ্ছিল আলমারিগুলো ওষুধে ঠাসা। আলমারির পেছন দিকগুলো যে ফাঁকা তা বোঝাও যাচ্ছিল না।

অনেক শোনাকথা ও দেখা জিনিস আজ ভুলে গেছি কিন্তু বেশ মনে আছে আব্বার ডাক্তারি পাস করার পর বগুড়া টাউনে এসে আমরা প্রথমে ছিলাম এমন একটি বাড়িতে যার প্রায় সব ঘরই ছিল মাটির। তারপর সেখান থেকে গেলাম এক টিনের দোতলায়।

এরপর জমজমাট থানারোডে হুবহু একই প্লানের এক জোড়া দালান বাড়ি ভাড়া করা হলো। বাড়ি দুটো একেবারে পাশাপাশি। একটিতে আমরা থাকি, অন্যটি আব্বার ডিসপেনসারি দি ইউনাউটেড মেডিক্যাল স্টোর। বাড়ির উল্টো দিকে অর্থাৎ রাস্তার অপরপারেই 'উত্তর' সিনেমা হল। মনে পড়ে, পরীক্ষার সময় তিনটি বা কখনো কখনো চারটি শো'-র আগে-পরে অতি উচ্চশব্দে মাইকে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান বাজানো হতো। তবে, বাইজু বাওরা-র গান শেখার নাম করে পরবর্তীকালে মাহবুব আরা, আঞ্জুমান আরা দুই বোন আব্বার অনুমতি নিয়ে বার কয়েক ছবিটি দেখেছিল শুনেছি। গান শেখার সুযোগ হবে এরপরে কি আর না করা চলে। থানা রোডের বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকার পর দেখতাম আব্বা অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে কাগজে কিসের নক্শা আঁকেন। মা-ও কাছে বসে থাকেন। পরে জানলাম বাদুড়তলায় যে জমিটা কিছুদিন আগে কেনা হয়েছে সেখানে আমাদের নিজেদের যে বাড়ি হবে আব্বা তাই ছবি আঁকেন।

ইতোমধ্যে আব্বা রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছেন। লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বগুড়া ও পাবনা জেলার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য এম. এল. সি ছিলেন তিনি। মনে পড়ে লোকাল বোর্ডে ঢুকে সে কী উৎসাহে দেশের কাজে লেগে গেলেন। লোকের যাতায়াত যানবাহন চলাচল ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধের জন্য দুপচাঁচিয়া থেকে আক্কেলপুর পর্যন্ত আট দশ মাইল রাস্তা তৈরি করিয়ে দু'পাশে আম-কাঁঠালের গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করলেন আব্বা। কয়েকটা ইনসিওরেন্স কোম্পানি ডাক্তার ও বয়েজ স্কাউট সার্জেনও তখন তিনি। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ বোধ করি অবান্তর হবে না। আব্বার পরিচয় ছিল অনেকের সাথে কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন দু'একজন মাত্র। তার মধ্যে একজন বগুড়ার নবাব পরিবারের মহাম্মদ আলী যিনি পরবর্তীকালে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। স্থানীয় রাজনীতিতে আব্বা প্রবেশ করেন মহাম্মদ আলীর পার্টিতে যোগ দিয়ে। মাহাম্মদ আলীর সঙ্গে আব্বার পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্ব থেকে প্রাগঢ় হৃদ্যতায় গিয়ে পৌঁছায় এবং এই সূত্রেই আব্বা, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাম্মদ আলীদের একটি মরিস কার দশ টাকায় কিনতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই দশ টাকার মরিস ১৯৭১-এর পৈশাচিক পর্ব শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত পুরাতন ভৃত্যের মতো কত সার্ভিসই না দিয়েছে আব্বাদের।

আব্বা যখন ডাক্তার কাম পলিটিশিয়ান তখন মাকে শুধু গৃহের গৃহিণী হয়ে থাকতে দিলেন না। প্রধানত তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্যে সেই ভারতের যুগে, যখন মুসলমান মেয়েরা পর্দার অন্তরালে তখন, মা সমাজ সেবার অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। আব্বার একান্ত ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় সমাজসেবা হয়ে উঠলো মা'র জীবনের একটি অংশ। বহু বছর বগুড়ার জেল ভিজিটার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, গার্লস গাইড কমিশনার, নারী পূর্ণবাসন সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী পরিষদের সদস্যা হিসাবে মা কাজ করেছেন।

চিকিৎসাকে যথাযথ অর্থেই একটি মহৎ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন আব্বা। অত্যন্ত যত্ন সহকারে ও অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নির্ণয়ে যেমন আব্বার সুনাম ছিল

তেমনি চিকিৎসাতে তাঁর ছিল দক্ষতা। তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপত্রে পেটেন্ট ওষুধ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে নিজের তত্ত্বাবধানে ডাক্তারখানা থেকে রোগীকে যে মিক্সচার বানিয়ে দিতেন তা যেন মন্ত্রের মতো কাজ করতো। গরিব রোগীদের তিনি বিনা পয়সা বা অল্প পয়সায় চিকিৎসা করতেন। এ জন্যে কোনো মহল থেকে একটি নাম পেয়েছিলেন গরিবের ডাক্তার।

শুধু কি চিকিৎসা? প্রকৌশলী বা স্থপতির কোনো পাঠ নিয়েও বাদুড়তলায় সম্পূর্ণ নিজের প্ল্যান ডিজাইন ও তত্ত্বাবধানে যে-বাড়িটি আব্বা করে গেছেন তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে বিখ্যাত রাজনীতিক নেতা এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী প্রথম যে মন্তব্যটি করেছিলেন তা হচ্ছে– এ যে দেখছি একটা প্যালেস। আসলে বাড়িটি তৈরি হয় ১৯৪১ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৬৭ বছর আগে। কিন্তু তখনকার বাগিঘরের তুলনায় এ-বাড়ির বিশিষ্টতার জন্যেই মন্তব্যটিতে একটু অতিশয়োক্তি থাকতে পারে।

নিরলস কাজ করতে পারতেন আব্বা। ক্লান্তি বলে যেন কিছু ছিল না তাঁর। এতো করিৎকর্মা পুরুষ ও বিভিন্ন গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি যে ভাবতেও বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যেতে হয়। ড্রইং করা, গান গাওয়া, আবৃত্তি করা, নানা ধরণের কলকব্জা ঘটিত বিভ্রাট সারানো, এমন কি রান্না, সেলাইয়েও তিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন। ঈদের দিনে রান্নাঘরে যথানিয়মে মার পাশে আব্বাকে দেখা যেত এবং তিনিই হতেন সেদিন প্রধান রাধুনী। সারা বাড়ি মম করতো তার রান্নার সুগন্ধে। দি ইউনাইটেড মেডিক্যাল স্টোর-এর আবু হাসান ছেলেবেলায় এক ধরনের খেয়ালে খালি দেয়াশলাইয়ের বাক্স জমিয়েছিলেন অজস্র। ইটের গাঁথুনির মতো করে সেই খালি বাক্সগুলি আব্বা ওপরে-ওপরে আঠা দিয়ে বসিয়ে শক্ত মজবুত আয়তকার একটি মসৃণ তক্তার ওপর বানালেন একটি ঘর। মা অবশ্যি এতে তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিলেন। ঘরের চারিদিকে পিলার দেয়া বারান্দা, জানালা, কাঁচের দরজা। পিবোর্ডের সামনের বন্ধ দরজার ছোট দুটি কড়ায় ছোট একটি তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। ঘরটি আগাগোড়া ধ্বধবে সাদা রঙ করে দিলেন আব্বা-মা; তারপর ছোটো ছোটো বালব ও ব্যাটারি ফিট্ করে যখন আলো জ্বালিয়ে দিলেন তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এখনো যেন চোখে ভাসছে। আমার কৌতূহলে ভরা, খুশিতে জ্বলে ওঠা শিশু চোখে কী যে মনে হয়েছিল সেটাকে। প্রদর্শনীতে দর্শকরাও আনন্দ পেয়েছিল জিনিসটি দেখে।

আব্বার সেলাই সম্পর্কিত স্মৃতিকথা এবার। আমরা ছোটবেলা থেকেই ফ্রেমে বাঁধানো একজোড়া ময়ূরের সুন্দর ছবি বাড়ির দেয়ালে ঝুলানো দেখতাম। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অব্বা সেটা করেছেন। শুনে আমরা তো অবাক: পুরুষ মানুষ সেলাই করতে পারে? আব্বা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছিলেন পরে। আব্বা বেশ ভালো কাটছাট জানতেন। মস্তবড়ো একটা কাঁচি চালিয়ে ক্যাঁচ করে পাঞ্জানি সার্ট প্যান্ট কেটে দিতেন, মা সেলাই করতেন। কিছু কিছু সেলাই নিজেও করতেন। আমার ছোট ভাই দুটির শীতের গরম কোট, প্যান্ট, মশারি এমনকি মহাম্মদ আলীর দেয়া সেই দশ টাকার

মরিস কারের নতুন হুডও আব্বা মোটা ক্যানভাসে সেলাই করেছিলেন, মনে আছে যা দেখে মনে করার উপায় ছিল না যে সেটা কোনো অ-দর্জির কাজ!

শিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল । নিজে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯১৯ সালে প্রথম বিভাগে দুটি লেটারসহ প্রবেশিকা এবং কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দুটি লেটারসহ ১৯২১ সালে আই. এস. সি পাস করেন। শুনেছি পরীক্ষার ঠিক আঠারো দিন আগে থেকে দৈনিক ঠিক আঠারো ঘণ্টা পড়তেন। সে বছরই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানে থেকে এম. বি. পাস করেন। লেখাপড়ায় কোনো রকম গাফিলতি আব্বা বরদাশত করতে পারতেন না। কর্মব্যস্ততার কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে তার পক্ষে তেমন সাহায্য করা সম্ভব না হলেও তাঁর কাছে কোনো পড়া বুঝতে গেলে তা জলবৎ তরলং করে দিয়ে তবে অন্য কাজ ধরতেন। পরীক্ষায় তাঁর আশানুরূরপ ফল দেখাতে না পারলে ভীষণ বিরক্ত হতেন মেলেমেয়েদের প্রতি। একবার ছোট কোনো ক্লাসে সব বিষয় ভালো নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও অঙ্কে খারাপ করার জন্য আব্বা আমাকে একটা চড় মেরেছিলেন যে দু হাত দূরে ছিটকে পড়তে হয়েছিল।

শিক্ষার দিশারী হয়ে তিনি শুধু পাঁচ কন্যা, দুই পুত্র ও পুত্রবধূদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গেছেন তা-ই নয়। গ্রামে সুযোগ সুবিধা অথবা অর্থাভাবে যাদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে এমন অনেক আত্মীয় অনাত্মীয় ছাত্রছাত্রীকেই আব্বা নিজের বাড়িতে এনে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। এ ছাড়া গরিব ছাত্রদের বই কিনে দেয়া, কাপড় কিনে দেয়াতেও তাঁর ছিল অপার আনন্দ। পরীক্ষায় ছেলেমেয়ে বা নাতিনাতনীদের কেউ অত্যুজ্জল সাফল্য দেখাতে পারলে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো তাঁর মূখ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকেও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তাঁর কাছে অত্যাবশ্যক মনে হওয়ায় প্রথম আমাকে ও দুবছর পরে বোন জাহান-আরাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর আই. এ ও বি. এ পড়ার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। সেই সময়ে মেয়েদেরদেরকে লেখা পড়ার জন্যে কলকাতা পাঠানো এখন আশির দশকের শেষভাগে বিদেশে পাঠানোর চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সেদিক থেকে সে যুগে আব্বা যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষার পাশাপাশি আর একটি বিষয়ে আব্বার অনুরাগ ছিল অপরিমেয়। সে হচ্ছে সঙ্গীত; এক কথায় তাঁর হৃদয়ানন্দ! মা তো সঙ্গীতের সুকণ্ঠ নিয়েই আব্বার সংসারে এসেছিলেন। আব্বাও ভালো গাইতে পারতেন। এক সময় হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া তাঁর প্রায় প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তার সে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও। প্রায় দেড়শ গ্রামোফোন রেকর্ডের সংগ্রহ ছিল আব্বার। তা মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কে. এল. সায়গল, পাহাড়ি সান্যাল, শচীনদেব বর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক, দীলিপ কুমার রায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখার্জি, জগন্ময় মিত্র, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া, কানন বালা, উমাশশী, যুথিকা রায়, উমা বসুর গাওয়া রেকর্ডের গানের কথাই

বেশি মনে পড়ছে। এইসব কণ্ঠশিল্পীর কেউ কেউ চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকা ছিলেন। অনেক সময় রেকর্ড বাজছে শুনলে বোঝা যেত আব্বা বাড়িতে। ডিসপেনসারিতে যাবার সময় ট্রানজিস্টারখানা সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে গান শেখাবার জন্যে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করতেন আব্বা। অর্ডার দিয়ে একটা সিঙ্গল হারমোনিয়ামও বানিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। বাড়িতে এসে গানের তালিম দিতেন তাঁরা। তবে বছর ছয়েক বয়সের আমি স্কুলের শিক্ষিকা লতাদি, কুসুমদির বাসায় গিয়ে গান শিখতাম। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা রেয়াজ করি কিনা সেদিকে আব্বার কড়া নজর ছিল। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আজ আঞ্জুমান আরার যে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা তার পেছনে আব্বার কী চেষ্টা, যত্ন ও অনুপ্রেরণা ছিল তা অনেকেরই অজানা নয়। অপর কন্যা মাহবুব আরা বেগম ও দৌহিত্রী জীনাত রেহানাকেও প্রচুর উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি। আমরা বিয়ের পরও দেখেছি যখনই কোনো উপলক্ষে বা ছুটি ছাটানোর সময় আমরা সবকটি ভাই বোন বগুড়ার বাড়িতে একত্র হতাম তখনই আগের মতো পারিবারিক জলসা হতো। আমাদের দুই ভাই জিয়া হাসান (এখন চিকিৎসা) ও আবু হাসান (আইনজীবী) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বোন জাহান আরা ও মনোয়ারারও গানের ভালো গলা ছিল। জলসাতে ছেলেমেয়েসহ আমরা তো গাইতামই, আব্বা মাও গাইতেন। যতোদূর মনে পড়ছে জামাইরা থাকতেন শ্রোতার দলে। আমরা দেখেছি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই যেখান থেকে কোনো জ্ঞানী গুণী মানুষ বা রাজনীতিক নেতা বগুড়ায় আসুন, আব্বা তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন এবং অনেকেই দু'চারদিন অতিথি হিসেবে থেকেছেন। বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শুধু আমাদের বাড়িতে নয়, দাদার মহিষুড়া গ্রামের বাড়িতেও অতিথ্য গ্রহণ করেন। দাদা ও তাঁর বাবা হাজী হাবীবুল্লাহ তালুকদার যে অতিথিসৎকার না করে কোনোদিন অন্ন গ্রহণ করতেন না এ সম্পর্কেও তিনি সপ্রশংসা উক্তি করতেন বিভিন্ন উপলক্ষ্যে।

আমরা তখন থানা রোডের বাসায় থাকি। একবার স্কুলে ছুটিতে মার সঙ্গে দাদার বাড়ি বেড়িয়ে বগুড়ায় ফিরে শুনি– অবিভক্ত ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিক সুভাস বসুর সম্মানে আব্বা এক চা- চক্রের আয়োজন করেছিলেন আমাদের অনুপস্থিতিতে এবং বগুড়া থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চলেও গেছেন। শুনে আমার সেকী আফসোস যে আমি তার অটোগ্রাফ নিতে পারলাম না।

সুভাস বসুকে নিমন্ত্রণ করা নিয়ে বেশ একটু কথা উঠেছিল বগুড়ার কোনো কোনো মহলে। আসলে আব্বা দলমত নির্বিশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাদর করতে ভালোবাসতেন। সেই সঙ্গে সাধারণ ও নিঃস্ব কাঙাল মানুষের প্রয়োজনেও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন, তাদের সাথে মিশে যেতে পারতেন নিরহংকার স্বভাবের কারণে। প্রতি বছর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্ররা বগুড়ায় পরীক্ষা দিতে এসে আমাদের বাইর বাড়িতে থাকতো এবং পরীক্ষা শেষে ফেরার আগে তাদেরকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করতে হতো। দরিদ্র পাড়া-প্রতিবেশী থেকে গরিব রোগীকে পর্যন্ত অন্নদানের তৃপ্তি ছিল আব্বা-মা দুজনেরই।

আল্লাহর প্রতি আব্বার ছিল পূর্ণ নির্ভরতা কিন্তু ধর্মের নামে যে কোনো অন্ধ কুসংস্কার বা গোড়াঁড়ি থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। প্রখর মেধার গুণে অনেক কবিতার সঙ্গে পবিত্র কোরানের বেশ কিছু আয়াতও তার ছিল কণ্ঠস্ত। প্রায়ই আবৃত্তি করতেন সেগুলো। আব্বাকে অনেক সময় দেখেছি হাতের জায়নামাজটা একটু যেন আড়াল করে সবার অলক্ষ্যে ছাদে যাচ্ছেন। বগুড়া জেলার নামাজঘর সমজিদের মিনার তারই অর্থে নির্মিত হয়। প্রতি বছর সমজিদের সংস্কারও নিজ ব্যয়ে করতেন তিনি।

মার প্রতি আব্বার ছিল গভীর সম্মানবোধ ও নির্ভরতা। আব্বা মাঝে মাঝে রসিকতা করে মাকে বলতেন, আমি তো শুধু রোজগার করি, তুমিই তো বাড়ির আসল মালিক। আরো বলতেন, তোমার চিন্তা কি, তুমি তো শুধু চাবি ঘোরাবে! আব্বার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মা কোনোনোদিনও টাকা পয়সার অপচয় করবেন না বিলাসিতার জন্যে। আব্বার ভাষায় বাবুগিরির জন্যে পয়সা নষ্ট করবেন না। আব্বার প্রতি মার ভক্তি-ভালোবাসারও অন্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আব্বার ২৯ মে, '৭১ এ শহীদ হাবার সংবাদ মা জেনেছেন ৩১ মে। ২৯ মে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আব্বাকে পাক হানাদার বাহিনীর লোকেরা ডেকে নিয়ে গেলে শেষ জীবনের সঙ্গীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় অনেক উৎকণ্ঠার প্রহর কেটেছে মার। যদিও সে অপেক্ষার ব্যাগ্রতা শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক শোকে পর্যবসিত হয়েছিল।

হাসিখুশি আমুদে ও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আব্বা। বাড়ির কাজের লোক, ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডার সাবর সঙ্গে ব্যবহারে ছিলেন স্বচ্ছন্দ ও প্রাণখোলা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে মনে হতো যেন অন্য মানুষ। যেখানে দেখতেন মিথ্যাচারিতা, কপটতা, ভন্ডামি, অন্যায়, দূর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব সেখানে হয়ে উঠতেন প্রতিবাদী। নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেক সময় তাকে অন্যের বিরাগভাজন হতে হতো।

সন্তান হিসেবে বাবা-মার স্নেহ-ভালোবাসা যেমন পেয়েছি তেমনি তাদের উৎসাহও পেয়েছি অনেক কিছুতে। ছেলেবেলা থেকেই পাঠে মনোযোগ, পাঠ্যবিষয় বোঝার চেষ্টা, গল্প, কবিতা লেখার ঝোঁক, ছবি আঁকা, গান শোনার আগ্রহ এসব নাকি দেখা যেতো আমার মধ্যে। আব্বা তাই মাকে আমার সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, ওকে উৎসাহ দিতে হবে। উৎসাহ দিতেনও প্রচুর। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ক্ষুদ্র অথচ মধুর ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। দেশের প্রখ্যাত কবি , শিল্পী, সাহিত্যিদের চিঠি লিখি বা সুযোগ পেলেই তাদের অটোগ্রাফ নিই, কলকাতার দি স্টেটসম্যান পত্রিকার ছোটদের বিভাগ বেনজী লীগের মেম্বার হিসেবে পত্রমিতাদের সঙ্গে পত্র, ডাকটিকিকট, নেসলস পিকচার ইত্যাদি বিনিময় করি। তাছাড়া কলকাতার বিভিন্ন শিশুপত্রিকা শিশুসাথী, মৌচাক, রামধুন, রংমশাল ও আমাদের ছোটদের পাতার (মুকুলের মহফিল) জন্যে সোৎসাহে লেখা পাঠাই। এসবের জন্যে বেশ কিছু ডাকটিকিটের প্রয়োজন। কিন্তু কেন জানি না, মার কাছে পয়সাকড়ি না চেয়ে একফাকে আব্বার কাছে একটি আবেদন পত্র পেশ করলাম মার মাধ্যমে। কী কারণে ডাকটিকিটের প্রয়োজন তা পত্রে সবিস্তারে ব্যক্ত করে দয়া করে প্রতিমাসে ডাকটিকিট বাবদ সামান্য কিছু পয়সা বরাদ্দ করার জন্যে আব্বার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালাম। বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফেরার কিছু পরেই আব্বার কাছে আমার ডাক পড়লো। ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই মাসে এক টাকা বলে

হাসতে হাসতে আবেদন পত্রটি যখন আমার হাতে দিলেন আব্বা, তখন চেয়ে দেখি আবেদপত্রে তার নাম সইসহ অনুমোদিত লেখা। ভাবতে লাগলাম এত পয়সা দিয়ে কী করবো? কারণ তখন, যতদূর মনে পড়ছে, এক পয়সায় পোস্টকার্ড ও দু পয়সায় ডাকের খাম পাওয়া যেত। বিবাহিত জীবনে প্রবেশ স্বাভাবিক নিয়মে আমাকে ও আমার অন্যান্য বোনকে পিতৃগৃহ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেও আমাদের কারো কখনো মনে হয়নি, আব্বা মার চোখের আড়াল হলেও আমরা তাদের মনের আড়াল হয়েছি। আমাদের প্রতি কল্যাণকামনার পরিচয় সর্বদাই আমরা পেয়েছি। বিবাহোত্তর জীবনে ঘরসংসারের বাইরে সঙ্গীত ও শিক্ষকতা ছাড়া আর যে ক্ষেত্রে আব্বা আমাকে উদ্দীপনা ও সক্রিয় সহযোগিতা দান করনে তা হচ্ছে রাজনীতি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে আমি যখন আমার নির্বাচনী এলাকাগুলিতে নির্বাচনী অভিযান চালাই তখন নিজের পেশাকে উপেক্ষা করে আব্বা বেশ কিছুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

আমার গানের চর্চা যাতে অব্যাহত থাকে সে ব্যাপারে আব্বার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা ছিল। দেশ বিভাগের বছর কয়েক পর ঢাকায় থাকাকালে যখন আমি তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তানের একজন নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী তখন আমার স্বামী মরহমু সৈয়দ জামালউদ্দীন অন্যত্র বদলি হয়ে যান। আমি ছেলেমেয়েসহ বগুড়ায় গিয়ে আব্বা মার সঙ্গে কিছুদিন থাকি। এ সময় ঢাকা থেকে সঙ্গীতানুষ্ঠানের চুক্তিপত্র এলে আব্বা বেশ জোরালো ভাষায় জানিয়ে দিলেন আমাকে ঢাকা যেতে হবে প্রোগ্রাম করতে। আমার কোনো আপত্তিই টিকলো না। অগত্যা ট্রেনে ঢাকায় যেতে হলো। ভাড়া বাড়িতে থাকতে নিজের বাড়ি কবে হবে মার এই জিজ্ঞাসাতে আব্বা বলেছিলেন, একটু সময় দাও। ভালো করেই একটা বাড়ি তৈরি করে দেব তোমাকে। দিয়েওছিলেন। বাড়ির সামনের দিকের প্যারাপেটের মাঝখানের জন্যে আমাকে একটা কিছুর নকশা একেঁ দিতে বলেছিলেন আব্বা। আমার নকসা অনুযায়ী বিচ্ছুরিত ছটাসহ সূর্যোদয়ের প্রতীক কংক্রিটে করা হলো প্যারাপেটে। সূর্যোদয় ছাড়া আর কিছুই যেন তখন মনে আসছিল না আমার। নতুন দোতলা বাড়ির চুনকামের পর কতকটা তার ধবধবে রঙের জন্যেই বাড়ির নাম হোয়াইট হাউস রাখলে কেমন হয় বলতে লাগলাম আমরা ভাইবোনেরা। শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউস ই হয়ে গেল বাড়ির নাম, যদিও বাড়ির কোথাও এ নাম লেখা বা খোদাই করা হয়নি আজ পর্যন্ত। সাদা বাড়িটাকে সাদা রাখার জন্যে আব্বার সেকি সযত্ন প্রয়াস। বড় ভালোবাসতেন বাড়িটাকে। সে বাড়ির যিনি স্থপতি, সে বাড়ির প্রতিটি ইট যার কথা বলে, একদিন যে বাড়ির সর্বত্র যার সানন্দ পদচারণা ছিল, সে বাড়ি থেকে অনেক দূরে ঢাকা থেকে বগুড়া যাবার মহাসড়কের পাশে একটি সমাধিতে কর্মবহুল জীবন শেষে আজ তিনি বিশ্রায়মান।

আব্বার স্মৃতিচারণ করতে বসে এলোমেলোভাবে কত কথাই বললাম। স্মৃতি জিনিসটাও তো বিচ্ছিন্ন। তবু কত সুন্দর। একদিন যা থাকে বাস্তব, চোখের আড়ালে গিয়ে তাই হয়ে ওঠে প্রাণের সম্পদ। স্মৃতির নাড়াচাড়াতেও তাই আনন্দ, বিশেষ করে যদি তা মনে দেয় সুখ, চোখে আনে জল।

[সূত্র   স্মৃতি-১৯৭১ সম্পাদনা রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

স্মৃতিচারণ– মুক্তিযোদ্ধা মো. আনছার আলী কুতুবপুর

আমাদের দেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমার বডি নং ছিল ৩৫৩২ এবং সেক্টর নং ছিল ৭। ভারতের শিলিগুড়ির পানিঘাটা নামক পাহাড়ে আমাদের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। ট্রেনিং শেষে সীমান্ত এলাকায় মাস খানেক ধরে পাক বাহিনীর সাথে কয়েকটা যুদ্ধের পর আমাদেরকে দেশের ভেতর গেরিলাযুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। আমাদের অপারেশন এরিয়া ছিল সারিয়াকান্দি ধুনট ও শেরপুর থানা এলাকা জুড়ে। উল্লেখিত এলাকার মধ্যে থেকে রাজাকার-দালাল ও আলবদর বাহিনী এবং পাক বাহিনীর সাথে অনেকবার যুদ্ধ করি। সে সুবাদে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের অনেক ভয়াবহ যুদ্ধের স্মৃতি আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। সারিয়াকান্দিকে শত্রু-মুক্ত করার লক্ষ্যে সংঘটিত যুদ্ধস্মৃতি তার মধ্যে অন্যতম।

সারিয়াকান্দির মুক্তিযুদ্ধে প্রায় দুই থেকে আড়াইশ যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনার সাথে আমরা মোটামুটি ৫/৭ জন জড়িত ছিলাম। রাতের অন্ধকারে রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেতর বসে যেহেতু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাই সবাইকে যেমন চিনতে পারিনি তেমনি সবার নাম জানারও সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন মুক্তিযোদ্ধা কি কি প্রশংনীয় ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও সম্ভব হয়নি। তাই অনেকের বীরত্বগাথা আমার লেখায় তুলে ধরা সম্ভব হলো না। তবে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানকারী ব্যক্তিগণ সবাই অকৃত্রিম প্রশংসার দাবীদার। আমার লেখায় ২/১টি ঘটনার কথা যদি ভুলক্রমে বাদ পড়ে যায় তবে সেই ভুলগুলিকে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসেবে গণ্য করে আমাকে ক্ষমা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভৌগোলিক দিক থেকে সারিয়াকান্দি উপজেলা যমুনা নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। সে সময় সারিয়াকান্দির বোহাইল, চন্দনবাইশা, মথুরাপাড়া, হাটশেরপুর, পাকুল্লা, চালুয়াবাড়ী, কাজলা প্রভৃতি স্থান হতে নৌকা পথে যমুনা নদী দিয়ে ভারতের মানিকচরে যাওয়া-আসা একেবারে নিরাপদ না হলেও তুলনামূলকভাবে অনেকটা সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। এ কারণে বগুড়ার বিভিন্ন জায়গায় শত শত মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিতে এ এলাকা দিয়ে ভারতে যাতায়াত করতো। কিন্তু যখন দেখা গেল যে সারিয়াকান্দি, হাটশেরপুর ও চন্দনবাইশাতে পাক-বাহিনী ক্যাম্প করায় মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াতে খুব অসুবিধা হচ্ছে তখন আমরা সারিয়াকান্দি এলাকা হতে পাক-বাহিনী উৎখাত করে এলাকাটা আমাদের দখলে নেওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। 'পরবর্তিতে ধুনট ও গাবতলী দখলে নিয়ে বগুড়ার পূর্ব এলাকা (যমুনা পর্যন্ত) মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ ভূমি হিসেবে রাখতে পারলে বগুড়া শহর আক্রমণ করে বগুড়া শহরকে পাক-হানাদার বাহিনীর কবল হতে উদ্ধার করা সহজ হবে' এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে সারিয়াকান্দি পাক-বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সে সময় ছিল অপরিসীম।

সারিয়াকান্দি যুদ্ধের জন্য আমরা যারা প্রথম প্লান-প্রোগ্রাম করি তারা হলাম মো. রফিকুল ইসলাম মুকুল (টিম লিডার), রামচন্দ্রপুর গ্রামের মো. তহসীন মিঞা (ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের নেতা ছিল।) মো. আমিনুর ইসলাম লাল ও আমি নিজে। তখন ছিল রমজান মাস। রমজান মাস শেষে ঈদুল ফিতর এর দিন বিকেলে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে মুকুল ও আমি আমাদের ইউনিয়নের মাছিরপাড়ার নিকট বাঙ্গালি নদীর পূর্ব পাড়ের চরে কাশবনের ভেতর তহসীনের সাথে মিলিত হই এবং সারিয়াকান্দিতে পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি। দীর্ঘ আলোচনার পর আক্রমণের সিদ্ধান্তে আমরা একমত হই। সেদিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর সারিয়াকান্দি এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একত্রিত করার দায়িত্ব তহসীনকে দেওয়া হয় এবং মুকুল ও আমি দক্ষিণ এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের উক্ত বিদ্যালয়ে একত্রিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করি।

উল্লেখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১/১১/১৯৭১ ইং, রবিবার রাত ১২ টায় রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হই এবং আমাদের দেয়া সংবাদ মোতাবেক সারিয়াকান্দিতে অবস্থানরত প্রায় ১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে উপস্থিত হয়। রাতের অন্ধকারে সবাই বসে আলোচনা করা হয়। মূল আলোচনায় ও যুদ্ধকৌশলের সাথে ১৪/১৫ জন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দশ ভাগে ভাগ করে কোন দল কোথায় অবস্থান করবে এবং কিভাবে যুদ্ধ শুরু করবে তার দিকনির্দেশনা ঠিক করে দেওয়া হয়। বগুড়া হতে পাক-বাহিনী যেন আসতে না পারে তার জন্য রামনগরের পিছনে সারিয়াকান্দি-বগুড়া সড়কে মাইন পুঁতে রাখার জন্য ২৫ জনের একটি কাটআপ পার্টি রাখা হয়। আর দক্ষিণ দিক থেকে অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ হতে পাকবাহিনীকে আসতে না দেওয়ার জন্য মথুরাপাড়ায় ওয়াপদার বাঁধের উপর মাইন পুঁতে রেখে সেখানে ২৫ জনের একটি কাটআপ পার্টি রাখা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সারিয়াকান্দির নিকট বাঙ্গালি নদীর পশ্চিম পাড়ে রাখা হয় এবং কোনও প্রকার শব্দ না করে চুপচাপ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়। কৌশলটি ছিল উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব পাশ থেকে একযোগে পাক-বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ চালান হবে এবং পশ্চিম দিককে পাক-বাহিনী নিরাপদ ভেবে বের হয়ে বগুড়ার পথে পলায়নের জন্য যখন বাঙ্গালি নদী পার হতে থাকবে ঠিক তখনই বাঙ্গালির পশ্চিম তীরে অপেক্ষমান মুক্তিযোদ্ধারা পাক-বাহিনীর ওপর একাধারে গুলিবর্ষণ করবে। এই পরিকল্পনায় কোন দল কোথায় থাকবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আমি ২৫ জনের একটি দলকে নিয়ে পূর্ব পাশে অবস্থান নেওয়ার দায়িত্ব পাই। সমস্ত পরিকল্পনা শেষে রাত ৩টার দিকে আমরা নির্ধারিত স্থানে রওনা হই। বগুড়ার সাথে খান সেনাদের টেলিফোনে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য; সারিয়াকান্দি-বগুড়া টেলিফোন লাইনটি কাটার দায়িত্বও আমাদের উপর ছিল। সুতরাং বাঙ্গালি নদী পার হয়ে আক্রমণ-স্থলে যাওয়ার আগেই আমরা উক্ত দায়িত্বটি পালন করি; এবং সময় মতো নির্ধারিত স্থানে গিয়ে অবস্থান নিই। আমাদের অবস্থান-স্থল ছিল বর্তমান সারিয়াকান্দি উপজেলা পশুসম্পদ অফিস হতে পুরাতন পোস্ট অফিসের মোড় পর্যন্ত। উত্তর পাশের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল সারিয়াকান্দি কলেজ মাঠের পশ্চিম-দক্ষিণে (ভিটার

দক্ষিণে) এবং দক্ষিণ দিকের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল সারিয়াকান্দি পাবলিক মাঠ বরাবর উত্তর-পশ্চিমে মূল রাস্তার পার্শ্বে। আক্রমণে ফায়ার ওপেন (Open) করার সিদ্ধান্ত ছিল উত্তরের পার্টির তরফ থেকে। তারপর ফায়ার হবে পূর্ব দিকের পার্টির এবং পূর্ব দিকে ফায়ার বন্ধের পর ফায়ার হবে দক্ষিণে অবস্থানরত পার্টির। ২২ নভেম্বর ১৯৭১ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নেওয়ার পর দেখলাম খুব কুয়াশা পড়ছে। তবু আমরা অপেক্ষা করছিলাম গৃহীত-সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফায়ার ওপেনের। কিন্তু ভোর হয়ে গেল ফায়ার ওপেন হচ্ছে না। রাজাকারেরা বর্তমান হাসপাতাল এলাকার (তখন হাসপাতাল ছিল না) বিভিন্ন গাছের সাথে লটকিয়ে রাখা হারিকেনগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে ও গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও ওরা আমাদের অবস্থান বুঝতে বা দেখতে পায়নি। যখন বেলা উঠে গেল তখন পর্যন্ত উত্তর দিকের সিগন্যাল না পেয়ে আমরা অনুমান করলাম যে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধার কারণে ওরা সিগনাল দিচ্ছে না তাই আমাদের পার্টি উইদড্র (Withdraw) করে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলাম। সেদিন আর আক্রমণ করা হলো না। রাতেও আক্রমণ বন্ধ রইলো পরের দিন যোগাযোগ করে ২৩/১১/১৯৭১ তারিখ রোজ মঙ্গলবার রাতে পূর্বস্থান রামচন্দ্রপুর স্কুলে আমরা পুনরায় মিলিত হই এবং আগের দিনের ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরিয়ে আবার পাক-বাহিনীর ক্যাম্প দখলের জন্য পূর্বের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে পজিশন নিই।

২৪/১১/১৯৭১ ইং রোজ বুধবার সূর্য উঠার পর উত্তর দিকের পার্টির রাইফেলগুলো একে একে গর্জে উঠলো। পাক-বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উত্তরের পার্টির প্রতি গুলি ছুড়তে শুরু করায় তারা চুপচাপ হয়ে গেল। তখন আমরা পূর্ব দিক হতে গুলিবর্ষণ শুরু করলাম। আমাদের দিকে পাক-বাহিনী গুলি করা শুরু করলে আমরাও চুপ হয়ে গেলাম। তখন আমাদের দক্ষিণের পার্টি গুলি করা শুরু করে। ফলে পাক-বাহিনী ভাগ হয়ে উল্লিখিত তিন দিকেই গুলি করতে থাকে। আমরা তখন ২/১টি করে আওয়াজ দেই। আমরা চাচ্ছিলাম যে, ওরা যেন বেশি বেশি গুলি করে ওদের রিজার্ভ গোলা-বারুদ শেষ করে ফেলে।

যুদ্ধ চলছে। প্রাণের ভয়ে বেশ কিছু রাজাকার দৌড়িয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমাদের উত্তর দিকের পার্টির মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে দক্ষিণে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বোহাইলের রফিকুল নামের একজন মুক্তিযোদ্ধার বুকে পাক-বাহিনীর গুলি লেগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ফলে দক্ষিণের মুক্তিযোদ্ধারা এ্যাকশন উইদড্র করে রফিকুলকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। এমতাবস্থায় আমাদের উত্তর ও দক্ষিণের পার্টি দুইটির মধ্যে কিছুটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। তখন পাক-সেনারা পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আমাদের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ করে। আমরাও যথার্থ জবাব দিতে থাকি। এভাবে সকাল ১০টার দিকে আমাদের পার্টির মুকুল, জর্জিস, আমজাদ ও আমি ছাড়া বাকি সবাইকে অবস্থান উইথড্রো করে নিরাপদে চলে যেতে বলি। তারা সবাই চলে যায়। তারপর আমরা চারজন ওদের সাথে ব্যাপক গুলি বিনিময় করতে থাকি। সকাল সাড়ে দশটার দিকে দেখা গেল, ওরা আমাদেরকে তিন পাশ থেকে আক্রমণ করছে। ওদিকে আমাদের উত্তর ও দক্ষিণের পার্টির মুক্তিযোদ্ধারা তখনও কোনো ফায়ার দিচ্ছে না। তখন চিন্তা করলাম যে, আমরা মাত্র

চারজন এতগুলো প্রশিক্ষিত পাকসেনার সাথে টিকে থাকতে পারব না। তাছাড়া ওরা তিনপাশ থেকে এগিয়ে আসছে। তখন আমরা পজিশন উইদড্র করে পূর্ব দিকে চলে যেতে থাকলাম। পুর্ব দিকের ওয়াপদার বাঁধে গিয়ে আমরা আবার পজিশন নিলাম। কারণ ওরা গুলি করতে করতে আমাদের পিছু পিছু আসছিল। ওয়াপদার বাঁধ ছিল সমতল থেকে বেশ উঁচু। ফলে আমাদের ফায়ারগুলো সরাসরি ওদেরকে লাগার সম্ভবনা বেশি ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওরা বাধ্য হয়ে পিছু হঠে। তারপর অনেকটা হতাশ হয়ে যুমনার কূলের নিচ দিয়ে দক্ষিণ দিকে আমাদের গ্রামে ফিরে যায়।

ও দিকে আমাদের উত্তর ও দক্ষিণের পার্টির মুক্তিযোদ্ধারা সংবাদ পায় যে, সারিয়াকান্দি আক্রমণের মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্বদিকের পার্টির উপর খান-সেনারা প্রবলভাবে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিহত করেছে। ফলে বেলা ১২টার পর উক্ত দুই পার্টি পুনরায় খান-সেনাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং উভয়পক্ষের বিরতিহীনভাবে আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ চলতে থাকে। উক্ত সংবাদে আমরা ঐ দিনই বিকেল ৪টার দিকে আবার রামচন্দ্রপুরে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্পের দিকে রওনা দিয়ে সন্ধ্যায় ক্যাম্পে পৌছি। কিন্তু আমাদেরকে ঐ রাতে আর যুদ্ধে যেতে দেওয়া হলো না।

২৫/১১/৭১ ভোরে উঠেই অস্ত্র হাতে সারিয়াকান্দিতে যাওয়ার ইচ্ছায় তৈরি হয়ে আমরা সবাই রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাট পার হওয়ার উদ্দেশ্যে খেয়া নৌকায় উঠে মাঝ নদীতে গিয়েছি, এমন সময় বালুয়ারতাইড়ের মমতাজ মিঞা (যিনি ছাত্রলীগের একজন বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন ও মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় অর্গানাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন) এসে আমাদের খেয়া নৌকায় তাকে নেওয়ার জন্য বললেন এবং আরো বললেন যে, তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে গিয়ে ঠিক জায়গায় সেট করে দিবেন। কেননা কোন মুক্তিযোদ্ধা পার্টি কোথায় আছে সেটা তিনি জানেন। আমরা খেয়া নৌকা ফের কূলে এনে তাকে নৌকায় উঠিয়ে নিলাম এবং তার সঙ্গে আক্রমণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তারপর নদী পার হয়ে গোশাইবাড়ির ভেতর দিয়ে সারিয়াকান্দি অভিমুখে সবাই রওনা হলাম।

উল্লেখ্য, পাইকপাড়া গ্রামের বুদু নামের একটি ছেলে চটের ব্যাগে বেশ কিছু সিদ্ধ ডিম এবং দুধ-ভর্তি কয়েকটি বোতল নিয়ে আমাদের সাথে আসছিল। আমি তাকে আমাদের সাথে যেতে বার বার নিষেধ করলাম। কিন্তু সে কিছুতেই নিষেধ মানল না। আমরা গিয়ে ডা. আব্দুর রহমান সাহেবের বাড়ির সামনে হাফ-বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে (রাস্তার পূর্ব পাশে) সবাই এক লাইনে লম্বালম্বি হয়ে বসে লক্ষ করছি যে খান-সেনারা পালানোর জন্য দক্ষিণ দিকে বের হয়ে আসে কিনা। মমতাজ সামনে তারপর মুকুল এবং মুকুলের পরে আমি ও অন্যান্য। সবাই মিলে আমরা তের জন যোদ্ধা আর সাথে বুদু নামের সেই ছেলেটি। আমরা চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ সামনেই দুইজন খানসেনা বেরিয়ে এসে 'পজশান', 'পজশান' (পজিশন কথাটা পূর্ণাঙ্গ উচ্চারিত না করে) জোরে আওয়াজ করে উঠল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের চাইনিজ রাইফেলের গুলি বৃষ্টির মতো আমাদের উপর পড়তে থাকল। মুকুল ও আমি উভয়েই পাল্টা ফায়ার করতে থাকি। আমাদের পেছন হতে অন্যরা সবাই আশে-পাশে দৌড়িয়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পজিশন নিতে ব্যস্ত। হঠাৎ করে খান সেনাদের সাথে এভাবে মুখোমুখি হয়ে যাব এটা

আমরা কেউ যেমন ভাবিনি, খান সেনারাও হয়তো তেমনি ভাবেনি যে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে এভাবে তারা পড়ে যাবে। খানসেনা ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ১০/১২ হাত। যদিও রাস্তা এখানে পশ্চিম দিকে মোড় নেওয়ার ফলে উভয় পক্ষের কেউ কাউকে দেখতে পারছিলাম না।

যাই হোক, ওরা ছিল ১৯ জন এবং আমরা ছিলাম ১৩ জন। আমাদের লাইনের সামনে মমতাজ মিঞা খান-সেনাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ডান পাশের হাফ প্রাচীরটি লাফ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় খান-সেনাদের একটি বুলেট মমতাজ মিঞার মাথা ভেদ করে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মুকুল ও আমি ফায়ার দিচ্ছিলাম আর বসে বসেই পেছনের দিকে আসছিলাম। প্রাচীরের পাশ থেকে ৫/৬ হাত দক্ষিণে আসার পর খান সেনাদের কয়েকটি বুলেট আমার মাথার চুল ও কান স্পর্শ করে গেল বলে মনে হলো। মুকুল ডান দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে একটা ছোট ডোবা পার হয়ে ধানের ক্ষেতে লুকানোর চেষ্টা করল। অন্যদিকে আমি বৃষ্টির মতো আগত বুলেটের ঝড়ে আত্মরক্ষার জন্য পেছন দিকে চিত হয়ে শুয়ে সংজ্ঞা হারানোর মতো পড়ে থাকি। বুঝতে পারলাম আমার পাশের রাস্তার উপর আমার রাইফেলটা পড়ে আছে। আমি মরে গেছি ভেবে ওরা আমাদের আর গুলি করার প্রয়োজন মনে করল না কিংবা পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় আমার দিকে লক্ষই করেনি। আমি শুয়ে থেকেই একটু আড় চোখে চেয়ে দেখি আমার রাইফেলটা ধরেই ফায়ার করতে পারব। সামনেই দুইজন খান-সেনা দাঁড়িয়ে মুকুলের উপর গুলি করছিল। সে দৃশ্য আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি ওদের থেকে ৪/৫ হাত দক্ষিণে পড়ে আছি। তখন উঠে বসেই খান সেনাদের লক্ষ করে গুলি করি। ওদের দুইজনের দক্ষিণ পাশে যে ছিল তার গুলি লাগায় সে লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল। আর যারে গুলি লেগেছে তার লাফের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অন্যজনও পড়ে গেল। এ সুযোগে আমি দৌড় দিয়ে রাস্তা ক্রস করে পশ্চিম পাশে খড়ের টিবির আড়ালে গিয়ে পজিশন নিই। তার পশ্চিমে বাঁশ-ঝাড়ের ভেতর বুদু ও বেলাল পজিশন নিয়ে আছে, ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকা অন্য একজন খান সেনাকে বাগে আনার আশায়। বুদু আমাকে ডেকে খান সেনাটার অবস্থান বলল। আমি ওকে কয়েকটা গ্রেনেট চার্জ করার জন্য বললাম। বুদু তাই করল এবং খান সেনাটার প্রাণহীন ক্ষত-বিক্ষত দেহ ঐ ঘরের মধ্যেই পড়ে রইলো। আমার গুলিতে নিহত খান সেনার সঙ্গী সৈন্যটি তখন দক্ষিণ দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। তাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য পিছু পিছু আমিও দৌড়ে যাচ্ছিলাম। সে অনেকটা দূরে চলে যাওয়ায় দৌড়িয়ে তার পেছনে আর না গিয়ে আমি মথুরাপাড়ায় ওয়াপদার বাঁধের উপর আমাদের কাট-আপ পার্টির নিকট গেলাম। সেখানে তাদেরকে সর্তক থাকতে এবং খান-সেনাদের খতম করা জন্য কয়েকজনকে দেব-ডাঙ্গার দিকে যেতে বললাম।

ইতোমধ্যে আমাদের দলের আমিনুল ইসলাম (লাল) ও খাদেম আলীকে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারত হতে আর্মস এ্যামুনেশন আনার জন্য ঐ বাঁধ দিয়ে নদীর ঘাটে যাচ্ছিল। দেখা পেয়ে সংক্ষেপে যুদ্ধের অবস্থা বললাম এবং আমার রাইফেল নিয়ে লালকে দেবডাঙ্গার দিকে পলায়নরত খানসেনার অনুসরণ করতে বললাম। সে ভারতে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে দেবডাঙ্গার দিকে চলে গেল। এর ৪/৫ মিনিট পরে মুকুল সেখানে উপস্থিত হয়। সে আমাকে তার এস এল আর-টি দিয়ে আর তাড়াতাড়ি অন্যদের খোঁজ নেওয়ার কথা বলে উত্তর দিকে তার মামা বাড়ির দিকে রওনা দেওয়ার জন্য পেছন ফিরতেই দেখি তার নিতম্বে গুলি লেগেছে এবং রক্তে কালো প্যান্ট ভিজে গেছে। সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আমি সিদ্ধান্ত বাতিল করে মুকুলকে নিয়ে তার মামা বাড়িতে গেলাম এবং মথুরাপাড়ার আজিজার ডাক্তারকে ডেকে চিকিৎসার জন্য রেখে ছুটলাম আমাদের ক্যাম্প রামচন্দ্রপুরের দিকে। পথিমধ্যে নবাদরি চরের মধ্যে দেখি দেড়-দুই হাজার লোক লাঠি-শোটা নিয়ে একজন পশ্চিমা পুলিশ ও দুইজন রাজাকারকে বেশ দূর দিয়ে ঘিরে নিয়ে আছে। আমি আমার এস এল আর থেকে ব্রাশ ফায়ার করলাম এবং ওদেরকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দিলাম। ওরা তাদের রাইফেল আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আত্মসমর্পন করল। ওদের তিনটি রাইফেলের একটিতেও কোনো গুলি ছিল না। আমি রাইফেলগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে ওদেরকে বেঁধে নিয়ে রামচন্দ্রপুরের দিকে রওনা দিলাম এবং সেখানে পৌঁছে দেখি নারী-পুরুষ ছোট-বড় সবার চোখে পানি। ওরা শুনেছে আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের একজনও জীবিত নেই। তাছাড়া মমতাজের লাশ সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে পূর্বেই সংবাদ চলে গেছে। আমি সেখানে পৌঁছতেই আমাদের দলের সহকারী মুক্তিযোদ্ধা গোলাম রছুল (নয়ামিয়া) আমাকে ধরে ভীষণ কাঁদল এবং বাকিরা কোথায় জানতে চাইল। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি আমাদের সাত জনের কোনও খোঁজ পাইনি। ওকে শান্ত হতে বলে আমাদের লোকজনকে খোঁজার জন্য পুনরায় রওনা হলাম। অন্যদিকে কয়েকজন মুক্তিপাগল মানুষ ধৃত সেই পুলিশ ও দুইজন রাজাকারকে আমার হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে নদীর তীরে গিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করল। নদীর পানি লাল রংয়ে রঞ্জিত হয়ে সারিয়াকান্দি থানা দখলদার মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিল।

এদিকে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম, আমাদের সঙ্গে যাওয়া মমতাজ, হামিদ ও পাইকপাড়ার বুদু (যে দুধ ও ডিম মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল) শত্রুর বুলেটের আঘাতে নিহত হয়েছে। সারিয়াকান্দি সোনালী ব্যাংকের নিকটে নিহত হয়েছেন জলিল ভাই। সে বিমান বাহিনীতে চাকরি করত। তার গ্রামের বাড়ি ছিল কর্নিবাড়ি ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামে।

আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। পথিমধ্যে বেশ কয়েকবার দুটি বোমারু বিমান আমাদের উপর বার বার বোম্বিং করল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। কারণ বিমান দুটি কিছুটা দূরে থাকতেই আমরা কয়েকজন গুলি করতে থাকি। বিমান থেকে হ্যাভি মেশিন গানের গুলি ছুঁড়ল কয়েকবার। কিন্তু বোমা ও মেশিন গানের বুলেটগুলো বাঙ্গালি নদীর পানিকেই শুধু ঝাঁঝরা করল। কিছুক্ষণ পর বিমানগুলো চলে গেলে আমরা বাড়ির দিকে ফের রওনা হলাম। কুতুবপুর গ্রামের প্রবেশমুখেই দেখলাম শত শত নারী-পুরুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমাদেরকে দেখার জন্য এবং যুদ্ধের কথা শোনার জন্য।

যাই হোক তবে সেদিনের সাফল্যের ভয়াবহ দুঃখ-স্মৃতি ও সাথীদের কয়েকজনকে হারানোর ব্যথা আজো মনে হলে অশ্রুতে চোখ ভিজে উঠে। সেই সাথে উদ্বেলিত হই যখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি স্বাধীনতাপ্রিয় গণ-মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসার কথা মনে পড়ে।

(নোট: তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিল পত্র'; দশম খণ্ড অনুযায়ী সারিয়াকান্দি হানাদার মুক্তির তারিখ ২৮ নভেম্বর এবং মুক্তিযোদ্ধা মো. আনছার এর যুদ্ধের স্মৃতিকথায় তা ২৫ নভেম্বর।)

[**তথ্যসূত্র :** সারিয়াকান্দির ইতিবৃত্ত মো. জাকির সুলতান সোনা]

সাক্ষাৎকার : বীরবিক্রম এ. টি এম হামিদুল হোসেন তারেক

মিত্রবাহিনী বগুড়া শহরের ওপর চতুর্মূখী সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য এগিয়ে চলেছে– মহাস্থানগড় বগুড়া সড়ক ধরে একটি ব্রিগেড, ক্ষেতলাল হয়ে একদল, সান্তাহার কাহালু হয়ে আর একদল।

আমরা এগিয়ে চলেছি দক্ষিণদিকে, সুখানপুকুর, গাবতলী, সাজাদপুর হয়ে বগুড়া পুলিশ লাইনের পেছনে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের কাছে; উদ্দেশ্য বগুড়া ও ঢাকার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং মূল শহর দখল করা।

আমরা রাতেই রওনা হলাম। ৬ষ্ঠ গার্ড ব্যাটালিয়ান এবং আমরা আবার সেই পিটি ৭৬ ট্যাঙ্কে চড়ে এগিয়ে চলেছি। গ্রামের লোকেরা রাতের বেলায় হ্যারিকেন ও হ্যাজাক জ্বালিয়ে ট্যাঙ্ককে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এছাড়াও আমি বগুড়ার ছেলে। এসব রাস্তাঘাট খুব ভালো করে চেনাজানা আছে। পাকবাহিনী ধারনাও করতে পারেনি, এভাবে আমরা তাদের আউট ফ্লাঙ্ক করতে পারবো। জনগণের সমর্থন থাকলে কিনা হয়, এবার সেটাই প্রমাণ হলো।

মেজর জেনারেল লচমন সিং তাঁর 'ইন্ডিয়ান সোর্ড স্ট্রাইকস্ ইন ইস্ট পাকিস্তান' (পৃষ্ঠা/১১৬) বইতে আমাদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন ওয়ানস্ এগেইন আওয়ার মুক্তিবাহিনী গাইডস ওয়ান এক্সট্রিমলি ইউজফল টু কনডাক্ট আওয়ার ট্রপস সেফলি এন্ড এ ডিফিক্যাল্ট এণ্ড লং আউট ফ্লাঙ্ককিং মুড।'

১৪ ডিসেম্বরের রাত তিনটায় আমাদের ইউনিট করতোয়া নদী পার হয়ে বগুড়ার পুলিশ লাইনের পিছনে এসে পৌছুলো।

ইউনিটের সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও যানবাহনগুলো তখনও নদীর ওপারে। ভোরের প্রথম আলোয় এগুলো নদী পার হবে। নদীর এপারে গ্রামের কিনার ঘেঁষে আমরা অস্থায়ি প্রতিরক্ষা নিলাম। সারাদিন চলার পর সবাই ক্লান্ত সুতরাং সে রাতে আর অগ্রসর না হয়ে ওখানে রাত কাটিয়ে দিলাম।

কাক ডাকা ভোরে ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠে দেখি কর্নেল দত্ত থেকে আরম্ভ করে সবাই নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছে। কর্নেল দত্ত ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন 'বিপদ'। কিছুই বুঝতে পারছি না। শত্রুর আক্রমণ নেই, গোলাগুলি নেই, তাহলে বিপদ কোত্থেকে এল? প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে কর্নেল দত্ত'র দিকে তাকাতেই তিনি যা বললেন তাতে আমার গোটা শরীর বরফের মতো জমে গেল। আসলে বিপদ হলো, গত রাতে আমরা যে জায়গায় ঘুমিয়েছি এবং বর্তমানেও যেখানে আছি সেটা শত্রুর একটা 'মাইন ফিল্ড'। পুরো ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের লোকজন মাইন ফিল্ডের মধ্যে চলে এসেছে কিন্তু অসীম করুণাময়ের কৃপায় কেউ মাইনে পা ফেলেনি।

সত্যিই এটা একটা মিরাকল! অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটে যায় এ ধরনের ঘটনা। কর্নেল দত্ত আঙুল দিয়ে আমার পাশেই দু'টো উঁচু জায়গা দেখিয়ে দিলে তাঁকিয়ে দেখি, সত্যিই দুটো মাইন পোঁতা রয়েছে মাটির নিচে। মিত্রবাহিনীর লোকজন সবাই যে যেখানে আছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

কর্নেল দত্ত বললেন, মাইন অপসারণের দল শিগগির এসে পড়বে এগুলো তুলে ফেলতে।

মিনিট কয়েকের মধ্য হাজির হলো মাইন ডিটেকটর নিয়ে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার দল। বেশ কিছু সময় নিয়ে ওরা মাইনগুলো তুলে ফেললো। কিছুটা বিপদমুক্ত হলেই আমরা বেরিয়ে এলাম মাইন ফিল্ডের ভেতর থেকে। ইতোমধ্যে পিটি ৭৬ ট্যাঙ্কগুলো নদী পার হতে শুরু করেছে। ট্যাঙ্কগুলো পার হতেই কর্নেল দত্ত 'সি' কোম্পানি ও আমাকে আদেশ করলেন ট্যাঙ্কগুলোর সাহায্যে বগুড়া-ঢাকার পাকা মহাসড়কে 'রোড ব্লক' লাগাতে। ট্যাঙ্ক ট্রুপ কমান্ডারের সংগে শলাপরামর্শ করে পুলিশ লাইন থেকে প্রায় মাইল দু'য়েক দূরে মাঝিরা নামক গ্রামে আমরা পজিশন নিলাম। ট্যাঙ্কগুলো 'হ্যালডাউন' পজিশনে পুরোদমে নিজেদের লুকিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বসে রইল। আমরা যে এভাবে চুপিচুপি পুলিশ লাইনের পেছনে এসেছি এটা শত্রু একদম বুঝতে পারেনি। সুতরাং যা হবার তাই হলো। বেলা এগারোটার দিকে বগুড়া থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য দু'টো জিপ ও একটি ট্রাকের ছোট্ট কনভয় আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রস্তুত আমরা আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসতেই ফায়ার শুরু করলাম। ট্যাঙ্কগুলোও গোলা ফায়ার করল এবং সেইসঙ্গে ট্যাঙ্কের এম জিও অনর্গল গুলিবর্ষণ শুরু করল। আকস্মিক আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই ওদের দু'টো জিপ উল্টে পড়ে গেল এবং আগুন ধরে গেল। শত্রুর অনেকে ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দু'চারজন ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে গ্রামের দিকে দৌড় দিল কিন্তু গুলিবৃষ্টিতে এগুতে পারল না সিনেমার ক্যারিকেচারের মতো দেহ বাঁকা করে পড়ে গেল ধান ক্ষেতের ভেতরে। শত্রুপক্ষ থেকে কোনও ফায়ার এল না কারণ ওদের সে সুযোগ আমরা দেইনি।

গোলাগুলি বন্ধ হতেই আমরা ছুটে গেলাম রাস্তায় উল্টানো জিপটার কাছে দেখলাম পাকবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ পড়ে আছে। মনে হলো, সেই হবে এই কনভয় কমান্ডার।

ট্রাকের কাছে এগুতেই দেখি আরও একজন মৃত সৈনিক। তার একটি পা হাঁটুর ওপর থেকে পুরো উড়ে গেছে। আরও অনেক মৃতদেহ আশেপাশে ছড়ানো পোড়া মাংসের গন্ধ। ধিকধিক আগুন জ্বলছে, উল্টে যাওয়া গাড়িগুলো থেকে গোটা এলাকায় কবরের নিস্তব্ধতা। এলাকাটা পুরোভাবে সার্চ করার জন্য আমরা তৈরি হতেই, আমার ডাক এলো কর্নেল দত্ত'র কাছ থেকে। এখনই আমাকে ব্যাটেলিয়ন হেড কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হবে। পুরো 'রোড ব্লক' কোম্পানি ও ট্যাঙ্কগুলো ওখানে রইলো। শুধু আমি আমার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ব্যাটেলিয়ন হেড কোয়ার্টারে চলে এলাম। কর্নেল দত্ত বললেন, আমাকে সঙ্গে করে তিনি পুলিশ লাইনের দিকে যাবেন।

ইতোমধ্যে ইউনিটের অন্যান্য কোম্পানিগুলো পুলিশ লাইনের দিকে রওনা দিয়েছে। একটা ট্যাঙ্কের ওপরে চড়ে আমরা দু'জন অগ্রসর হলাম। অর্ধেক রাস্তাও যেতে পারিনি। পুলিশ লাইন থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল। গুলি, পাল্টাগুলি দু'পক্ষের একটানা এম জি ও এল এম জি'র শব্দ। মর্টারের গোলার আওয়াজ। ট্যাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। দৌড়ে একটা আম গাছের আড়ালে গেলাম, পিঙ করে একটা বুলেট আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। গরম একটা ছ্যাঁকা লাগলো আমার কানে। ঝট করে হাত দিয়ে দেখলাম কানটা আছে না নেই।

কর্নেল দত্ত আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

আমিও হাসলাম।

দু'পক্ষের গোলাগুলি আওয়াজ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। শব্দে কান পাতা দায়। শরীরে রক্তের জোয়ার এসেছে, যুদ্ধের নেশার জোয়ার। মৃত্যু ভয় কোথায়? কর্নেল দত্ত'র সঙ্গে আমরা আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। তিনি তাঁর ওয়ারলেসে সম্মুখে যুদ্ধরত কমান্ডারদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কথা বলছেন ও নির্দেশ দিচ্ছেন। আমরা এখন শত্রুর মুখোমুখি সামনে সব কিছু দেখতে পেলাম। সামনে বগুড়া টেকনিক্যাল কলেজে শত্রুর শক্ত ঘাটি। প্রচণ্ড ফায়ার আসছে সেখান থেকে। বামে বগুড়ার হেলিপ্যাড, পুলিশ লাইন ও তার সংলগ্ন গ্রামে শত্রুর শক্ত ডিফেন্স। এখন দু'পক্ষ মুখোমুখি যুদ্ধ চলছে মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক কিছুতেই এগুতে পারছে না। কারণ টেকনিক্যাল কলেজসংলগ্ন এলাকায় শত্রুর এন্টিট্যাঙ্ক ডিফেন্স খুব শক্ত। মুহূর্মুহু ১০৬ মিলিমিটার রিকয়্যার লেস রাইফেল বা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান থেকে ফায়ার করা হচ্ছে। আমরা এক ইঞ্চি মাটিও এগুতে পারলাম না সামরিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'শত্রুর স্টবর্ণ রেজিসটেন্স'। একজন অধিনায়কের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত স্থান যুদ্ধক্ষেত্র। কারণ 'পিস টাইম' এ অনেক 'কাগুজে বাঘ' দেখা যায় যারা মানচিত্রের ওপরে অনেক হাতি-ঘোড়া মারে, যুদ্ধের সময় ইঁদুরও মারতে পারে না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে কর্নেল দত্ত 'কাগুজে বাঘ' নন, এই প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেও দেখলাম তিনি ধীর- স্থির এবং শান্তভাবে আমাকে ডাকলেন এবং পুরো শত্রুর ডিফেন্স দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আমি যেন বাম পাশ দিয়ে নদীর বগল ঘেঁষে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি, তাহলে শত্রুর অনেকটা পিছনে চলে যাব এবং এতেই শত্রু যখন দেখবে তার ডেপথ পশ্চাৎপাশ আক্রান্ত হয়েছে, তখন তাদের ভেতর কনফিউশনের সৃষ্টি হবে এবং এই সুযোগ নিয়ে সম্মুখ ও ডান দিকে কিছুটা ডায়াগোনাল এ্যাটাকে এ্যাটাক করে শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে। আমাকে তিনি আজ রাতের আঁধারে শত্রুর পিছনে 'ইনফিলট্রেট' করতে বললেন। সারাদিন গোলাগুলি চললো দু'পক্ষের কিন্তু মিত্রবাহিনী সাফল্যজনক কোনও ফল পেলো না। মিত্রবাহিনীর গোলার আঘাতে টেকনিক্যাল কলেজ ও তার আশপাশে আগুন ধরে গেল। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগলো। পাকসেনারা তবুও তাদের পজিশন হতে একটুও নড়লো না। অবিরাম গুলি চালিয়ে যেতে লাগলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতেই আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ি অতি সন্তর্পণে ইনফিলট্রেট করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগোতে থাকলাম। গ্রামে লোকজন নেই, অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে ভেগেছে। শিয়াল কুকুরও নেই। থমথমে ভৌতিক পরিবেশ। দূর থেকে ভেসে আসছে

বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির শব্দ। আমরা এগোচ্ছি খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে, কোনও শব্দ না করে শামুকের গতিতে এগিয়ে চলেছি। কোথায় বসে আছে শত্রু কে জানে?

বেশ সময় নিয়ে একটা গ্রাম পার হলাম। 'এরপর চারশ গজ খোলা মাঠ, তারপর অন্ধকার আবস্থায় আরও একটা গ্রাম দেখা যায়। ঐ গ্রামের ভেতর দিয়ে আরও চারশ' গজ পিছনে গেলেই পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে যাওয়া যাবে।

শহরে কোনও আলো নেই, সম্পূর্ণ ব্লাক আউট, তাই শহর ঘেঁষে শত্রুর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার কোনও উপায় নেই। খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে না গিয়ে আমরা গ্রামের ধার ঘেঁষে একটু ঘুরপথে এগিয়ে চললাম। গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন-বুঝলাম এই শীতের মধ্যেও আমি ঘেমে উঠেছি। স্নায়ুর ওপরে প্রবল চাপ পড়েছে। বুঝতে পারলাম আমরা শত্রুর ডেপথ পজিশনে চলে এসেছি। শুয়ে পড়ে শত্রুর অবস্থান লক্ষ করতে চেষ্টা করলাম। কিছু দেখা বা বোঝা গেল না। সামনে আর এগোতে সাহস হলো না। কে জানে কোথায় শত্রু ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে। হয়তো বা 'ট্রিপ ফ্লেয়ার' এ পা পড়বে অথবা খোদ শত্রুর ট্রেঞ্চের সামনে গিয়ে পড়বো। বসে বসে এক পা, দু'পা করে এগিয়ে গেলাম আরও ভালো করে লক্ষ করার জন্য। সামনে একটা বাড়ি। বাড়ির বাম দিকে আমরা। বাড়িটা পার হতে পারলে হয়তো কিছুটা সুবিধা হতো। ভাবছি আরেকটু এগিয়ে যাব কিনা।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা কাশির শব্দ হলো। বরফের মতো জমে গেলাম আমরা। শব্দের উৎস কতদূরে তা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে দেখতে লাগলাম। তিরিশ গজ দূরেই ঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। এক ছায়ামূর্তি হেঁটে এল বাড়ির সামনের মাঠে। অস্পষ্টভাবে দেখা গেল তাকে। হাত দিয়ে ইশারা করে পাশের জনকে দেখিয়ে দিলাম। সেও তার পাশের জনকে দেখিয়ে দিল। কিন্তু মুশকিল হলো, এরা কারা! পাকসেনা না কি নিরীহ গ্রামবাসি?

চিন্তায় পড়ে গেলাম কি করবো। ঠিক তখনই স্পষ্ট শুনলাম, 'ইয়ে দিলওয়ার ইতথুআ।' পাঞ্জাবি জবান, কোন সন্দেহ নেই। গর্জে উঠলো আমার হাতের এস এম জি ছায়ামূর্তি লক্ষ করে। আমার সাথেই আমাদের সকলেরই রাইফেল গর্জে উঠলো বাড়িটা লক্ষ করে।

'ইয়া আল্লাহ' বলে আর্তচিৎকার করে উঠলো পাঞ্জাবি সেনারা।

বাড়ির ডান দিক থেকে ফায়ার এল আমাদের ওপর। ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের ফ্লাশ লক্ষ করে আমরাও ফায়ার করলাম, আমাদের দু'চার জন গ্রেনেড ছুড়ে মারল। প্রচণ্ড শব্দে চারদিক প্রকম্পিত করে গ্রেনেড ফাটলো।

হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। আমরা দৌড়ে বাড়ির ভেতরে গেলাম। মাটির দেয়ালের বাড়ি। উঠোনে দু'জনের লাশ পেলাম। বুঝলাম, বাকিরা পালিয়েছে। আমাদের মিশন সাফল্য লাভ করেছে। এবার পুলিশ লাইন লক্ষ করে সকলকে এলোপাথাড়ি ফায়ার করতে বললাম যাতে শত্রু বুঝতে পারে তাদের ডেপথ পজিশন আক্রান্ত হয়েছে। এরপর ভাবলাম, এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। যে কোনও সময় শত্রু আমাদের

ঘিরে ফেলতে পারে। আধা ঘণ্টা ধরে আমরা শত্রুর পিছনে হ্যারাসিং ফায়ার দিলাম। ঠিক এমন সময় আমাদের ডান দিকে এল শত্রুর আক্রমণ। আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল। নারায়ে তকবির-আল্লাহ আকবর, লড়কে লেঙে পাকিস্তান।' তারপর ফায়ার।

টুটু রাইফেল, টুয়েলভ বোর বন্দুক ও পাইপগানের সম্মিলিত গুলিবর্ষণ। এরাতো পাঞ্জাবি নয়, তবে কারা আমরাও বিস্মিত হলাম এ ধরনের আক্রমণে। কে যেন চিৎকার করে বললো, এরা বিহারি। আমরা বিহারি কলোনিতে এসেছি। আমরাও পাল্টা জবাব দিলাম। শাহনাজ ও দু'চারজন দৌড়ে গেল বিহারিদের আক্রমণ ঠেকাতে ঠিক সে সময়ই শত্রুপক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা এসে পড়ল আমাদের পজিশনের প্রায় কাছেই। প্রচণ্ড শব্দে আমরা হকচকিয়ে গেলাম। একদিকে শত্রুপক্ষের গোলাগুলি, অন্যদিকে বিহারীদের আক্রমণ। শত্রুকে কনফিউশন করতে এসে নিজেরাই কনফিউশনের শিকার হলাম। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আমার দল। কে কোথায় গেল বোঝা গেল না। শত্রুর গোলা এসে পড়ছে অনবরত। আমরা পিছনে হটে গেলাম। নিজের দলকে সংঘবদ্ধ করা এই অন্ধকারে দুরূহ ব্যাপার হলো। মোট চারজনকে পেলাম আমার পাশে, তবুও আমরা ফায়ার চালিয়ে যেতে লাগলাম। ফায়ার ও পাল্টা ফায়ারে ধীরে ধীরে কেটে গেল বাকি রাত।

আকাশে ভোরের আলো ফুটলো। আমরা ফিরে চললাম ব্যাটেলিয়নে। সবাই এল কিন্তু শাহ নেওয়াজকে পেলাম না। কেউ বলতে পারলো না ও কোথায়? ওর সঙ্গে যারা ছিল তারাও বললো, গোলাগুলির মাঝে কে কোথায় ছিটকে গেছে কেউ জানে না।

আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অকুতোভয় একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল শাহ নেওয়াজ। আমার সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই ছায়ার মতো ছিল। কোথায় গেল ও? হয়তো অন্য কোনো পথে ফিরে গিয়েছে এই আশা নিয়ে ব্যাটালিয়নে ফেরত এলাম। এ দিক মিত্রবাহিনী কিছুটা সফলতা পেয়েছে। হেলিপ্যাড এর কিয়দংশ দখলে এসেছে। সিক্স গার্ড ব্যাটালিয়ন প্রতিরক্ষা নিয়ে বসে আছে সেখানে। বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি তখনও চলছে। কর্নেল দত্ত আমাকে তলব করলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখি একজন সুটেড বুটেড ভদ্রলোক, হাতে একটি টেপ রেকর্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে কর্নেল দত্ত বললেন, তিনি আকাশবাণীর একজন সাংবাদিক, তুমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কিভাবে জেনারেল নজর হোসেন শাহ'কে এ্যাম্বুশ করেছিলে এবং তোমার অভিজ্ঞতার ওপর ইন্টারভিউ নেবেন, তোমার এই ইন্টারভিউ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে 'অলইন্ডিয়া' রেডিও থেকে প্রচার করা হবে। আমি আমার ইন্টারভিউ দিলাম, সাংবাদিক সাহেব ওটা রেকর্ড করলেন পরে জেনেছিলাম ওটা সত্যি সত্যিই আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছিল। কারণ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকাস্থ সেক্রেটারিয়েটে একটা কাজে এসেছিলাম একজন ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে। ভদ্রলোক মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে ছিলেন। আমার নাম শুনে বললেন, আমি সেই ব্যক্তি কিনা যার সাক্ষাৎকার আকাশবাণী থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে প্রচার করা হয়েছিল, একজন পাকিস্তানি জেনারেলকে এ্যাম্বুশ করার ব্যাপারে। আমার সম্মতিসূচক জবাবে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

আমরা প্রতিরক্ষা অবস্থানে বসে আছি। কর্নেল দত্ত দেখাচ্ছিলেন টেকনিকাল কলেজের শত্রুর পজিশন। ঠিক এই সময়ই শত্রুর একটি ট্যাঙ্ক ফুলস্পি ফায়ার করতে করতে বগুড়া-ঢাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে এল। উদ্দেশ্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া। আকস্মিক আক্রমণ হবে, বোকামীও বটে। ট্যাঙ্কটা প্রায় আমাদের অবস্থানের বিশ গজ দূরে চলে এসেছে। ঠিক এ সময়ই মিত্রবাহিনীর একটা ট্যাঙ্কের গোলা আঘাত করলো ওটাকে। মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল শত্রুর ট্যাঙ্কে। ওপরে 'টার্গেট' খুলে ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে দু'জন লাফিয়ে পড়লো। লাফিয়ে পড়েই দুই গড়ান দিয়ে সামনের একটা গর্তে পজিশন নিয়ে আমাদের ওপর অবিরাম ফায়ার করতে লাগলো। কর্নেল দত্ত এবার আমাকে ও আর একজন শিখ ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিলেন ওদের সারেন্ডার করাতে। আমরা চার পাঁচজন আস্তে আস্তে ওদের পজিশন ঘিরে ফেললাম। ওদের মাথার ওপর দিয়ে দু'বার ফায়ার করে বললাম সারেন্ডার করতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ওরা বাঙালি ও শেখ মুজিবের প্রতি যত অকথ্য ভাষা আছে তা বর্ষণ করতে লাগলো এবং সেই সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যে ফায়ার করা অব্যাহত রাখলো। যুদ্ধের পরিভাষায় যাকে বলে 'রাক্যারেজ' এটাই পেয়ে বসেছিল ওদের। আমি বুঝতে পারছি মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে ওদের। মিত্রবাহিনীর এক সদস্যের গুলিতে দু'জন আহত হলো। তারপর মৃত্যুর আগেই দু'বার লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললো, 'বানচোত, গাদ্দার বাঙালি।'

এই ঘটনা ছিল পুলিশ লাইনে পাকবাহিনীর শেষ যুদ্ধ। ইতোমধ্যে মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক টেকনিক্যাল কলেজ দখল করে মূল শহরের দিকে এগিয়ে গেছে। আমরা টেকনিক্যাল কলেজে এসে ঘাঁটি গাড়লাম। পুলিশ লাইনে গিয়ে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পনরত সৈনিকদের দেখলাম।

পুলিশ লাইনের সামনের মসজিদের ভেতরে দু'জন পাকবাহিনীর অফিসারকে পেলাম। তাদেরকে মিত্রবাহিনীর হাতে তুলে দিলাম।

রাতটা টেকনিক্যাল কলেজে কাটিয়ে দিলাম। আগামীকাল ১৮ ডিসেম্বর আমরা মূল শহর দখলের জন্য এগিয়ে যাব। যদিও ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তবুও বগুড়াতে সেটা কার্যকর হয়নি। বগুড়াতে পাকবাহিনী ১৮ তারিখ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চালিয়েছে। আমাদের ইউনিট পুলিশ লাইনে গিয়ে উঠলো। পুরো পুলিশ লাইন গার্ড রেজিমেন্ট থাকার জন্য দখল করলো। বগুড়ার পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলো। শেষ হলো বগুড়ার যুদ্ধ।

মুক্তিযোদ্ধার তালিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ ভাদ্র ১৪১০/৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

নং মুবিম/প্রঃ৩/ মুক্তিযোদ্ধা/গেজেট/২০০৩/৪৭৯–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business এর Schedule-I তথা Allocation of Business এর ৪৩(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তৎপরিপ্রেক্ষিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নির্ভুল ও সঠিকভাবে চূড়ান্ত-করণের মাধ্যমে গেজেট প্রকাশের উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করিল।

২। এই তালিকা জাতীয় কমিটির সুপারিক্রমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৩। গেজেট প্রকাশিত এই তালিকা মুক্তিযোদ্ধাদের "চূড়ান্ত তালিকা" হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। এই তালিকায় যদি কোন অমুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহা যদি যথাযথ তদন্তে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে প্রকাশিত তালিকা হইতে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করা হইবে এবং তাঁহার অনুকূলে প্রদত্ত সাময়িক সনদপত্র (যদি প্রদান করা হইয়া থাকে) বাতিল করা হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫। গেজেটে প্রকাশিত এই তালিকার ভিত্তিতে পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল সনদপত্র প্রদান করা হইবে যাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষর করিবেন এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

মোঃ মুনীর ইকবাল হামিদ

উপ-সচিব (প্রশাসন)

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা

উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া, বিভাগ, রাজশাহী

১৭৬২.	মোঃ নূরুনবী	হাবিবুর রহমান	জগন্নাথপাড়া
১৭৬৩.	মোঃ আব্দুল বারী	জমির উদ্দিন	চকধলী
১৭৬৪.	মোঃ আব্দুল হামিদ	দলিল উদ্দিন	চকধলী
১৭৬৫.	মোঃ মতিউর রহমান	মমতাজ আলী	সুঘাট
১৭৬৬.	কে এম দেলোয়ার হোসেন	ফজলুর রহমান	বড়াইদহ
১৭৬৭.	শাহজাহান আলী	শামসুল হক	বাড়ইদহ
১৭৬৮.	দলিলুর রহমান	আঃ বাছেত	খন্দকার টোলা
১৭৬৯.	আঃ রউফ খান	বাহাদুর আলী	গুয়াগাছী
১৭৭০.	আঃ রাজ্জাক	বাহাদুর আলী	গুয়াগাছী
১৭৭১.	মওলা বক্স সরকার	শাহবাজউদ্দিন	ছাতিয়ানী
১৭৭২.	আবদুস সবুর	মছের আলী	জামনগর
১৭৭৩.	হাফিজুর রহমান	মালেকউদ্দিন	সুঘাট
১৭৭৪.	তোফাজ্জল হোসেন	জহির উদ্দিন	মমিনপুর
১৭৭৫.	নরোত্তম সরকার	নগেন্দ্রনাথ	চাঁদপুর
১৭৭৬.	রফিকুল উদ্দিন	আব্দুল গফুর	খন্দকারটোলা
১৭৭৭.	ইউসুফ উদ্দিন	আয়েজউদ্দিন	মির্জাজুর
১৭৭৮.	মৃত হাবিবুর রহমান	আছের উদ্দিন	খাগা
১৭৭৯.	রবীন্দ্রনাথ সরকার	নবদ্বীপ	কুসুম্বী
১৭৮০.	এম এ হান্নান	এম এ বাছেদ	আফরাতগাড়ী
১৭৮১.	সুরেন্দ্র চন্দ্র সিং	চরণ সিং	গোড়তা
১৭৮২.	আঃ খালেক	আবুল হাসেম	বড়ইদহ
১৭৮৩.	আঃ মালেক	আবুর হাসেম	বড়ইদহ
১৭৮৪.	আবু জাফর	হাছেন আলী	রামনগর
১৭৮৫.	আইয়ুব হোসেন	লেদু শেখ	দড়িপাড়া
১৭৮৬.	আঃ ছাত্তার	আঃ রহমান	গাড়ীদহ
১৭৮৭.	ওবায়দুর রহমান	অছিম উদ্দিন	বলতাপাড়া
১৭৮৮.	সিরাজুল ইসলাম	হজরত আলী	মমিনপুর
১৭৮৯.	মনমত চন্দ্র পাল	হরিবন্ধু পাল	কল্যাসী
১৭৯০.	আকরাম হোসেন খান	খিজির উদ্দিন খান	জয়লাজুয়ান
১৭৯১.	আবু ছাইদ সরকার	এরফান আলী	চকধলী

১৭৯২.	আবদুল বারী	আবদুর রশীদ	চকধলী
১৭৯৩.	মোহাম্মদ আলী	ছবের উদ্দিন	চকধলী
১৭৯৪.	আঃ সোবহান	হাসান আলী	চকধলী
১৭৯৫.	মোঃ মহসীন রেজা	মফিজউদ্দিন	চকধলী
১৭৯৬.	মোজাম্মেল হক	আফজউদ্দিন	চকধলী
১৭৯৭.	রফিকুল ইসলাম	আঃ রশিদ আকন্দ	চকধলী
১৭৯৮.	এস এম শাহজাহান আলী	পাওমোছা	জয়নগর
১৭৯৯.	এস এম শাহাদৎ হোসেন	আলীমুদ্দীন	গুয়াগাছী
১৮০০.	সামছউদ্দিন	আজিজার রহমান	চকধলী
১৮০১.	আবুল কালাম	আঃ ছামাদ	দলিল
১৮০২.	আবির হোসেন	কছিমউদ্দিন	পাচদেউলী
১৮০৩.	আলাল উদ্দীন	আমজাদ হোসেন	চুয়াপাড়া
১৮০৪.	লেঃ নাঃ মোঃ রজব আলী	আঃ ছোবাহান	সিমলা সাতবাড়িয়া
১৮০৫.	পরিমল চন্দ্র	রশিক লাল	হালাগাড়ী
১৮০৬.	সতীন্দ্র নাথ	জগন্দ্রেনাথ	বিশালপুর
১৮০৭.	আকবর আলী	মোজাহার আলী	ররোয়া
১৮০৮.	কাজী ইমরুল কায়েম	নূরুল হদা	সীমাবাড়ী
১৮০৯.	আঃ ছাত্তার মল্লিক	শামছুল মল্লিক	সীমলা
১৮১০.	আশরাফ উদ্দীন সরকার	সামস উদ্দীন	ধনকুন্ডি
১৮১১.	সাইদুর রহমান	রজব আলী	ইকাধুকুরিয়া
১৮১২.	টি এম আমিনুর রহমান	কুড়ান উদ্দীন	সীমানাড়ী
১৮১৩.	কাজী মোঃ আসাদুল	কাজী নূরুল হুদা	সীমাবাড়ী
১৮১৪.	ম্যারেব আলী	ফয়েজ উদ্দীন	চককেশব
১৮১৫.	মৃত আঃ মোত্তালিব	আঃ আজিজ	ধনকুন্ডি
১৮১৬.	আজিজুল ইসলাম	আকিমুদ্দীন	সীমাবাড়ী
১৮১৭.	ইসমাইল হোসেন	এম বি ওবায়দুর	সীমাবাড়ী
১৮১৮.	নজরুল ইসলাম	আঃ জুব্বার	কালিয়াকের
১৮১৯.	মীর বকস	মোবারক আলী	কালিয়াকের
১৮২০.	অতুল চন্দ্র শাহা	যুধিষ্ঠীর চন্দ্র	বেতগাড়ী
১৮২১.	আবদুল বারী	বুজরক	ভাটরা
১৮২২.	আবুদুর রশিদ	আলতাফউদ্দীন	ভীধজানি
১৮২৩.	মকবুল হোসেন	মফিজ উদ্দীন	ভালপুকুরিয়া
১৮২৪.	মমতাজুর রহমান	শুকুর মাহমুদ	চৌবাড়িয়া
১৮২৫.	মমতাজুর রহমান	মোজাহার আলী	খানপুর
১৮২৬.	মমতাজুর রহমান	ভোলা মণ্ডল	শামপুর দহপাড়া
১৮২৭.	মোসলেহ উদ্দীন	আঃ জোববার	ভাটরা
১৮২৮.	আব্বাছ আলী	আঃ ছামাদ	খানপুর
১৮২৯.	আজিমদ্দীন	বাহাদুর আলী	শালফা

১৮৩০.	ছাবেদ আলী	আছমতুল্লাহ	চকখাগা
১৮৩১.	এম এ গনি	জামাত আলী	আটরা
১৮৩২.	খবির উদ্দিন	আরজউদ্দীন	মির্জাপুর
১৮৩৩.	নজরুল ইসলাম	মমতাজ উদ্দীন	মির্জাপুর
১৮৩৪.	ফরমান আলী	গরীবুলাহ	ঘোলাগাড়ী
১৮৩৫.	মকবুল হোসেন	তছির উদ্দিন	সাধুবাড়ী
১৮৩৬.	মকবুল হোসেন	ছফের উদ্দীন	ভাদাইশপাড়া
১৮৩৭.	যোগেশ চন্দ্র রায়	গনেশচন্দ্র	খামারকান্দি
১৮৩৮.	সাইফুল ইসলাম	জোববার আলী	পারভবানীপুর
১৮৩৯.	সুভাস দত্ত রায়	গনেশ দত্ত রায়	খামারকান্দি
১৮৪০.	আঃ রশীদ সরকার	কামাল উদ্দীন	পারভবানীপুর
১৮৪১.	আজিজার রহমান	ময়েজউদ্দীন	পারভবানীপুর
১৮৪২.	আবুল হোসেন	জামাল উদ্দীন	পারভবানীপুর
১৮৪৩.	নূরুল ইসলাম	জোনাব আলী	পারভবানীপুর
১৮৪৪.	সেকেন্দার আলী	গণ্ডিতা মোল্লা	পারভবানীপুর
১৮৪৫.	আবদুর রহমান সরকার	মহির উদ্দিন	ঝাঝর
১৮৪৬.	নজরুল ইসলাম	বলাই মণ্ডল	ঝাঝর
১৮৪৭.	মকবুল হোসেন	জবানী	সুবলী
১৮৪৮.	রশীদুল হক	দবিরউদ্দীন	দশশিকা পাড়া
১৮৪৯.	তমিজ উদ্দীন	জহির উদ্দীন	ভাটরা
১৮৫০.	এ টি এম মাবুবুর রহমান	মালেক মিঞা	ভাটরা
১৮৫১.	মিজানুর রহমান	সফের উদ্দীন	গুয়াগাছী
১৮৫২.	কে এম আমিনুল ইসলাম	হানিফ উদ্দীন	গুয়াগাছী
১৮৫৩.	আবদুর রহমান	সানাউল্লাহ	জয়নাজুয়ান
১৮৫৪.	মোজাম্মেল হক তরফদার	পর্বত আলী	খেরুয়া
১৮৫৫.	সিরাজ উদ্দীন (সোহরাব)	ময়েজউদ্দীন মণ্ডল	ভাদড়াশ
১৮৫৬.	আনোয়ার হোসেন	জামাল উদ্দীন	মালিহাটা
১৮৫৭.	মোজাফ্ফর হোসেন	মোশাররফ হোসেন	মালিহাটা
১৮৫৮.	ঈমান আলী	ফয়েজ উদ্দীন	বাগড়া
১৮৫৯.	আনোয়ার হোসেন	রিয়াজ উদ্দীন	রনবীর বাল
১৮৬০.	তরনী কান্ত বারড়ী	বনবিহারী বারড়ী	ঘোসপাড়া
১৮৬১.	বিল্লাহ বকুল	আবুর হোসেন	জগন্নাথপাড়া
১৮৬২.	মৃত শাহজাহান আলী	ফরজ আলী	খন্দকার পাড়া
১৮৬৩.	মজিবর রহমান	মশমতুল্লাহ	উলিপুর
১৮৬৪.	আবদুল গণি	কাওছার আলী	বারদয়ারীপড়া
১৮৬৫.	আবদুল আজিজ	জকের আলী মন্সী	হাজিপুর
১৮৬৭.	আল ইরাকী	আঃ গফুর আকন্দ	মুন্সীপাড়া
১৮৬৮.	মৃত আবদুস ছাত্তার	রহিম বক্স	বিনোদপুর

১৮৬৯.	নিমাই চন্দ্র ঘোষ	মৃত ব্রজগোপাল ঘোষ (ভোলা ঘোষ)	ঘোষপাড়া
১৮৭০.	মোঃ ছিদ্দিক হোসেন	মৃত সাদেকুল সরদার	সরদার পাড়া
১৮৭১.	মৃত আঃ রাজ্জক ভূইয়া	মৃত আফজাল হোসেন ভূইয়া	রামচন্দ্রপুর
১৮৭২.	ইয়ার মোহম্মদ	মৃত রেজ্জাক আলী	ধড়মেকাম
১৮৭৩.	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	শঠিবাড়ী
১৮৭৪.	নিতাই চন্দ্র	মৃত রশিক লাল	উত্তর পেচুল
১৮৭৫.	মোঃ জাফর উল্লাহ খান	মৃত খিদির উদ্দিন খান জয়লাজুয়ান	জয়লাজুয়ান
১৮৭৬.	মৃত আবুল হোসেন	মৃত আজিমুদ্দিন	ধওয়াপাড়া
১৮৭৭.	মৃত নূর মোহাম্মদ	মৃত নওশের আলী	ভবানীপুর
১৮৭৮.	মোঃ রমজান আলী	মৃত হোসেন আলী	চকনসীর
১৮৭৯.	এ এইচ এম আনিছুর রহমান	ডাঃ মৃত আজিজুল হক	সরদার পাড়া
১৮৮০.	শাহ মোঃ শায়খুল বারী	মৃত শাহ আঃ বারী	মুন্সী পাড়া
১৮৮১.	শেখ বাদশা মিঞা	মৃত আকিল উদ্দিন	রামচন্দ্রপুর
১৮৮২.	মোঃ আফছার আলী	মৃত তছির উদ্দিন	কচুয়াপাড়া
১৮৮৩.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত মালেক উদ্দিন	ভীমজানি
১৮৮৪.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত ফজেল মণ্ডল	খানপুর
১৮৮৫.	মোঃ আনার আলী	মৃত ইসমাইল হোসেন	ঘড়মকাম
১৮৮৬.	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত ওমর আলী	বিরইল
১৮৮৭.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত মোজাহার আলী	দুবলাগাড়ী
১৮৮৮.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আজিমুদ্দিন	ফুলজোড়
১৮৮৯.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত জাবেদ আলী	জোড়গাছা
১৮৯০.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত ছবেদ আলী	সুঘাট
১৮৯১.	মোঃ হযরত আলী	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	ফুলজোড়
১৮৯২.	মোঃ আফছার আলী	মৃত আনোয়ার হোসেন	দুবলায়
১৮৯৩.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত আঃ আজিজ	বিলনোথার
১৮৯৪.	মোঃ আব্দুল হামিদ	মৃত হবিবর রহমান	পারভবানীপুর
১৮৯৫.	মোঃ খয়রাত আলী	মৃত রমজান আলী	পারভবানীপুর
১৮৯৬.	মোঃ সিরাজ উদ্দিন (সোহরাব আলী)	মৃত ময়েজ উদ্দিন	ভাদরা
১৮৯৭.	মোঃ জাফর হোসেন	মৃত হাসান প্রাং	গাড়ীদহ
১৮৯৮.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত আব্বাস আলী	মদনপুর

উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

১৮৯৯.	মোঃ আব্দুর রশিদ প্রাং	মোঃ নবীর উদ্দিন প্রাং	দুর্ব্বগাড়ী, মুয়ইল
১৯০০.	মৃত আব্দুল হাই সরকার	মৃত জামাত উল্যা সরদার	বরঙ্গাশনি, পাইকড়
১৯০১.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত তালেব উদ্দিন	চাঁদপুর, দুর্গাপুর

১৯০২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মহির উদ্দিন	উলট্ট, কাহালু
১৯০৩.	মোঃ আঃ লতিফ মণ্ডল	মৃত আলহাজ্ব মজরতুল্লাহ মণ্ডল	দুর্ব্বাগাড়ী, মুরইল
১৯০৪.	মোঃ আব্দুল সামাদ	মৃত ইব্রাহীম আলী সরকার	কল্যাণপুর, নারহট্ট
১৯০৫.	মোঃ আবুল হোসেন (বি.এ)	মৃত জসিম উদ্দিন মৃর্ধা	সোনারপাড়া, জামগ্রাম
১৯০৬.	মোঃ মোশারফ হোসেন	ছলেমান আলী মীর	কৃষ্ণপুর, জামগ্রাম
১৯০৭.	মোঃ আজিজার রহমান (ইয়াছিন আলী)	মৃত কিসমতুল্লাহ	পাল্লাপাড়া, কাহালু
১৯০৮.	মোঃ খয়বর রহমান	মৃত ছালেম আলী প্রাং	কাহালু বাজার, কাহালু
১৯০৯.	মৃত ওমর আলী	আলহাজ্ব সৈয়দ আলী প্রাং	মহারাবানী, কাহালু
১৯১০.	অধ্যক্ষ হোসেন আলী	মৃত গাজীউর রহমান প্রাং	কাহালু বাজার, কাহালু
১৯১১.	শ্রী বিজয় চন্দ্র সরকার	মৃত প্রভাব চন্দ্র সরকার	শিবা কলমা, মালঞ্চ
১৯১২.	মোঃ মুনছুর রহমান	মৃত তছির উদ্দিন	বানিয়াপাড়া
১৯১৩.	মোঃ ইউসুফ আলী	মৃত ছালামতুল্লাহ প্রাং	কাহালু বাজার, কাহালু
১৯১৪.	মোঃ তমিজ উদ্দিন	মৃত সরাফতুল্লাহ	হারলতা, দুর্গাপুর
১৯১৫.	মোঃ আসাদ আলী	মৃত মহির উদ্দিন	পাতাঞ্জ, দুর্গাপুর
১৯১৬.	মোঃ খয়বর আলী মিয়া	মৌঃ আহম্মদ আলী	নারহট্ট, নারহট্ট
১৯১৭.	মোঃ তমিজ উদ্দিন শেখ	মৃত ইব্রাহিম শেখ	বড়মোহর, মুরইল
১৯১৮.	মোঃ আব্দুল হামিদ প্রাং	মৃত ববিয়া প্রাং	উলট্ট, কাহালু
১৯১৯.	মোঃ লিয়াকত আলী সরদার	মৃত ইব্রাহিম আলী সরদার	কাহালু বাজার, কাহালু
১৯২০.	মৃত আবুল কাশেম সরদার	মৃত রজিবর রহমান সরদার	নারহট্ট, নারহট্ট
১৯২১.	মোঃ আফতার হোসেন প্রাং	মৃত ছায়েত আলী প্রাং	পুইয়াগাড়ী, দুর্গাপুর
১৯২২.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত আঃ গণি	কাহালু বাজার, কাহালু
১৯২৩.	মোঃ ইয়াকুব আলী	মোঃ ইসমাইল হোসেন তরফদার	ধানপুজা, দুর্গাপুর
১৯২৪.	মোঃ আনছর আলী	মোঃ কমর উদ্দিন	বড়মোহর, মুরইল
১৯২৫.	মোঃ মঞ্জুরুল হক	মোঃ কোব্বাদ হোসেন	কাহালু বাজার, কাহালু
১৯২৭.	মোঃ নজিবর রহমান	মৃত ইসহাক হোসেন	মহেশপুর, কাহালু

১৯২৮.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	মৃত বাহার আলী মিয়া	উলট্ট, কাহালু
১৯২৯.	মোঃ বজলুর রহমান	মৃত আব্বাস আলী	কালিশকুড়ি, কাহালু
১৯৩০.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত ছমির উদ্দিন	কাউরাস, বীরকেদার
১৯৩১.	শ্রী বিমল বসাক	মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র বসাক	দুর্গাপুর, দুর্গাপুর
১৯৩২.	মোঃ মোজাহার আলী	মৃত হযরতুল্লাহ মণ্ডল	বড়মোহর, মুরইল
১৯৩৩.	মোঃ আক্কাছ আলী	মৃত মঙ্গলা প্রাং	কাটনাহার, মুরইল
১৯৩৪.	মৃত ফজলুল হক	মৃত কাসেম আলী	মহেশর, কাহালু
১৯৩৫.	মোঃ সৈয়দ আলী মিয়া	মৃত আমির আলী মিয়া	মহেশপুর, কাহালু
১৯৩৬.	মোঃ ফজর্লুল হক	মোঃ ময়েন উদ্দিন	উলট্ট, কাহালূ
১৯৩৭.	মোঃ ছামছুল হুদা	মৃত মাজেদ আলী	পিলকুঞ্জ
১৯৩৮.	মোঃ আবুল হোসেন জিলাদার	মৃত পিয়ার রহমান	নিশ্চিন্তপুর
১৯৩৯.	মোঃ মোকাররম হোসেন	মৃত বাহাউদ্দিন আহম্মদ	নারহট্ট
১৯৪০.	শ্রী ভবানী কান্ত সরকার	মৃত ত্রৈলোক্য নাথ সরকার	হরিপুর
১৯৪১.	প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার	মৃত রমেশ চন্দ্র সরকার	সারাই
১৯৪২.	মোঃ আসমত আলী	মৃত বরকত উল্লা আলী তরফদার	ধানপুজা
১৯৪৩.	মোঃ মফিজ উদ্দিন মণ্ডল	মৃত হাসমত আলী মণ্ডল	ঢেঁকড়া
১৯৪৪.	মোঃ তৈয়ব আলী ফকির	মৃত মিয়াজান আলী ফকির	চাকদহ
১৯৪৫.	শ্রী অমূল্য চন্দ্র শীল	মৃত শ্রী চিত্তনাথ শীল	দুর্গাপুর
১৯৪৬.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত অছিম উদ্দিন	পুগইল

উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

১৯৪৭.	মোঃ মুনসুর রহমান	মৃত আবেদ আলী	ইসলামপুর
১৯৪৮.	মোঃ কোরবান আলী সেখ	মৃত বাদশা সেখ	লালুফা
১৯৪৯.	মোঃ আঃ মানিক খান	মৃত এরফান আলী খান	ভালোড়া
১৯৫০.	শ্রী তারাপদ সরকার	মৃত চন্দ্র কান্ত সরকার	স্বরঞ্জাবাড়ী
১৯৫১.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত সমতুল্যা প্রাং	ভালোড়া
১৯৫২.	মৃত ছৈয়দ বদরুল আলম	মৃত শামছুর রহমান	ভালোড়া
১৯৫৩.	মোঃ আঃ করিম সরকার	মৃত তয়েজ উদ্দিন সরকার	মোড়গ্রাম
১৯৫৪.	মোঃ রোস্তম আলী প্রাং	মৃত ইয়ার আলী প্রাং	মোড়গ্রাম
১৯৫৫.	মোঃ মোকসেদ আলী প্রাং	মৃত আসাব আলী প্রাং	মোড়গ্রাম

১৯৫৬.	মোঃ শামছুল হক মণ্ডল	মৃত মোঃ আফাজ উদ্দিন মণ্ডল	মোড়গ্রাম
১৯৫৭.	মোঃ রহিমুদ্দিন	মৃত আলি মুদ্দিন	চান্দাইল
১৯৫৮.	মোঃ আজাহার আলী ফকির	মোঃ সিরাজ আলী ফকির	চান্দাইল
১৯৫৯.	মোঃ ইজার উদ্দিন প্রাং	মৃত জসিম উদ্দিন প্রাং	চান্দাইল
১৯৬০.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত খয়বর আলী ফকির	চান্দাইল
১৯৬১.	মোঃ আইয়ুব আলী সরদার		সর্জ্জনকুড়ী
১৯৬২.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত আবু তালেব প্রাং	ভুইপুর
১৯৬৩.	মোঃ জয়েন উদ্দীন	কায়েব উদ্দীন মোল্যা	সেরপুর
১৯৬৪.	এফ. এম আফতাব উদ্দীন	মৃত আব্বাছ আলী ফকির	সেরপুর
১৯৬৫.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত রমজান আলী	শ্রীপুর
১৯৬৬.	মোঃ আঃ বাছেদ সরকার	মৃত জালাল উদ্দীন সরকার	শ্রীপুর
১৯৬৭.	মোঃ আরেশ আলী	মৃত রমজান আলী	ভুইপুর
১৯৬৮.	মোঃ আছাব আলী	মৃত হাবিল সরদার	মাজিন্দা
১৯৬৯.	মোঃ নিজাম উদ্দীন	মৃত কিসমত আলী আকন্দ	মাজিন্দা
১৯৭০.	মোঃ আঃ মালেক সরকার	মৃত আবুর হোসেন সরকার	শ্রীপুর
১৯৭১.	মোঃ লোকমান আলী	মোঃ ময়েজ উদ্দীন	আমষট্টু
১৯৭২.	মোঃ আতাবুর রহমান	মৃত মনির উদ্দীন	জারই
১৯৭৩.	মোঃ বাশেদ আলী	মৃত শুকচান প্রাং	সিংড়াভাটাহার
১৯৭৪.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত আককাছ আলী	উনাহত সিংড়া
১৯৭৫.	মোঃ আক্কাছ আলী	মৃত আছিম উদ্দীন মণ্ডল	সিংগা
১৯৭৬.	মোঃ মোজাম্মেল হক ফকির	মৃত ময়েন উদ্দীন ফকির	পুকুর গাছা
১৯৭৭.	মোঃ আবুল কালাম প্রাং	হাজী মফিজ উদ্দীন	দশড়া
১৯৭৮.	মোঃ আতউর রহমান প্রাং	মৃত মজিবর রহমান	বড়নিলাহালী
১৯৭৯.	মোঃ আনছার আলী মণ্ডল	মৃত মহসীন আলী	জারই
১৯৮০.	মোঃ আফছার আলী	মৃত কাজেম উদ্দীন	ভালুচহাট
১৯৮১.	মৃত আঃ রাজ্জাক প্রাং	মৃত রোস্তম আলী	বড়নিলাহালী
১৯৮২.	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত বছির উদ্দীন প্রাং	সিংগা
১৯৮৩.	মোঃ আছির উদ্দীন ফকির	মৃত জোব্বার ফকির	ভালুকা
১৯৮৪.	মোঃ কেরামত আলী	মৃত মগল প্রাং	সিংড়াভাটাহারা
১৯৮৫.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত তালেব উদ্দিন তাং	সিংড়া
১৯৮৬.	মোঃ বদিউজ্জামান মণ্ডল	মৃত সাহেব আলী মণ্ডল	ভালুকা
১৯৮৭.	শ্রী লক্ষণ চন্দ্র বর্মণ	মৃত রসিক চন্দ্র	সূর্য্যতা
১৯৮৮.	মোঃ আজিমদ্দীন ফকির	মৃত মিয়াজ আলী	বেলহাট্টি
১৯৮৯.	মোঃ আজিজার রহমান	মোঃ কায়েম উদ্দীন	মেরাই
১৯৯০.	মোঃ কছিম উদ্দীন	মৃত মজিবর আলী সাহা	সোহাগীপাড়া
১৯৯১.	মোঃ কছিম উদ্দীন সোনার	মৃত আজগার আলী সোনার	সোনারপাড়া
১৯৯২.	মোঃ আজিজার রহমান ফকির	মৃত আক্কেল আলী	ভেবড়া

১৯৯৩.	মোঃ মজিবর রহমান প্রাং	মোঃ মেছের আলী	ছোটনিলাহালী
১৯৯৪.	মোঃ আজাদ হোসেন	মৃত আবুল হোসেন সাকিদার	বড়িয়া
১৯৯৫.	মোঃ আঃ মোত্তালেব	মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	বড়িয়া
১৯৯৬.	মোঃ তমিজ উদ্দীন আহম্মেদ	মোঃ ইছমত আলী সেখ	সোহাগপাড়া
১৯৯৭.	মোঃ তছের উদ্দীন মণ্ডল	মৃত ইসমাইল হোসেন	ভেবড়া
১৯৯৮.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মহর আলী ফকির	ছোটনিলাহালী
১৯৯৯.	মোঃ ছামছুদ্দিন প্রাং	মেছের আলী প্রাং	ছোটনিলাহালী
২০০০.	মোঃ আফজাল হোসেন প্রাং	মোঃ জোব্বার প্রাং	ছোটনিলাহালী
২০০১.	মোঃ আফজাল হোসেন প্রাং	মোঃ জোব্বার প্রাং	পোড়াপাড়া
২০০২.	মোঃ সেকিন্দার আলী	মৃত মোহসিন আলী প্রাং	ছোটনিলাহালী
২০০৩.	মোঃ ছামছুদ্দিন প্রাং	মোঃ ওছমান আলী প্রাং	জিয়ানগর
২০০৪.	মোঃ নিজাম উদ্দীন আহম্মেদ	মৃত ইশারত আলী সেখ	সোহাগীপাড়া
২০০৫.	মোঃ আঃ ছাত্তার প্রাং	মৃত মোঃ কছিম উদ্দিন	খলিশ্বর
২০০৬.	মোঃ আয়েজ উদ্দীন প্রাং	মৃত কিনা প্রাং	খলিশুর
২০০৭.	মোঃ ইনছান আলী খান	মৃত আশরাফ আলী খান	চকশোগরপুর
২০০৮.	মোঃ ওসমান আলী	মোঃ খোয়াজ আলী কবিরাজ	দেবখন্ড
২০০৯.	মোঃ অছিয়র রহমান	মৃত দিদার বক্স মুন্সী	তালোড়া
২০১০.	মোঃ আবুল কাসেম	মৃত রমজান আলী	বেলঘরিয়া
২০১১.	মোঃ কে, এম, শহিদুল হক মৃধা	এ, কে, এম, শামছুল হক	তালোড়াবাজার
২০১২.	এ, বি, এম, শাহজাহান আলী	আলহাজ্ব নূরুল হুদা	বেলঘরিয়া
২০১৩.	মোঃ আঃ খালেক প্রাং	মৃত হাছেন আলী প্রাং	তালোড়া
২০১৪.	মোঃ আবু তাহের আকন্দ	মৃত নজীর উদ্দিন	রসুলপুর
২০১৫.	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	মৃত আয়েজ উদ্দিন	দক্ষিণ শাবলা
২০১৬.	মোঃ আঃ মালেক সরদার	মৃত অছির উদ্দিন	দুবরা
২০১৭.	কে, এইচ, কিউ জামান চৌঃ	মৃত ছামশুল আরেফিন	ভালোড়া চৌঃ পার
২০১৮.	মোঃ সুজ্জাত আলী	মৃত সোলায়মান আলী	মোস্তফাপুর
২০১৯.	মোঃ হাছেন আলী	মৃত মফিজ উদ্দিন	মোস্তফাপুর
২০২০.	মৃত আবুল মোমেন	মৃত আছির উদ্দিন মণ্ডল	মোস্তফাপুর
২০২১.	মৃত হারুন-অর-রশিদ	মৃত মোজাম্মেল হোসেন	বেরুঞ্জ
২০২২.	মোঃ আঃ সামাদ	মোঃ ইমান্ আলী প্রাং	দাশড়া
২০২৩.	মোঃ আমির আলী প্রাং	মৃত ছদের আলী প্রাং	ভাতহান্দা
২০২৪.	মোঃ আঃ মজিদ	মোঃ মহসিন আলী	সিংগা গুনাহার
২০২৫.	মৃত গফুর আহম্মেদ	মৃত কলিম উদ্দীন মণ্ডল	সিংগা
২০২৬.	মোঃ জছির উদ্দীন	মৃত আয়েজ উদ্দীন প্রাং	সিংগা
২০২৭.	মোঃ আঃ হক মণ্ডল	মৃত হাফিজার রহমান	সিংগা
২০২৮.	মোঃ আলি আকবর প্রাং	মৃত আহম্মদ আলী	অর্জনগাড়ী
২০২৯.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত হাজী আহম্মদ আলী	অর্জনগাড়ী

২০৩০.	শ্রী জগবন্ধু বর্মণ	মৃত জোগেন্দ্র বর্মণ	পোত্তা
২০৩১.	মোঃ আজিজার রহমান	মোঃ কায়মুদ্দিন	মেড়াই
২০৩২.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত মহসিন আলী	সিংগা
২০৩৩.	মোঃ আবু মুসা	মৃত জহির উদ্দীন	চান্দাইল
২০৩৪.	মোঃ মাহবুবার রহমান	মৃত মতিয়ার রহমান	দুপচাঁচিয়া
২০৩৫.	শ্রী অধির চন্দ্র চক্রবর্তী	শ্রী রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী	দুপচাঁচিয়া
২০৩৬.	মোঃ আবুল খায়ের	মৃত ইসমাইল হোসেন	দুপচাঁচিয়া
২০৩৭.	মজিবর রহমান	মৃত করমত আলী	গোবিন্দপুর
২০৩৮.	মৃত আঃ গনি মণ্ডল	মৃত আকবর আলী মণ্ডল	মোড়গ্রাম
২০৩৯.	মৃত বসারত আলী	মৃত মিরাজ প্রাং	মাজিন্দা
২০৪০.	মোঃ আঃ হামিদ খন্দকার	মৃত ছবেদ আলী খন্দকার	আমষ্টু
২০৪১.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত জমির উদ্দীন	ভুইপুর
২০৪২.	মৃত জলিলুর রহমান (জিন্না)	মৃত কমর উদ্দীন	মোড়গ্রাম
২০৪৩.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত ফজলুল করিম তাং	গোবিন্দপুর
২০৪৪.	শহীদ নিজাম উদ্দীন	মৃত হানিফ উদ্দীন	গোবিন্দপুর
২০৪৫.	শহীদ সাহাদত হোসেন	মৃত লায়ের আলী	গালিমহেশপুর
২০৪৬.	শহীদ মকবুর হোসেন	মৃত গমির উদ্দীন	গালিমহেশপুর
২০৪৭.	মোঃ খাজামুদ্দিন	মৃত গাজ মিণ্ডল	বড়িয়া
২০৪৮.	মোঃ তোফজ্জল হোসেন	মৃত ছবেদ আলী মণ্ডল	খলিশ্বর
২০৪৯.	শ্রী যতীন্দ্র নাথ	মৃত ফুলমালাী সরকার	জিয়ানগর
২০৫০.	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত বছির হোসেন	পোড়াপাড়া
২০৫১.	মোঃ নওজেশ আলী	মোঃ রহিম উদ্দিন প্রাং	জিয়ানগর
২০৫২.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দীন তাং	ছোট নিলাহালী
২০৫৩.	মৃত ছোলায়মান আলী প্রাং	মৃত মিরাজ প্রাং	ছোট নিলাহালী
২০৫৪.	মোঃ সেকিন্দার সাকিদার	মোঃ কবির উদ্দীন	খলিশ্বর
২০৫৫.	মোঃ মোজাহার হোসেন খান	মৃত মফিজ উদ্দীন খান	জিয়ানগর চকপাড়া
২০৫৬.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত এনায়েত আলী	পোড়াপাড়া
২০৫৭.	মোঃ আনছার আলী প্রাং	মোঃ এবারত আলী	ছোট নিলাহালী
২০৫৮.	মোঃ হালিমুর রশিদ	মৃত সৈয়দ তৈয়বর রহমান	খলিশ্বর
২০৫৯.	মোঃ সোলায়মান আলী	মৃত হুরমতুল্যাহ মণ্ডল	বারাহী
২০৬০.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মাহমুদ আলী	মাজিন্দা
২০৬১.	মোঃ আমীর আলী ফকির	মৃত সাহেব আলী	মোড়গ্রাম
২০৬২.	এবিএম তাহেরুজ্জামান	মৃত আজিমউদ্দিন প্রাং	বড়নিলাহালী
২০৬৩.	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	মৃত ওয়াহেদ আলী তালুকদার	চামরুল
২০৬৪.	মোঃ আক্কাছ আলী সরদার	মৃত আছর উদ্দীন সরদার	দুবরা
২০৬৫.	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত ইউনুছ আলী আকন্দ	দুপচাঁচিয়া
২০৬৬.	মোঃ তমজেদ আলী	মৃত দসরতুল্লা প্রাং	ডাকাহার

২০৬৭.	মোঃ আফছার আলী	মৃত হয আকন্দ	মাস্টারপাড়া
২০৬৭.	মোঃ আফছার আলী	মৃত দসরতুল্লা প্রাং	ডাকাহার
২০৬৮.	মোঃ নূরুল আমীন খান	মজিবর রহমান	কুশ্বহর
২০৬৯.	মোঃ আবু হেলাল খন্দকার		কুশ্বহর
২০৭০.	আয়েজ উদ্দিন	রমজান আলী	বালুকা পাড়া
২০৭১.	মোঃ বাচ্চু আলী কবিরাজ	মৃত রইচ উদ্দিন কবিরাজ	অর্জুনগাড়ী
২০৭২.	মরহুম হাছান আলী তালুকদার	মরহুম হাজী হযরত উল্লাহ তালুকদার	বড়নিলাহালী
২০৭৩.	মোঃ আনছার আলী	মৃত রজিব উদ্দিন	মথুরাপুর
২০৭৪.	মোঃ আলতাফ আলী	মৃত বছির উদ্দিন	আমকুপী
২০৭৫.	মোঃ ইসরাফিল হোসেন	মৃত ইসমাইর হোসেন	মেঘা
২০৭৬.	মোঃ ময়েজ উদ্দিন	মৃত আজিম উদ্দিন	মহিষমন্ডা
২০৭৭.	মোঃ আয়েন উদ্দিন	মৃত ছবের উদ্দিন	কোচপুকুরিয়া
২০৭৮.	আমান উল্লাহ	মৃত সোয়ায়েব আব্দুল্লাহ	আশুঞ্জা
২০৭৯.	মোঃ হযরত আলী	মৃত লজাবত আলী	পাঁচথিতা
২০৮০.	মোঃ আব্দুর রশিদ মণ্ডল	মৃত মনির উদ্দিন	দেবখন্ড
২০৮১.	মোঃ আবুল হোসেন আকন্দ	মৃত কাশেম আলী	বাঁশপাতা
২০৮২.	এটি এম আমিনুল হক	আলহাজ্ব নূরুল হুদা	গাড়ীবেলঘরিয়া
২০৮৩.	মোঃ মকবুল হোসেন	ময়েজ উদ্দিন মৃধা	দেবখণ্ড
২০৮৪.	মোঃ হাছেন আলী	মৃত তবিবর রহমান	তালোড়া
২০৮৫.	মোহাম্মদ আলী	মৃত মবারক আলী	দেবখণ্ড
২০৮৬.	মোঃ আহসান উল্যাহ	মৃত বদের উদ্দীন আকন্দ	গাড়ীবেলঘরিয়া
২০৮৭.	মোঃ ইয়াকুব আলী	মৃত কছির উদ্দিন	রসুলপুর
২০৮৮.	মোঃ ফসিউল আমল খান	মৃত আলমঙ্গীর হোসেন খান	দুপচাঁচিয়া
২০৮৯.	কে কে এম মোজাহারুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল মালেক আকন্দ	গাড়ী বেলঘরিয়া
২০৯০.	মৃত মোসলেম উদ্দিন	মৃত গমির উদ্দিন	শেরপুর
২০৯১.	মরহুম হাতেম আলী	কান্দুর প্রাং	ভূঁইপুর
২০৯২.	মোঃ মতিয়র রহমান	মৃত মহিউদ্দিন	বড়নিলাহালী
২০৯৩.	মোঃ তয়েজ উদ্দিন	মৃত জাবেদ আলী	ডাকাহার
২০৯৪.	মোঃ আবেদ আলী	হাজী করমতুল্যা প্রাং	ডাকাহার
২০৯৫.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	কছির উদ্দিন	সোহাগী পাড়া
২০৯৬.	মোঃ নরুজল ইসলাম	মৃত আবু শরীফ প্রাং	তালোড়া
২০৯৭.	মোঃ মাজেদুর রহমান	মৃত আনছার আলী	কেউৎ

উপজেলা : আদমদিঘি, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

২০৯৮.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত ফয়েজ উদ্দিন	নশরৎপুর
২০৯৯.	মোঃ মজিদ সাকিদার	মৃত ইব্রাহীম সাকিদার	শিহারী
২১০০.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত ইয়াদুল্যা	ডুমরীগ্রাম
২১০১.	মোঃ আকবর সরদার	মৃত বুদিয়া সরদার	শাওইল
২১০২.	মোঃ আইয়ুব আলী	মৃত খয়াজ আলী	ধনতলা
২১০৩.	নুর মোহাম্মদ	মৃত বছির উদ্দিন	দত্তবাড়িয়া
২১০৪.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত ছায়েদ আলী	দত্তবাড়িয়া
২১০৫.	মোঃ আঃ সাত্তার আকন্দ	মৃত ছবেদ আলী	দত্তবাড়িয়া
২১০৬.	মোঃ আঃ রহমান	মৃত গহের আলী	কোচকুড়ি
২১০৭.	মোঃ আলাউদ্দিন আলী	মৃত সাহেব আলী	শিহারী
২১০৮.	মোঃ আকবর হোসেন	মৃত আলীমুদ্দিন	শিহারী
২১০৯.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত জহির উদ্দিন	শিহারী
২১১০.	মোঃ তছিলম	মৃত কছির উদ্দিন	পূর্বভালম্বা
২১১১.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত তছির উদ্দিন	পূর্বভালম্বা
২১১২.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত মহির উদ্দিন	শিহারী
২১১৩.	মোঃ আঃ হাই	মৃত তবির উদ্দিন	দেলুঞ্জ
২১১৪.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত মেহের উদ্দিন	শিহারী
২১১৫.	মোঃ আক্কাস আলী	মৃত আব্বাস আলী	ডুমরীগ্রাম
২১১৬.	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত আক্কাস আলী	লক্ষীপুর
২১১৭.	মোঃ মিয়াকান আলী	মৃত মনসর আলী	অন্তাহার
২১১৮.	মোঃ ছইমুদ্দিন	মৃত মনজিলা	দুর্গাপুর
২১১৯.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত সুজাখান	ছাতিয়ান গ্রাম
২১২০.	মোঃ হাসানুজ্জামান	মৃত বাবর আলী প্রাং	বড় আখিরা
২১২১.	মোঃ সায়ের আলী	মৃত তমিজ উদ্দিন	অন্তহার
২১২২.	শ্রী পরমেশ্বর মণ্ডল	মৃত পেরিবাগ মণ্ডল	বড় আখিরা
২১২৩.	মোঃ নুর মোহাম্মদ	মৃত ওমর আলী	পঃ সিংরা
২১২৪.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত জসিম উদ্দিন	পলাশি
২১২৫.	মোঃ আজিজুল হক	মৃত জসীম উদ্দিন	দুর্গাপুর
২১২৬.	মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন	মৃত নায়ের আলী	ছাতিয়ানগ্রাম
২১২৭.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত কছির উদ্দিন	পঃ সিংড়া
২১২৮.	মোঃ ওয়ারেছ আলী	মৃত ইনার উদ্দিন	শালগ্রাম
২১২৯.	মোঃ হামিদ আলী মণ্ডল	মৃত আমির আলী মণ্ডল	কোমারপুর
২১৩০.	মোঃ মাহাতাব মণ্ডল	মৃত বছির মণ্ডল	কোমারপুর
২১৩১.	মোঃ আঃ রহমান আকন্দ	মৃত আব্বাছ আলী আকন্দ	কোমারপুর
২১৩২.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত ইব্রাহিম সরকার	কোমারপুর
২১৩৩.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত ইলিম উদ্দিন	বড় আখিড়া

২১৩৪.	মোঃ ময়নুল হক তালুকদার	মৃত রমজান আলী	শালগ্রাম
২১৩৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত হাজী জহির উদ্দিন মোল্যা	বড় আখিড়া
২১৩৬.	মোঃ আহসান হাবিব	মৃত কায়েম উদ্দিন	পঃ সিংড়া
২১৩৭.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত বয়েজ উদ্দিন	শালগ্রাম
২১৩৮.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত শফীর উদ্দিন	অন্তাহার
২১৩৯.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত ইউছুফ আলী	কোমারপুর
২১৪০.	খন্দকার আঃ সাত্তার	মৃত সাহেব আলী	আমইল
২১৪১.	মোঃ কছিম উদ্দিন মণ্ডল	মৃত করিম উদ্দিন মণ্ডল	কলাবারিয়া
২১৪২.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত মনো মণ্ডল	অন্তাহার
২১৪৩.	মোঃ ইব্রাহিম মণ্ডল	মৃত কাদের আলী মণ্ডল	পঃ সিংড়া
২১৪৪.	মোঃ আনছার আলী	মৃত জান বক্তা	হারদাম
২১৪৫.	মোঃ জসীম উদ্দিন মণ্ডল	মৃত মহির উদ্দিন মণ্ডল	বাগবাড়ী
২১৪৬.	আজিজার রহমান	মৃত আনিজ উদ্দিন মণ্ডল	কলাবাড়িয়া
২১৪৭.	সোহরাব প্রাং	মৃত সৈয়দ আলী	বড় আখিড়া
২১৪৮.	মোঃ মমতাজ আলী	মৃত রমজান আলী	নিমাইদিঘি
২১৪৯.	মোঃ আঃ রাজ্জাক সরদার	মৃত আহফাদ আলী	কোমারপুর
২১৫০.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত নবান আলী	চকসোনর
২১৫১.	এম এম জিন্নাত আলী	মৃত ইউসুফ আলী সরদার	দুর্গাপুর
২১৫২.	মোঃ আজিবর রহমান	মৃত বাহার আলী	অন্তাহার
২১৫৩.	মোঃ জহির উদ্দিন	মৃত খয়বর আলী	দুর্গাপুর
২১৫৪.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত কোমর উদ্দিন	কোমারপুর
২১৫৫.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত আঃ কাদের মণ্ডল	কোমারপুর
২১৫৬.	মোঃ মজিদ মণ্ডল	মৃত আশরাফ আলী মণ্ডল	কোমারপুর
২১৫৭.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত জহির উদ্দিন	দুর্গাপুর
২১৫৮.	মোঃ মোতাহার হোসেন	মৃত আহম্মদ আলী	অন্তাহার
২১৫৯.	মোঃ আনছার আলী	মৃত ইয়াছিন আলী	কোচকুরি
২১৬০.	মোঃ আসাব আলী তাং	মৃত ছবেদ উদ্দিন	অন্তাহার
২১৬১.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত মোজাহার আলী	হলুদঘর
২১৬২.	মোঃ বছির আহম্মেদ	মৃত ওমর প্রাং	পাথরকুটা
২১৬৩.	মোঃ মোস্তফা নুরুল ইসলাম	মৃত আফছার আলী	সান্তাহার
২১৬৪.	মোঃ রশিদুল ইসলাম	মৃত মোসলেম উদ্দিন	কলসা
২১৬৫.	মোঃ এল কে আবুল হোসেন	মৃত রহিম উদ্দিন	সান্তাহার
২১৬৬.	মোঃ জহির উদ্দিন	মৃত জৈমত সরদার	মালশন
২১৬৭.	মোঃ মোবারক আলী মণ্ডল	মৃত পবন আলী মণ্ডল	মালশন
২১৬৮.	মোঃ একরাম হোসেন	মৃত খয়ের আলী	কলসা
২১৬৯.	মোঃ আঃ ওহাব	মৃত সাহাদ আলী মণ্ডল	হলুদঘর
২১৭০.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত বছির উদ্দিন	কলসা
২১৭১.	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত সাদেক আলী	কলসা

২১৭২.	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত আসতুল সরদার	হলুদঘর
২১৭৩.	মোঃ ইয়াছিন আলী মণ্ডল	মৃত আজিম উদ্দিন	তারাপুর
২১৭৪.	মোঃ আনাছার আলী	মৃত আমীন উদ্দিন	তাঁরাপুর
২১৭৫.	মোঃ সোহরাব	মৃত সাহার আলী	হলুদঘর
২১৭৬.	মোঃ সাইদুর রহমান	মৃত আহম্মদ আলী	ঘোড়াঘাট
২১৭৭.	মোঃ একরামুল হক	মৃত আঃ গফুর সরদার	ছাতনী
২১৭৮.	মোঃ আঃ কুদ্দুস	মৃত হাজী মফিজ উদ্দিন	প্রাণনাথপুর
২১৭৯.	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত বজলার রহমান	ছাতনী
২১৮০.	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত ইমান আলী	কায়েতপাড়া
২১৮১.	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত আশরত আলী	কায়েতপাড়া
২১৮২.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত সঙ্গু সরদার	সান্দিড়া
২১৮৩.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত নঈম উদ্দিন	সান্দিড়া
২১৮৪.	মোঃ নাসির উদ্দিন	মৃত ইসমাইল হোসেন	ছাতনী
২১৮৫.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত বাসেদ আলী	ছাতনী
২১৮৬.	মোঃ আশকর আলী	মৃত কাঁচু প্রাং	কাশিমিলা
২১৮৭.	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত ইমান আলী	কাশিমিলা
২১৮৮.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মহির উদ্দিন মোল্লা	কাশিমিলা
২১৮৯.	মোঃ আলী হোসেন	মৃত হাজেম মোল্যা	কাশিমিলা
২১৯০.	মোঃ সহিদুল ইসলাম	মৃত এমদাদুল হক সরদার	ছাতনী
২১৯১.	মোঃ জাফর উদ্দিন	মৃত তলব প্রাং	দমদমা
২১৯২.	মোঃ আঃ আজাদ	মৃত বাদেশ আলী	দমদমা
২১৯৩.	মোহাম্মদ আলী	মৃত ইদন আলী	সান্দিড়া
২১৯৪.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত হাজী সমশের আলী	সান্দিড়া
২১৯৫.	মোঃ নবীন উদ্দিন	মৃত বাদেশ আলী	মণ্ডলপুর
২১৯৬.	মোঃ তোমজেদ হোসেন	মৃত তাহের আলী	মুরাদপুর
২১৯৭.	মোঃ তছলিম উদ্দিন	মৃত রবেশ আলী	দঃ গনিপুর
২১৯৮.	মোঃ মেহের আলী	মৃত মনির উদ্দিন	রামপুরা
২১৯৯.	মোঃ মকলেছ	মৃত মছ	তেতুলিয়া
২২০০.	মোঃ হাতেম আলী	মৃত ময়েজ উদ্দিন	তেতুলিয়া
২২০১.	মোঃ আঃ সামাদ প্রাং	মৃত ফুলচাঁদ প্রাং	কুসুম্বী
২২০২.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত ইমান আলী	মণ্ডলপুর
২২০৩.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত তয়েজ উদ্দন	তহরপুর
২২০৪.	মোঃ হাবিল উদ্দিন	মৃত ইলিম উদ্দিন	তহরপুর
২২০৫.	মোঃ আঃ আলীম সরদার	মৃত কফিল উদ্দিন	তহরপুর
২২০৬.	মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন	মৃত মোহাম্মদ আলী	মুরাদপুর
২২০৭.	মোঃ হাবিল উদ্দিন	মৃত মছি উদ্দিন	রামপুরা
২২০৮.	মোঃ আনিসুর রহমান	মৃত ছবের আলী সরদার	কুসুম্বী
২২০৯.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত জহির উদ্দিন	রামপুরা

২২১০.	মোঃ আবেদ আলী	মৃত কাশেম আলী	মুরাদপুর
২২১১.	মোঃ আফসার আলী	মৃত ফজের আলী	তালশন
২২১২.	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত আমির আলী	মন্ডবপুর
২২১৩.	মোঃ আঃ সামাদ	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	রামপুরা
২২১৪.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত নীলচাঁদ	রামপুরা
২২১৫.	মোঃ কাবিল উদ্দিন	মৃত নবিন উদ্দিন	রামপুরা
২২১৬.	মোঃ আকবর আলী	মৃত বছির উদ্দিন	রামপুরা
২২১৭.	মোঃ আঃ সামাদ	মৃত ইলামদি	দঃ গনিপুর
২২১৮.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত জসিম উদ্দিন	শিবপুর
২২১৯.	মোঃ আঃ সালাম	মৃত ইয়াছিন আলী	পাইকপাড়া
২২২০.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত জহির উদ্দিন	কাশিমালা
২২২১.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত বছির উদ্দিন	উজ্জ্বলতা
২২২২.	মোঃ দিলবর আলী	মৃম সাদেক আলী	কেশরতা
২২২৩.	শ্রী সতেন্দ্র নাথ	মৃত মাখন চন্দ্র	আদমদিঘি
২২২৪.	মোঃ আঃ মজিদ	মৃত বাদেশ আলী	জোরপুকুরিয়া
২২২৫.	মোঃ আফতাফ হোসেন	মৃত কাজেম শাহা	তালশন
২২২৬.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত আজু প্রাং	পাইকপাড়া
২২২৭.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত শুকচাঁন সরদার	কুসুম্বি
২২২৮.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আশারত উল্যা	পাইকপারা
২২২৯.	মোঃ সুলতান মাহমুদ	মৃত কাবেজ উদ্দিন	করজরারী
২২৩০.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত হজরত আলী	তেতুলিয়া
২২৩১.	মোঃ আবু তাহের	মৃত আবুল হোসেন	ধনতলা
২২৩২.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত কাদের আলী	খলপাড়া
২২৩৩.	মোঃ রায়হান আলী	নাছির উদ্দিন	দেলঞ্জ
২২৩৪.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত আয়েজ উদ্দিন	লক্ষীপুর
২২৩৫.	মোঃ আঃ হাকিম	মৃত আব্বাস আলী	শিহারী
২২৩৬.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত কায়সার আলী	নশরৎপুর
২২৩৭.	মোঃ আলেফ উদ্দিন	মৃত ফয়েজ উদ্দিন শেখ	শাওইল
২২৩৮.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত পিয়র আলী	শিহারী
২২৩৯.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত আয়েজ উদ্দিন	ধনতলা
২২৪০.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত ইছাহাক আলী	শিহারী
২২৪১.	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত খয়বর আলী	শিহারী
২২৪২.	মোঃ জয়েন উদ্দিন	মৃত ইমান আলী	দওবাড়ীয়া
২২৪৩.	মোঃ মনসুর আলী	মৃত মমতাজ আলী	মংগলপুর
২২৪৪.	মোঃ ছলিম উদ্দিন	মৃত হরমতুল্লা	ধনতলঅ
২২৪৫.	মোঃ ফজলুল হক	মৃত বছির উদ্দিন	দত্তবানিয়া
২২৪৬.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত আছ আলী	ডুমরীগ্রাম
২২৪৭.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত ইসমাইল হোসেন	কোলাদিঘী

২২৪৮.	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন	মৃত কাজেম উদ্দিন	দত্তবানিয়া
২২৪৯.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত ইছাহাক আলী	শিহারী
২২৫০.	মোঃ ছামছুদ্দিন	মৃত ওয়াদালী	ডুমরীগ্রাম
২২৫১.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত ফুলচান	নশরৎপুর
২২৫২.	মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত ইসমত আলী	মুরইল
২২৫৩.	মোঃ আঃ গনি	মৃত ফয়েজ উদ্দিন	চাটখইর
২২৫৪.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত ওছমান গণি	কোচকুরি
২২৫৫.	মোঃ আফাজ উদ্দিন	মৃত বহর উদ্দিন	কোচকুরি
২২৫৬.	মোঃ আঃ সামাদ	মৃত সহের আলী	কোচকুরি
২২৫৭.	মোঃ ফজলুল হক	আলতাফ আলী	নশরতপুর
২২৫৮.	মোঃ রেজাইল করিম	মৃত তমিজ উদ্দিন	খারিয়াকান্দী
২২৫৯.	মোঃ মোহাম্মদ আলী	মৃত লকি সরদার	লক্ষ্মীপুর
২২৬০.	মোঃ খলিল প্রাং	মৃত মফিজ প্রাং	শিহারী
২২৬১.	মোঃ আঃ সামাদ	মৃত আঃ রহিম	মটপুকুরিয়া
২২৬২.	মোঃ আঃ সামাদ	মৃত ইসমাইল হোসেন	মটপুকুরিয়া
২২৬৩.	মোঃ আফছার আলী	মৃত সোনার আলী প্রাং	গাদঘাট
২২৬৪.	মোঃ মজিবর রহমান	সামির উদ্দিন প্রাং	গাদঘাট
২২৬৫.	মোঃ বাবর আলী মণ্ডল	মৃত হাজী বরকতুল্যা প্রাং	গাদঘাট
২২৬৬.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত মোতাহার আলী	পান্তারপাড়া
২২৬৭.	মোঃ আঃ রাজ্জাক খলিফা	মৃত কাশেম আলী	ছারুপাড়া
২২৬৮.	মোঃ আলেফ উদ্দিন	মৃত ওমর আলী	গাদঘাট
২২৬৯.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত কাদের প্রাং	নিমকরি
২২৭০.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত ফুলচান সরদার	বশিকরা
২২৭১.	মোঃ ইয়াছিন প্রাং	মৃত জমতুল্যা প্রাং	মটপুকুরিয়া
২২৭২.	মোঃ আলেফ	মৃত মবুল্যা	শিতাহার
২২৭৩.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত আশরাজ আলী প্রাং	গাদঘাট
২২৭৪.	মোঃ সিরাজ প্রাং	মৃত ছামির প্রাং	তিলোচ মোল্যাপাড়া
২২৭৫.	মোঃ দেশারত আলী সরদার	মৃত দারেজ সরদার	বশিকরা
২২৭৬.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত বতলেব আলী	তিলোচ
২২৭৭.	মোঃ তাহের আলী	মৃত ছামাগ	তিলোচ
২২৭৮.	মোঃ তবিরর রহমান	মৃত হাফেজ উদ্দিন সোনার	সোনারপাড়া
২২৭৯.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত আয়েজ উদ্দিন	সোনারপাড়া
২২৮০.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত কফের আলী	গাদঘাট
২২৮১.	মোঃ আঃ জলিল প্রাং	মৃত ফজের আলী প্রাং	গাদঘাট
২২৮২.	মোঃ আনছার আলী	মৃত মোঃ ইয়াছিন	কোচকুড়ি
২২৮৩.	মোঃ আসাব উদ্দিন তালুকদার	মৃত ছবেদ উদ্দিন তালুকদার	সান্তাহার
২২৮৪.	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত মোজাহার আলী	হলুদঘর
২২৮৫.	মোঃ বছির আহম্মেদ	মৃত ওমর উদ্দিন	পাথরকুটা

২২৮৬.	মোঃ মোস্তফা নূরুল ইসলাম	মৃত আফছার আলী	সান্তাহার
২২৮৭.	মোঃ রশিদুল ইসলাম	মৃত মোসলেম	কলসা
২২৮৮.	মোঃ এল কে আবুল হোসেন	মৃত রহিম উদ্দিন	সান্তাহার
২২৮৯.	মোঃ জহির উদ্দিন	জৈমত সরদার	মালশন
২২৯০.	মোঃ মোবারক আলী মণ্ডল	মৃত পবন উদ্দিন	মালশন
২২৯১.	মোঃ একরাম হোসেন	মৃত খয়ের আলী	কলসা
২২৯২.	মোঃ আঃ ওহাব	মৃত সাহাদ আলী	হলুদঘর
২২৯৩.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত বছির উদ্দিন	কলসা
২২৯৪.	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত সাদেক আলী	কলসা
২২৯৫.	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত আসতুল সরদার	হলুদঘর
২২৯৬.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত তাজিম উদ্দিন	তারাপুর
২২৯৭.	মোঃ আনছার আলী	মৃত আমিন উদ্দিন	তারাপুর
২২৯৮.	মোঃ সোহরার	মৃত সাহেব আলী	ঘোড়াঘাট
২২৯৯.	মোঃ সাইদুর রহমান	মৃত আহম্মদ আলী	ঘোড়াঘাট
২৩০০.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত ইয়াদ আলী	বরিয়াবার্তা
২৩০১.	মোঃ অবির উদ্দিন	মৃত নিলচচাঁন	বেজার
২৩০২.	শ্রী খগেন চন্দ্র বর্মণ	মৃত দেবন্দ্রনাথ বর্মণ	বরিয়াবার্তা
২৩০৩.	মোঃ গাজী নরুল ইসলাম	মৃত কবির উদ্দিন	বরিয়াবার্তা
২৩০৪.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত সমর উদ্দিন মণ্ডল	কোমারপুর
২৩০৫.	মোঃ আফছার আলী	মৃত কোকা সাহ	ছোট আখিড়া
২৩০৬.	মোঃ আব্দুর রহমান প্রামাণিক (ফেরদৌস)	কেরামতুল্লাহ	শালগ্রাম
২৩০৭.	মৃত মোহাম্মদ আলী	মৃত হাফিজ উদ্দিন	শালগ্রাম
২৩০৮.	মৃত আব্দুল মজিদ মণ্ডল	মৃত ছবেদ আলী মণ্ডল	অন্তাহার
২৩০৯.	মোঃ আলীম উদ্দীন	আমির উদ্দিন মণ্ডল	ছোট আখিড়া
২৩১০.	মোজাফ্ফর হোসেন	মৃত ছামসুদ্দীন	অন্তাহার
২৩১১.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত পুলবর আলী মণ্ডল	বাগবাড়ী
২৩১২.	মোঃ সমসের আলী শেখ	মৃত সহীর উদ্দিন শেখ	নিমাই দীঘি
২৩১৩.	মোঃ নাছির উদ্দিন মণ্ডল	মৃত ছবের আলী মণ্ডল	বাগবাড়ী
২৩১৪.	মৃত আব্দুস সামাদ	মৃত আমির উদ্দিন	বাগবাড়ী
২৩১৫.	মৃত আব্দুল আজিজ	মৃত হাসেম আলী	দুর্গাপুর
২৩১৬.	মোঃ আব্দুস সামাদ পাহালোয়ান	মৃত ফয়েজ উদ্দীন পাহালোয়ান	পাহালোয়ানপাড়া
২৩১৭.	মোঃ ওয়াবেছ আলী মণ্ডল	মৃত সাদেক আলী মণ্ডল	কোমারপুর
২৩১৮.	মোঃ হায়দার আলী খান	মৃত আসকর আলী	বড় আখিড়া
২৩১৯.	মোঃ আবু তালেব	মৃত মালেক উদ্দীন	লক্ষ্মীকোল
২৩২০.	মোঃ খাজা রেজাউল হক	মৃত খাজা আব্দুর রউফ	কোমারপুর
২৩২১.	পরমেশ্বর মণ্ডল	মৃত প্যারীলাল মণ্ডল	বড় আখিড়া

২৩২২.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত মজিবর রহমান	শালগ্রাম
২২২৩.	মোঃ রেজওয়ানুর রহমান তাং	মৃত সমসের আলী প্রাং	শালগ্রাম
২৩২৪.	মোঃ আক্কাছ আলী সরদার	মৃত আলম সরদার	কোমারপুর
২৩২৫.	মোঃ একরাম হোসেন	মৃত নায়ের আলী	ডুমুড়ী
২৩২৬.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত ছাদের আলী	গলপাড়া
২৩২৭.	মোঃ বাহার আলী	মৃত হরমত আলী	সিহারী
২৩২৮.	মোঃ তৌফিক হোসেন	আতোয়ার রহমান	দেলুঞ্জ
২৩২৯.	মৃত খোরশেদ আলম	আজিম উদ্দিন	কেচকুড়ী
২৩৩০.	মোঃ মন্টু সাকিদার	মৃত বশির সাকিদার	সিহাড়ী
২৩৩১.	মোঃ আব্দুল জোব্বার	মৃত আছমতুল্লাহ	ধনতলা
২৩৩২.	তোফাজ্জল হোসেন	মৃত মমতাজ উদ্দীন	পুশিন্দ
২৩৩৩.	মৃত সোলেমান সাকিদার	মৃত জসমত আলী সাকিদার	মংগলপুর
২৩৩৪.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত ছায়েত আলী মণ্ডল	দত্তবাড়িয়া
২৩৩৫.	মৃত আবুল কালাম আজাদ	মৃত হাফেজ ওবায়দুল্লাহ	শিহারী
২৩৩৬.	আব্দুল হামিদ	মৃত ইসমাইল হোসেন	কোচকুড়ি
২৩৩৭.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত আজিম উদ্দীন	কোচকুড়ি
২৩৩৮.	মোঃ কোরেশ আলী	মৃত পরেশ আলী	লক্ষ্মীপুর
২৩৩৯.	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত মছির উদ্দীন	খারিয়াকান্দি
২৩৪০.	মোঃ ইয়াকুব আলী	ইসারত আলী	হলুদঘর
২৩৪১.	মোঃ ওমর আলী	মৃত মহির উদ্দিন	কোলাদীঘি
২৩৪২.	মৃত জাহাংগীর আলম	মৃত আলী আজগর	নশরৎপুর বাজার
২৩৪৩.	মোঃ জফির উদ্দিন	নাছির মণ্ডল	দেলুঞ্জ
২৩৪৪.	হৃদয় চন্দ্র বর্ম্মণ	কিরদ চন্দ্র বর্ম্মণ	ছোট চাটখইর
২৩৪৫.	মৃত নিজাম উদ্দিন	মৃত তুহিন উদ্দিন	ধনতুলা
২৩৪৬.	নজরুল ইসলাম	বছির উদ্দিন	লক্ষ্মীপুর
২৩৪৭.	মৃত শাহ ফরিদ উদ্দিন	মৃত শাহ নূরুল হুদা	নশরৎপুর
২৩৪৮.	মোঃ আব্দুল মজিদ মণ্ডল	মৃত হাজী জহির উদ্দিন মণ্ডল	মুরইল উত্তর পাড়া
২৩৪৯.	মোঃ মোসলিম উদ্দিন	মৃত মহির উদ্দিন	লক্ষ্মীপুর
২৩৫০.	মোজাম্মেল হক	মৃত আক্কেল আলী	পূর্ব ডালম্ব
২৩৫১.	মোঃ শামছুর রহমান	মৃত বছির উদ্দিন প্রাং	ধনতলা
২৩৫২.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত ইছমত আলী মণ্ডল	ধনতলা
২৩৫৩.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত হযরতুল্লাহ মণ্ডল	নশরৎপুর বাজার
২৩৫৪.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ছবের উদ্দিন	পূর্বডালম্ব
২৩৫৫.	মোঃ বয়েজ উদ্দিন	মৃত তয়েজ উদ্দিন	কেশরতা
২৩৫৬.	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত ইশরত	আদমদীঘি
২৩৫৭.	মোঃ সেকেন্দার আলী	নায়েব মোল্লা	রামপুরা

২৩৫৮.	মোঃ আনছার আলী	রমজান আলী	তালশন
২৩৫৯.	মোঃ আমজাদ হোসেন	বানু আকন্দ	কাশিমালা
২৩৬০.	মোঃ মোজাহার মোল্লা	জহির উদ্দিন	সুদিন
২৩৬১.	মোঃ জয়েন উদ্দিন প্রাং	মেহের আলী	উজ্জ্বলতা
২৩৬২.	মোঃ আলীম উদ্দিন	সুজন	উজ্জ্বলতা
২৩৬৩.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত কয়েজ উদ্দিন	তেতুলিয়া
২৩৬৪.	অরুণ চন্দ্র সরকার	তারিণী কান্ত সরকার	আদমদীঘি
২৩৬৫.	মোঃ ছাত্তার প্রাং	ছামাউল্লাহ প্রাং	দক্ষিণ গনিপুর
২৩৬৭.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত বছির উদ্দিন মণ্ডল	কাশিমালা
২৩৬৮.	মোঃ আবুল হোসেন	লীনচাঁদ প্রাং	পাইকপাড়া
২৩৬৯.	মোঃ আফাজ উদ্দিন	ফয়েজ উদ্দিন	কাশিমালা
২৩৭০.	মোঃ বাহার মোল্লা	নজির মোল্লা	সুদিন
২৩৭১.	মোঃ ইছাহাক	মৃত বাবর আলী	কেশরতা
২৩৭২.	মোজাম্মেল হক	মৃত হারেজ আলী প্রাং	গোড়গ্রাম
২৩৭৩.	মৃত মোসলেম উদ্দিন	হাবেছ উদ্দিন প্রাং	কুসুম্বী
২৩৭৪.	মোঃ নজিম উদ্দিন ফকির	মৃত বাবর আলী ফকির	কেশরতা
২৩৭৫.	মোঃ আব্দুল প্রাং	ছহির উদ্দিন প্রাং	রামপুরা
২৩৭৬.	মৃত আহমেদ আলী	মৃত রবিয়া সরদার	কাশিমালা
২৩৭৭.	মোঃ জামাল উদ্দিন প্রাং	ইসরত প্রাং	জোড়পুকুরিয়া
২৩৭৮.	মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন প্রাং	খয়ের আলী প্রাং	কাশিমালা

উপজেলা বগুড়া সদর, জেলা বগুড়া, বিভাগ রাজশাহী

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ইউনিয়ন
২৪০৮	মৃত জলিলুর রহমান	মৃত আব্দুল শেখ	সুলতানগঞ্জ পাড়া	বগুড়া
২৪০৯	এ,কে,এম আসাদুজ্জামান	মৃত হারেছ উদ্দিন	রহমান নগর	বগুড়া
২৪১০	মোঃ সৈয়দ আলী	মৃত মোকছেদ আলী	সুলতানগঞ্জ পাড়া	বগুড়া
২৪১১	মোঃ ইমারত হোসেন	মৃত তবিবুর রহমান	রহমান নগর	বগুড়া
২৪১২	শ্রী বিমল চন্দ্র দাস (নব মুসলিম মোঃ রফিকুল ইসলাম)	মৃত মাখন চন্দ্র দাস	মালগ্রাম	বগুড়া
২৪১৩	এ,এইচ,এম, আকতারুজ্জামান	মৃত হারেছ উদ্দিন	রহমান নগর	বগুড়া
২৪১৪	মোঃ মিসবাহুর রহমান মিলন	মৃত তবিবর রহমান	কাটারপাড়া	বগুড়া
২৪১৫	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	মৃত আলহাজ্ব নাছির উদ্দিন প্রাং	মালতীনগর	বগুড়া
২৪১৬	মৃত ওয়াজেদ আলী খন্দকার	মৃত খোরশেদ আলী খন্দকার	হিন্দুপাড়া	ঠনঠনিয়া বগুড়া
২৪১৭	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত শেখ সাদেক আলী	বাদুরতলা	বগুড়া

২৪১৮	এ,কে,এ, আমিনুল ইসলাম মিঠু	মৃত এ,জে,এম সামছউদ্দিন	থানারোড	বগুড়া
২৪১৯	মোঃ আবু তাহের খান	মৃত তোজাম্মেল হোসেন খান	ধাওয়াকোলা	গোকুল
২৪২০	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত বুদা শেখ	ঠনঠনিয়া	বগুড়া
২৪২১	মোঃ আব্দুল আজিজ খান	মৃত ইমানী শেখ	সুলতানগঞ্জ পাড়া	বগুড়া
২৪২২	মোঃ আঃ মজিদ সরকার	মৃত গোলাম রহমান সরকার	ফুলবাড়ী	নিশিন্দরা
২৪২৩	শহীদ হেলালুর রহমান চিশতী (হেলাল)	মৃত মনসুর রহমান চিশতী	রহমান নগর	বগুড়া
২৪২৪	আঃ মমিন হিটলু	মৃত মোজাম্মেল হক	জলেশ্বরীতলা	বগুড়া
২৪২৫	মোস্তাফিজুর রহমান চুন্নু	মৃত ফজলার রহমান	মালতী নগর	বগুড়া
২৪২৬	মোঃ রেজাউল করিম (মন্টু)	মৃত ইমারত আলী	জলেশ্বরীতলা	বগুড়া
২৪২৭	এস,এম, শফিউজ্জামান	মৃত ওয়াহেদ আলী	কাটনার পাড়া	বগুড়া
২৪২৮	মোঃ আমিনুল হক খান	মৃত শাহাদাৎ হোসেন খান	মালতী নগর	বগুড়া
২৪২৯	খাজা ইফতেখার আহমেদ	মৃত খাজা সামছ উদ্দিন আহমেদ	নামাজগড়	বগুড়া
২৪৩০	খাজা সামিউল হক	মৃত খাজা সামছ উদ্দিন আহমেদ	কাটনারপাড়া	বগুড়া
২৪৩১	সুনিল কুমার শাহা	মৃত চন্দ্রনাথ শাহা	কাটনারপাড়া	বগুড়া
২৪৩২	মোঃ আব্দুল্লাহেল শাফি সরকার	মৃত মনসুর রহমান	নাটাইপাড়া	বগুড়া
২৪৩৩	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত শেফায়েতুল্লা	সুলতানগঞ্জ পাড়া	বগুড়া
২৪৩৪	এ,কে,এম রাজিউল্যাহ	মৃত আঃ জোব্বার তালুকদার	কাটনার পাড়া	বগুড়া
২৪৩৫	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	মোঃ মাহির উদ্দিন প্রাং	ফুলবাড়ী উঃ পাড়া	নিশিন্দারা
২৪৩৬	মোঃ শামীম প্রাং	মৃত কিয়ামুদ্দিন প্রাং	মধ্যপালশা	ফাঁপোড়
২৪৩৭	মোঃ মঞ্জুরুল হক	মৃত আলী আযম মিয়া	জলেশ্বরীতলা	বগুড়া
২৪৩৮	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত নজির হোসেন প্রাং	কাজী নুরইল	লাহিড়ীপাড়া
২৪৩৯	আহসানুল হক মিনু	মৃত সামছুর হক	মালতী নগর	বগুড়া
২৪৪০	মৃত আফছার আলী	মৃত জান মোহাম্মদ প্রাং	কুটুরবাড়ী	রাজাপুর
২৪৪১	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত আব্দুল মালেক সরকার	চেলোপাড়া	বগুড়া
২৪৪২	মোঃ ফারুক রহমান খান	মৃত আব্দুল হামিদ খান	ঠনঠনিয়া	বগুড়া
২৪৪৩	শহীদ আঃ ছামাদ প্রাং	মৃত সমতুল্যা প্রাং	পাল্লাপাড়া	নামুজা

উপজেলা আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া বিভাগ : রাজশাহী

ক্র নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ইউনিয়ন
২৪৪৪	মোঃ আবু সাইদ	মৃত খলিলুর রহমান	বড় আখিড়া	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৪৫	মোঃ আব্দুল মুনছুর	মৃত সুবাই মণ্ডল	দুর্গাপুর	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৪৬	মোঃ সিরাজ প্রামানিক	মৃত ফয়েজ প্রাং	ছোট আখিড়া	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৪৭	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত আজিম উদ্দিন	বড় আখিড়া	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৪৮	মোঃ মোবারক আলী	পানা উল্লাহ	লক্ষ্মীকোল	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৪৯	মৃত মোহাম্মদ আলী	মৃত হাফিজ উদ্দিন	শালগ্রাম	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৫০	হারেছ চৌধুরী	মৃত ওয়াহেদ আলী	ছাতিয়ান গ্রাম	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৫১	মোঃ ফারাজ উদ্দিন	মৃত মকিম উদ্দিন	নিমাদীঘি	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৫২	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত কলিম উদ্দিন	লক্ষ্মীকোল	ছাতিয়ান গ্রাম
২৪৫৩	মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত মশরত আলী	পুশিন্দা	নশরৎপুর
২৪৫৪	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন	মৃত মিরাজন আলী	খারিয়াকান্দি	নশরৎপুর
২৪৫৫	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত পিয়ার আলী	বিষ্ণুপুর	নশরৎপুর
২৪৫৬	মোঃ ইয়াকুব আলী	মত্ৃ সৈয়দ আলী	ধনতলা পশ্চিমপাড়া	নশরৎপুর
২৪৫৭	মোঃ আমিনুর রহমান	মৃত আজিজুর রহমান	পাইকপাড়া	আদমদীঘি
২৪৫৮	মোঃ আনসার আলী শেখ	ইসুব আলী শেখ	কেশরতা	আদমদীঘি
২৪৫৯	মৃত শামছু রহমান প্রাং	মৃত বাশতুলা প্রাং	কাশিমালা	আদমদীঘি
২৪৬০	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	শামছুজ্জামান	জিনইর	আদমদীঘি
২৪৬১	মোঃ জহের আলী প্রাং	মৃত নায়েব আলী প্রাং	কাশিমালা	আদমদীঘি
২৪৬২	মোঃ আশরাফ আলী মোল্লা	মৃত রহিম উদ্দিন মোল্লা	কাশিমালা	আদমদীঘি
২৪৬৩	মোঃ জালাল মল্লিক	মৃত করিম মল্লিক	কাবিলা বাদ	কুন্দগ্রাম
২৪৬৪	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত অকির উদ্দিন	মটপুকুরিয়া	কুন্দগ্রাম
২৪৬৫	মৃত ইব্রাহিম আকন্দ	মৃত জহির উদ্দিন আকন্দ	মটপুকুরিয়া	কুন্দগ্রাম
২৫৫৬	মোঃ ইয়াকুব আলী	মৃত রহিম উদ্দিন	মুলবাড়ী	দিগদাইড়
২৫৫৭	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	মৃত ভোলামোল্লা	লোহাগাড়া	দিগদাইড়
২৫৫৮	কে,এম, আকতারুল ইসলাম (লিটু)	মৃত আজান আলী	শিহিপুর	দিগদাইড়
২৫৫৯	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত মকবুল হোসেন মণ্ডল	পূর্ব তেকানী	দিগদাইড়
২৫৬০	মোঃ আবিছ উদ্দিন	মোঃ তফির উদ্দিন	উত্তর দিঘলকান্দি	দিগদাউড়
২৫৬১	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত আয়েজ উদ্দিন সরকার	বালুয়া পাড়া	বালুয়া
২৫৬২	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত জসমতুল্লা	বামুনিয়া	বালুয়া
২৫৬৩	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত মহির উদ্দিন	পাতিলাকুড়া	বালুয়া
২৫৬৪	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত মজিবুর রহমান	পাকুল্যা	পাকুল্যা

২৫৬৫	মোঃ ফজলুল কামাল পাশা (ঠাণ্ডা)	মৃত নাজির হোসেন	পাকুল্যা	পাকুল্যা
২৫৬৬	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত সোলাইমান	হুয়াকুয়া	পাকুল্যা
২৫৬৭	মোঃ মাহবুবুল আলম	মৃত মোবারক আলী সরকার	পূর্ব সজাইতপুর	পাকুল্যা
২৫৬৮	মোঃ বেলায়েত হোসেন	মোঃ মহির উদ্দিন মণ্ডল	পূর্ব সজাইতপুর	পাকুল্যা
২৫৬৯	মোঃ ছাব্বিরুল ইসলাম	মীর সৈয়দ জামান	পূর্ব সজাইতপুর	পাকুল্যা
২৫৭০	মোঃ ছাব্বিরুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল জোব্বার	নিত্যনন্দনপুর	সোনাতলা
২৫৭১	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	মৃত ইফাজ উদ্দিন	পূর্ব সজাইতপুর	পাকুল্যা
২৫৭২	মোঃ মাহবুবুর রহমান	মৃত আজিজার রহমান	পূর্ব সজাইতপুর	পাকুল্যা
২৫৭৩	মৃত হাফিজার রহমান	মৃত আব্দুল জোব্বার	উত্তর করমজা	পাকুল্যা
২৫৭৪	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত শেখ চাঁদ মিয়া	নিত্যনন্দনপুর	পাকুল্যা
২৫৭৫	মৃত আব্দুল মতিন	মত জোব্বার সরকার	আগুনিরারতাইর	সোনাতলা
২৫৭৬	আব্দুল গনি	মৃত মীর বকস	নামাজ খালি	সোনাতলা
২৫৭৭	মোঃ সামচুল হুদা	মৃত বেলায়েত হোসেন	চামুরপাড়া	সোনাতলা
২৫৭৮	মৃত আব্দুর রশিদ মুন্সি	মৃত মোহাম্মদ আলী মুন্সি	বাটিয়াভাঙ্গা	দুর্গাহাটা
২৫৭৯	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মোঃ গোলাম প্রাং	কল্যাণপুর	নেপালতলী
২৫৮০	মোঃ দেলওয়ার হোসেন	মোঃ কামরুজ্জামান খন্দকার	উঞ্চরখী	গাবতলী
২৫৮১	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত ছমির উদ্দিন সাকিদার	রামেশ্বরপুর	নিশুপাড়া রামেশ্বরপুর
২৫৮২	মোঃ বিরাজ উদ্দিন	মৃত ইমান উদ্দিন প্রাং	ধলিরচর	নেপালতলী
২৫৮৩	মৃত আব্দুল জোব্বার	মৃত ছমির মণ্ডল	গজারিয়া	সোনারায়
২৫৮৪	মোঃ আতোয়ার হোসেন	মৃত আফজার হোসেন	লাঠিমারঘোন	নেপালতলী
২৫৮৫	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত গুলমা মুদ মণ্ডল	বাইগুনী	দুর্গাহাটা
২৫৮৬	মোঃ রুহুল আমিন	মৃত আফজাল হোসেন	ত্রিমোহনী	নেপালতলী
২৫৮৭	মৃত আব্দুল খালেক (রানা)	মৃত সোবাহান আকন্দ	জয়ভোগা	গাবতলী
২৫৮৮	মোঃ আব্দুল লতিফ মণ্ডল	মৃত দ্রাছ উদ্দিন মণ্ডল	উজগ্রাম	দক্ষিণ গ্রাম
২৫৮৯	মোঃ আব্দুল হাকিম	মৃত আজিজার রহমান প্রাং	সুখানপুকুর	নেপালতী
২৫৯০	মোঃ আব্দুল হাই	মৃত গোলা জায়দার	পনিরপাড়া	দুর্গাহাটা
২৫৯১	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আফতাব হোসেন	লাঠিমারঘোন	নেপালতলী
২৫৯২	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	মৃত ভুলু মণ্ডল	সোনামুয়া	বালিয়াদিঘী
২৫৯৩	মোঃ ছালেক মিয়া	মৃত আছর উদ্দিন প্রাং	কদমতলী	নেপালতলী
২৫৯৪	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত ফারাজ উদ্দিন পাইকার	তেজপাড়া	রামেশ্বরপুর
২৫৯৫	মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ মাজেদার রহমান তরফদার	উত্তরপাড়া	রামেশ্বরপুর
২৫৯৬	মোঃ নওয়াব আলী	মৃত গোলাম রহমান মণ্ডল	মমিনহাটা	ছুতারপাড়া নেপালতলী

২৫৯৭	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিল্লাত	মৃত ইছাহাক উদ্দিন	হাতিবান্দা	দুর্গাহাটা
২৫৯৮	মোঃ আফতাব উদ্দিন বাবলু	মৃত মোছলেম উদ্দিন	মুচিখালি	সোনারায়
২৫৯৯	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত ফারাজ উদ্দিন প্রাং	তেলিহাটা	সোনারায়
২৬০০	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত দিয়ানতুল্ল্যাহ	বামুনিয়া	সোনারায়
২৬০১	মোঃ জিয়াউদ্দিন (আব্দুল কাদের)	মৃত আকরাম হোসেন মোল্লা	ছোট ইটালী	নশিপুর
২৬০২	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মহব্বতুল্লা	ধর্মগাছা	মহিষাবাদ
২৬০৩	মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রাং	মৃত হিয়াত আলী প্রাং	সোলার তাইর	দুর্গাহাটা
২৬০৪	মৃত আঃ ছাত্তার সরকার	মৃত সৈয়দ জামান সরকার	হামিদপুর	নারুয়ামালা
২৬০৫	মৃত মনির উদ্দিন	মৃত আজিম উদ্দিন	লাঠিমার ঘোন	নেপালতলী

উপজেলা ধুনট

২৬০৬	মোঃ আব্দুল মজিদ	মজিবর রহমান	শহড়াবাড়ী	ভান্ডারবাড়ী
২৬০৭	মোঃ হাতেমুজ্জামান তালুকদার	মৃত আকিমুদ্দিন তালুকদার	চালাপাড়া	ধুনট
২৬০৮	মোঃ রুহুল আমিন	সামছ উদ্দিন	ছাতিয়ানি	ধুনট
২৬০৯	কে,এম,রায়হান আলী মুন্সী	আব্দুর রশিদ মুন্সী	গোবিন্দপুর	মথুরাপুর
২৬১০	মোঃ মোখলেছুর রহমান	মৃত আব্দুল কুদ্দুছ মণ্ডল	বিলচাপরী	এলাঙ্গী
২৬১১	মোঃ রেজাউল করিম	মফিজ উদ্দিন	মরিচতলা	ভান্ডারবাড়ী
২৬১২	মোঃ আবু আশরাফ	মবারক আলী প্রাং	ধুনট অফিসারপাড়া	ধুনট
২৬১৩	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আব্দুল কুদ্দুস	অফিসার পাড়া	ধুনট
২৬১৪	মোঃ আজাহারুল ইসলাম	মোকছেদ আলী আকন্দ	উজাল সিং	মথুরাপুর
২৬১৫	মোঃ বাবর আলী	মৃত জাহান বকস আকন্দ	চয়নাটবাড়ী	ধুনট
২৬১৬	মৃত আব্দুস ছাত্তার আকন্দ	মৃত রইট আকন্দ	বিলচাপড়ি	এলাঙ্গী
২৬১৭	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত আহম্মদ আলী	সাতটিকড়ী	গোপালনগর

উপজেলা শিবগঞ্জ

২৬১৮	মোঃ আকরাম হোসেন	মৃত ছইমুদ্দিন	মহাস্থান	রায়নগর
২৬১৯	মোঃ শহীদুল ইসলাম	ছোলাইমান আলী	চকপাড়া	মোকামতলা

২৬২০	মোঃ ছারোয়ার হোসেন	মৃত নিজামুল হক	বিষ্ণুপুর	দেউলী
২৬২১	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল	মালাহার	মোকামতলা
২৬২২	মোঃ ইন্তাজ আলী	মৃত আলতাব আলী	রহবল	দেউলী
২৬২৩	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত আজিজুল হক	শিহালী	পীরব
২৬২৪	মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত মধু প্রাং	মুগইল	পীরব
২৬২৫	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত হুরমুত উল্লাহ	রহবল	দেউলী
২৬২৬	মৃত আকবর আলী	মৃত আনার প্রাং	মহাস্থান	রায়নগর
২৬২৭	মোঃ ছাইদুর রহমান (ছায়েদ আলী)	মৃত রজব আলী	আলামপুর	সৈয়দপুর
২৬২৮	মীর মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মীর আবুল কাশেম	বানাইল	বিহার
২৬২৯	আব্দুস সাত্তার	মৃত আলিম উদ্দিন	শিহালী	পীরব
২৬৩০	আব্দুস ছালেক (দুদু)	মরহুম আজগর আলী আহম্মেদ	শিহালী	পীরব
২৬৩১	আব্দুল বারী	মৃত জসিম উদ্দিন	শিহালী	পীরব
২৬৩২	আব্দুল জলিল	মৃত আব্দুল জোব্বার	কানতারা	বুড়িগঞ্জ

উপজেলা নন্দীগ্রাম

২৬৩৩	মৃত আকবর আলী	মৃত পরেশ উল্যা প্রাং	আচুঁয়ার পাড়া	নন্দীগ্রাম
২৬৩৪	মোঃ আব্দুল হামিদ খান	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	বর্ষণ	নন্দীগ্রাম

উপজেলা সারিয়াকান্দি

২৬৩৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত আমজাদ ফকির	নাড়াপালা	কর্নিবাড়ী
২৬৩৬	মোঃ আঃ গফুর	মৃত এলাহী বকস মণ্ডল	চরপাড়া	কর্নিবাড়ী
২৬৩৭	মোঃ তৌফিকুল ইসলাম (তফির)	মৃত ঘেনা মণ্ডল	মথুরাপাড়া	কর্নিবাড়ী
২৬৩৮	মোঃ মাহফুজুর রহমান	মৃত হাফিজার রহমান	শনপচা	কর্নিবাড়ী
২৬৩৯	মোঃ মাজেদুর রহমান	মৃত মোহাম্মদ প্রাং	ফটকিয়ামারী	কর্নিবাড়ী
২৬৪০	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	কান্টাভুইয়া	তালতলা	কর্নিবাড়ী
২৬৪১	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত জনাব আলী মোল্লা	কুড়িপাড়া	কাজলা
২৬৪২	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত জাবেদ আলী	কুপতলা	নারচী
২৬৪৩	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত হাবিবুর রহমান	গনকপাড়া	নারচী
২৬৪৪	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত মজিতুল্ল্যা প্রাং	গোদাগাড়ী	নারচী

২৬৪৫	মৃত মকবুল হোসেন	মৃত ছইমউদ্দিন আকন্দ	চর হরিনা	নারচী
২৬৪৬	মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত ডাঃ বরকত আলী	গনকপাড়া	নারচী
২৬৪৭	লোকমান আহম্মদ	মৃত নুটু ফকির	গনকপাড়া	নারচী
২৬৪৮	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন	মোঃ তহছিন আলী	শেখাহাতী	নারচী
২৬৪৯	মোঃ মোজাহার আলী	মৃত আবুল হোসেন	শেখাহাতী	নারচী
২৬৫০	মৃত কাদের মল্লিক	মৃত মোজাহার আলী	নারচী	নারচী
২৬৫১	মৃত মোজাহার আলী	মোঃ কুতুব উদ্দিন	চরহরিনা	নারচী
২৬৫২	মৃত ছালেক উদ্দিন	মৃত মোফাসরদার	গনকপাড়া	নারচী
২৬৫৩	মৃত আঃ কুদ্দুস আকন্দ	মৃত কিছমত আকন্দ	চরহরিনা	নারচী
২৬৫৪	মৃত আহাদ আলী	মৃত ইছমত আলী	চরহরিনা	নারচী
২৬৫৫	মৃত বুলু মোল্লা	মৃত শুকরা মোল্লা	চরহরিনা	নারচী
২৬৫৬	মৃত টুকু মোল্লা	মৃত শুকরা মোল্লা	চরহরিনা	নারচী
২৬৫৭	মোঃ মজনুর রহমান মন্ডল	মৃত মোনছের রহমান মণ্ডল	শেখহাতী	নারচী
২৬৫৮	মোঃ আব্দুস ছামাদ সরকার	মোঃ আব্দুল লতিফ সরকার	বোহালী	বোহাইল
২৬৫৯	মৃত আকরাম হোসেন খান	মৃত সাহবাস উদ্দিন খান	কেষ্টিয়া	বোহাইল
২৬৬০	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত ডাঃ কোব্বাত হোসেন	আওলাকান্দি	বোহাইল
২৬৬১	মোঃ জেল হক প্রাং	মৃত কছিম উদ্দিন প্রাং	আওলাকান্দি	বোহাইল
২৬৬২	শমসুউদ্দিন আহামেদ	মৃত মাজেম হোসেন প্রাং	চরবোহালী	বোহাইল
২৬৬৩	মোঃ মোখলেছার রহমান	মৃত নওছের আলী সরকার	বোহালী	বোহাইল
২৬৬৪	মৃত ওবাইদুল ইসলাম	মৃত তাজুল ইসলাম সরকার	বোহালী	বোহাইল
২৬৬৫	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মোজাহার আলী	আওলাকান্দি	বোহাইল
২৬৬৬	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত মোহাম্মদ আলী প্রাং	আওলাকান্দি	বোহাইল
২৬৬৭	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত চাঁন মিয়া	নিজ কর্নিবাড়ী	কুতুবপুর
২৬৬৮	মোঃ শামছুর রহমান	মৃত ভরসা প্রাং	সোলারতাইর	কুতুবপুর
২৬৬৯	মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার	মৃত মজিবর সরকার	বড়ইকান্দি	কুতুবপুর
২৬৭০	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত ছাইতুল্ল্যাহ মণ্ডল	ধলরি কান্দি	কুতুবপুর
২৬৭১	মোঃ মেনহাজ উদ্দিন	মৃত হামেদ	দিঘাপাড়া	হাটশেরপুর
২৬৭২	তৈয়বর রহমান	মৃত ইলিক মাহমুদ	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৭৩	মৃত ফারাজুল তরফদার	মৃত গিয়াস তরফদার	নিজ বরুরবাড়ী	হাটশেরপুর
২৬৭৪	মোঃ সেকেন্দার আলী	মত ভোলা আকন্দ	নিজ বলাইল	হাটশেরপুর
২৬৭৫	ওয়াজেদ হোসেন (শহীদ)	মৃত জসিম উদ্দিন	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৭৬	এটিএম শহীদুল্ল্যাহ	মৃত ডাঃ মফিজ উদ্দিন	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৭৭	আব্বাস আলী	মৃত আবুল কাসেম	নিজবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৭৮	মৃত আনোয়ার হোসেন	মৃত আকবর আলী আকন্দ	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৭৯	কে,ইউ,এল সবুর	মৃত তছির উদ্দিন সরকার	তাজুর পাড়া	হাটশেরপুর
২৬৮০	মৃত জয়নুল আবেদীন	মৃত মালেক উদ্দিন প্রাং	নিজ বরুরবাড়ী	হাটশেরপুর
২৬৮১	মৃত বজলার রহমান	মৃত মজিবর রহমান	নিজবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৮২	আব্দুল হামিদ	আব্দুল জোব্বার সরকার	দিঘাপাড়া	হাটশেরপুর

২৬৮৩	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত কিয়াছ উদ্দিন মণ্ডল	নিজবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৮৪	মোঃ ছানাউল ইসলাম মণ্ডল	মৃত কিয়াছ উদ্দিন মণ্ডল	নিজবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৮৫	মোঃ সোনা মিয়া	মৃত মজিবুর রহমান	করমজা পাড়া	হাটশেরপুর
২৬৮৬	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত তছিম উদ্দিন বেপারী	তাজুর পাড়া	হাটশেরপুর
২৬৮৭	মৃত নজরুল ইসলাম	মৃত নিজাম উদ্দিন মণ্ডল	নিজ বরুরবাড়ী	হাটশেরপুর
২৬৮৮	মোঃ জামিরুল ইসলাম	মৃত আছালত জামান ব্যাপারী	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৮৯	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত জামাল উদ্দিন আকন্দ	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৯০	মৃত আফছার আলী মোল্ল্যা	মৃত নমির উদ্দিন মোল্লা	খেপির পাড়া	হাটশেরপুর
২৬৯১	মোঃ আঃ জলিল	মৃত আঃ জব্বার প্রাং	নিজ বলাইল	হাটশেরপুর
২৬৯২	ইলিয়াছ আহম্মেদ	মৃত তোফাজ্জল হোসেন মণ্ডল	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৯৩	মোঃ সোলায়মান আলী	মোসাব্বর হোসেন	নিজবরুরবাড়ী	হাটশেরপুর
২৬৯৪	মৃত জাহেদুল হক প্রাং	মৃত জসিম উদ্দিন প্রাং	নিজবরুরবাড়ী	হাটশেরপুর
২৬৯৫	মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ	মৃত দবির উদ্দিন প্রাং	খোর্দ্দবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৯৬	মোঃ আব্দুস ছালাম	মৃত আলতাব হোসেন	নিজবলাইল	হাটশেরপুর
২৬৯৭	মোঃ হাবিবুর রহমান	মত আহাম্মদ আলী	চরমানিকদাইড়	চালুয়াবাড়ী
২৬৯৮	মোঃ আব্দুল করিম শেখ	মৃত আহাম্মদ আলী	চরমানিকদাইড়	চালুয়াবাড়ী
২৬৯৯	মোঃ আজিজুল হক	মৃত আবু মোজাহিদুল ইসলাম	নারচী	চালুয়াবাড়ী
২৭০০	মোঃ খালেক শেখ	মৃত তোয়াজ আলী শেখ	চালুয়াবাড়ী	চালুয়াবাড়ী
২৭০১	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত দানেছ আলী শেখ	চালুয়াবাড়ী	চালুয়াবাড়ী
২৭০২	মোঃ আঃ খালেক	মোঃ গেদা আকন্দ	ফাজিলপুর	চালুয়াবাড়ী
২৭০৩	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত নছিম উদ্দিন ভূঁইয়া	শিমুল তাইড়	চালুয়াবাড়ী
২৭০৪	মৃত সাহেব আলী শেখ	মৃত ময়েন উদ্দিন শেখ	শিমুল তাইড়	চালুয়াবাড়ী
২৭০৫	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোঃ আজাহার আলী	ছাইহাটা	ভেলাবাড়ী
২৭০৬	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত আকবর হোসেন প্রাং	ছাইহাটা	ভেলাবাড়ী
২৭০৭	মোঃ শহীদুল ইসলাম	মৃত নবির উদ্দিন প্রাং	ছাইহাটা	ভেলাবাড়ী
২৭০৮	মোঃ রেজাউন্নবী	মৃত তোজাম্মেল হক	জোড়াগাছা	ভেলাবাড়ী
২৭০৯	মোঃ আসগর আলী	মৃত মকবুল হোসেন	জোড়াগাছা	ভেলাবাড়ী
২৭১০	মসিউর রহমান	মৃত বাবর আলী প্রাং	জোড়াগাছা	ভেলাবাড়ী
২৭১১	মোঃ সোলেমান আলী	মৃত তহির উদ্দিন	জোড়াগাছা	ভেলাবাড়ী
২৭১২	মোঃ শাহজাহান কবীর	মৃত নকীব উদ্দিন	জোড়াগাছা	ভেলাবাড়ী
২৭১৩	মোঃ একরাম হোসেন	মৃত মকছেদ আলী	ছাইহাটা	ভেলাবাড়ী
২৭১৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মৃত মকছেদ আলী	চড়বাটিয়া	সারিয়াকান্দি
২৭১৫	মৃত শামছুল হুদা	মৃত শমসের আলী ফকির	গোসাইবাড়ী	সারিয়াকান্দি
২৭১৬	মোঃ খোরশেদ আলম	মৃত তছিম উদ্দিন সোনার	বারুই পাড়া	সারিয়াকান্দি
২৭১৭	মোঃ আঃ জলিল	মৃত আঃ খালেক সরদার	গোসাইবাড়ী	সারিয়াকান্দি
২৭১৮	মৃত আফজাল হোসেন	মৃত হাসমতুল্ল্যাহ প্রাং	দিঘলকান্দি	সারিয়াকান্দি
২৭১৯	আঃ হামিদ সরকার বাবলু	মৃত নজির হোসেন সরদার	কালিতলা	সারিয়াকান্দি
২৭২০	মোঃ বদিউজ্জামান	মৃত আজিজার রহমান প্রাং	চরবাটিকা	সারিয়াকান্দি

২৭২১	আঃ কাদের হাওলাদার	মৃত সাধন আলী হাওলাদার	বারুইপাড়া	সারিয়াকান্দি
২৭২২	মৃত আব্দুল হান্নান	মৃত মৌলভী এলাহী বকস	দারুনা	সারিয়াকান্দি
২৭২৩	মোঃ সায়েম উদ্দিন মণ্ডল	মৃত ছহির উদ্দিন মণ্ডল	নিজতিতপড়ল	সারিয়াকান্দি
২৭২৪	মোঃ খাইরুজ্জামান	মৃত মজিবর রহমান সরকার	চরবাটিয়া	সারিয়াকান্দি
২৭২৫	মোঃ আঃ ছালাম	মৃত গোলাম উদ্দিন আকন্দ	বাগবেড়	সারিয়াকান্দি
২৭২৬	সেকেন্দার আলী	মৃত নজির হোসেন	অন্তরপাড়া	সারিয়াকান্দি
২৭২৭	মোঃ রজিব উদ্দিন	মৃত শুকুর মাহমুদ মণ্ডল	নিউ সোনাতলা	ফুলবাড়ী
২৭২৮	মৃত দৌলতজামান	মৃত আজিতুল্ল্যাহ প্রাং	বালুয়ারতাইড়	ফুলবাড়ী
২৭২৯	মোঃ মহসিন আলী	মৃত উসমান সাকিদার	হাটফুলবাড়ী	ফুলবাড়ী
২৭৩০	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আলহাজ মোঃ টুকু মোল্যা	হরিনা	ফুলবাড়ী
২৭৩১	মমতাজুর রহমান	মৃত আজিম উদ্দিন	বালুয়ারতাইড়	ফুলবাড়ী
২৭৩২	আঃ খালেক	মৃত শাহ আহমেদ আলী	নিজ চন্দনবাইশা	চন্দনবাইশা
২৭৩৩	মোঃ সুরুজ্জামান	মৃত হাছেন আলী	আদবাড়িয়া	চন্দনবাইশা
২৭৩৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত শমসের আলী খাঁ	শাকদহ	চন্দনবাইশা
২৭৩৫	মোঃ সেলিম উদ্দিন মণ্ডল	মৃত খুদুমণ্ডল	আদবাড়িয়া	চন্দনবাইশা
২৭৩৬	মৃত আব্বাস আলী প্রাং	মৃত শুকুর মোহাঃ প্রাং	ঘুঘুমারী	চন্দনবাইশা
২৭৩৭	মোঃ তাহেরুল ইসলাম খান	মৃত হাজী তছলিম উদ্দিন	রোহাদহ	কামালপুর
২৭৩৮	মোঃ শাহরিয়ার খান বুলু	মৃত মফিদর রহমান খান	রোহাদহ	কামালপুর
২৭৩৯	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত নজির উদ্দিন মণ্ডল	শাহানবান্দা	হাটশেরপুর
২৭৪০	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত জোনাব আলী	সারিয়াকান্দি	সারিয়াকান্দি
২৭৪১	মোঃ আব্দুল মজিদ	মত সরাফতউল্লা	পারতিতপরল	সারিয়াকান্দি
২৭৪২	মৃত আসাদুজ্জামান	মৃত আব্দুস সামাদ মণ্ডল	নিজ চন্দন বাইশা	চন্দন বাইশা
২৪৬৬	মোঃ আবু সিদ্দিক	মৃত আবু তালেব মণ্ডল	মটপুকুরিয়া	কুন্দগ্রাম
২৪৬৭	মোঃ আকবর সোনার	মৃত আছন সোনার	তিলোচ	কুন্দগ্রাম
২৪৬৮	মোহাম্মদ আলী	মৃত ফারেজ আলী	চেচুয়া	কুন্দগ্রাম
২৪৬৯	মোঃ নজরুল হুদা খন্দকার	মোঃ মোশারফ হোসেন	কুন্দগ্রাম	কুন্দগ্রাম
২৪৭০	মোঃ ইব্রাহিম	মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রাং	দামদড়কুড়ী	চাঁপাপুর
২৪৭১	মৃত মিজানুর রহমান	মৃত মফিজ উদ্দিন	সন্দিড়া	সান্তাহারা
২৪৭২	এস.এম. আবুল কাসেম	কায়ছার আলী আহমেদ	কয়েতপাড়া	সান্তাহারা
২৪৭৩	মোঃ আব্দর সাজ্জাদ (আংগুর)	আজিজুর রহমান	সন্দিড়া	সান্তাহারা
২৪৭৪	মোঃ আব্দুল খবির	মৃত ইসমাইল হোসেন	প্রান্নাথপুর	সান্তাহারা
২৪৭৫	মৃত নছির উদ্দিন টুকু	মৃত ময়েন উদ্দিন	ছাতনী	সান্তাহারা
২৪৭৬	মোকলেছার রহমান	আফজাল হোসেন	ঢেকড়া	সান্তাহারা
২৪৭৭	মোঃ আবুল হোসেন সাকিদার	মৃত শহীদুল্লাহ	সন্দিড়া	সান্তাহারা
২৪৭৮	মোঃ নূরুল ইসলাম	মফিজ উদ্দিন	বশিপুর	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৭৯	মোঃ আইন উদ্দিন মণ্ডল	বাদেশ আলী মণ্ডল	বশিপুর	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮০	মৃত আব্দুর রহমান	উজির উদ্দিন	টিকড়ীপোওতা	সান্তাহারাপৌরঃ
২৪৮১	মৃত একরাম প্রাং	মৃত আবুল খায়ের প্রাং	হলুদঘর	সান্তাহারা পৌরঃ

২৪৮২	আহম্মদ আলী	মৃত বাজো	তারাপুর	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৩	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত ভিকন প্রাং	নতুন বাজার	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৪	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত গফুর প্রাং	মালশন	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৫	মোঃ আকতার আলী	রমজান আলী	সান্তাহার	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৬	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত শুকুর আলী	পোওতা	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৭	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত কাজেম উদ্দিন	পাথরকুটা	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৮	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত অবির উদ্দিন	বশিপুর	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৮৯	মোঃ তছির উদ্দিন	মৃত মোইম সরদার	বশিপুর	সান্তাহারা পৌরঃ
২৪৯০	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত আফছার আলী	হলুদঘর	সান্তাহারা পৌরঃ

উপজেলা শাজাহানপুর (মাঝিপাড়া)

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ইউনিয়ন
২৪৯১	মোঃ রমজান আলী খন্দকার	আলহাজ্ব কাশেম আলী	মনসেপপুর	রাণীরহাট
২৪৯২	মোঃ আবু তাহের	মৃত কেরামত আলী মণ্ডল	লক্ষীকোলা	মাদলা
২৪৯৩	মোঃ রাজিবুল ইসলাম	মৃত কাজেম উদ্দিন	চোপীনগর	চোপীনগর
২৪৯৪	মোঃ আব্দুল করিম	মৃত বাটু প্রাং	নারচী	নগরহাট
২৪৯৫	মৃত নিজাম উদ্দিন মণ্ডল	মৃত নবির উদ্দিন মণ্ডল	ঘাষিড়া	বোহাইল

উপজেলা দুপচাঁচিয়া

২৪৯৬	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত ইসারতুল্লা প্রাং	ডাকাহার	দুপচাঁচিয়া
২৪৯৭	মৃত হাফিজার রহমান	তাহির উদ্দিন	ডাকাহার	দুপচাঁচিয়া
২৪৯৮	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত দশরতুল্লা প্রাং	ডাকাহার	দুপচাঁচিয়া
২৪৯৯	মোঃ সেকেন্দার আলী মৃধা	মৃত ময়েজ উদ্দিন	চকমাধব	তালোড়া
২৫০০	মৃত আতাফর রহমান	আশরাফ আলী	বাঁশপাতা	তালোড়া
২৫০১	ইসমাইল হোসেন	মৃত মহির উদ্দিন	আমষট্র	আমষট্র
২৫০২	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত তুমির উদ্দিন মণ্ডল	দক্ষিণ চেচুরিয়া	রায়কালি
২৫০৩	মোঃ আব্দুস সালাম	মৃত কছির উদ্দিন	খিহালী	আলতাফ নগর
২৫০৪	মোঃ আব্দুস সালাম	ময়েজ উদ্দিন	বালুকাপাড়া	আলতাফ নগর
২৫০৫	মোঃ আকবর আলী	মৃত আহম্মদ আলী	বিহালী	আলতাফ নগর
২৫০৬	মোঃ আফাজ উদ্দিন	মৃত ঝড় মামুদ	সিংগা	গুনাহার
২৫০৭	মোঃ আমজাদ হোসেন কবিরাজ	মৃত শাহাদত আলী কবিরাজ	দুপচাঁচিয়া	দুপচাঁচিয়া
২৫০৮	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত আনোয়ার হোসেন	তালোড়া মুন্সিপাড়া	তালোড়া
২৫০৯	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন সাখিদার	মৃত আলতাফ হোসেন	ছোট বেড়াগ্রাম	গুনাহার
২৫১০	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	করিম উদ্দিন মণ্ডল	বড়িয়া	জিয়ানগর

উপজেলা শেরপুর

২৫১১	মোঃ আবুল কাশেম সরকার	মৃত জেল হোসেন সরকার	জামুর	কুসুম্বী
২৫১২	মৃত আঃ রশিদ খন্দকার	মৃত খন্দকার মোজাফফর রহমান	পাকুড়িয়া পাড়া	কুসুম্বী
২৫১৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম খান	মৃত শামসুদ্দীন খান	গাড়ীদহ মাদ্রাসা পাড়া	গাড়ীদহ
২৫১৪	মোঃ সামসুল হক	মৃত আঃ রহমান	শুভগাছা	খামারকান্দী
২৫১৫	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৃত রহিমুদ্দিন	নায়ের খাগা/দোলন	খানপুর
২৫১৬	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত খোদাবক্স	গজারিয়া	খানপুর
২৫১৭	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত আলাবক্স	হামছায়াপুর	মির্জাপুর
২৫১৮	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত বিরোজ আলী	মদনপুর	মির্জাপুর
২৫১৯	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (তোতা)	মৃত হরমুজ আলী	হামছায়াপুর	মির্জাপুর
২৫২০	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আঃ রহমান	খন্দকার টোলা	মির্জাপুর
২৫২১	মৃত নূরুল হক	মৃত কাদের আলী	আন্দিকুমড়া	মির্জাপুর
২৫২২	মৃত শেখ আঃ বারী	মৃত শেখ নেয়ামত আলী	খন্দকার টোলা	মির্জাপুর
২৫২৩	মোঃ হাছান আলী সরকার	মৃত সুজির উদ্দিন সরকার	ঘারতা	মির্জাপুর
২৫২৪	মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	মৃত রসুল বক্স	মদনপুর	মির্জাপুর
২৫২৫	এস,এম, আমির হোসেন	মৃত বিরোজ আলী	মদনপুর	মির্জাপুর
২৫২৬	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মৃত ওয়াহেদ আলী শেখ	মদনপুর	মির্জাপুর
২৫২৭	মোঃ নাজির উদ্দিন	মৃত ছলিমুদ্দিন	নয়াপাড়া শেরপুর	শেরপুর পৌরসভা
২৫২৮	মোঃ আবু আলম	মৃত জমির উদ্দিন আহমেদ	টাউন কলোনী	শেরপুর পৌরসভা
২৫২৯	মৃত আঃ খালেক	মৃত আয়েজ উদ্দিন মণ্ডল	নয়াপাড়া	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩০	মোঃ শাহা আলী	মৃত শাবাজ আকন্দ	নয়াপাড়া	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩১	মোঃ আ,জ,ম ইবনে মোস্তফা/ তাজ উদ্দিন	মৃত জমির উদ্দিন আহমেদ	টাউন কলোনী	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩২	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত বসারতুল্যা মুন্সী	টাউন কলোনী	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩৩	মোঃ সোলাইমান আলী	মৃত বয়তুল্যা	টাউন কলোনী/ কোটপাড়া	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩৪	মোঃ কাজী আব্দুল কাদের	মৃত কাজী আব্দুল গনি	রামচন্দ্র পুর	শেরপুর

				পৌরসভা
২৫৩৫	মোঃ শামসুর রহমান আকন্দ	মৃত আঃ মজিদ্ আকন্দ	টাউন কলোনী	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩৬	মোঃ ওয়াহেদ	মৃত নজির উদ্দিন আহমেদ	খন্দকার পাড়া	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩৭	মোঃ সাইফুল ইসলাম/ চাঁন	মৃত হারেছ আলী মণ্ডল	নওদপাড়া	মির্জাপুর
২৫৩৮	মোঃ আলীম উদ্দিন	মৃত রমজান আলী প্রাং	জগন্নাত পাড়া	শেরপুর পৌরসভা
২৫৩৯	মোঃ আজাহার আলী	মৃত লাল মামুদ মণ্ডল	উচলবাড়ীয়া	কুসুম্বী

উপজেলা সোনাতলা

২৫৪০	ফজলুল বারী	মৃত হারেছ উদ্দিন মণ্ডল	নওদাবগা	জোড়াগাছা
২৫৪১	মর্তেজা মাহমুদ	ভোলা সরকার	হাটকরমজা	জোড়াগাছা
২৫৪২	মোহাম্মদ আলী	মোবারক আলী	ঠাকুরপাড়া	জোড়াগাছা
২৫৪৩	আব্দুল রাজ্জাক	আব্দুল কাদের	বয়ড়া	জোড়াগাছা
২৫৪৪	আবুল হোসেন	মোঃ মন্টু মণ্ডল	দক্ষিণ বয়ড়া	জোড়াগাছা
২৫৪৫	আবুল বাশার	মৃত আবুল খায়ের	সোনাকানিয়া	জোড়াগাছা
২৫৪৬	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত রইচ উদ্দিন	মৃত রইচ উদ্দিন	গনষারপাড়া
২৫৪৭	আবুল কালাম	কবির উদ্দিন প্রাং	চরপাড়া	জোড়াগাছা
২৫৪৮	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোঃ হাফিজুর রহমান	কোড়াডাংগা	জোড়াগাছা
২৫৪৯	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	ভেলুরপাড়া	জোড়াগাছা
২৫৫০	মৃত ওমর ফারুক	আবুল হোসেন মণ্ডল	মোনার পটল	জোড়াগাছা
২৫৫১	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ ছহির উদ্দিন	দিঘলকান্দি	জোড়াগাছা
২৫৫২	মোঃ এমদাদুল হক	মোহসীন আলী মণ্ডল	জোড়াগাছা	জোড়াগাছা
২৫৫৩	মৃত আব্দুল মতিন	মৃত মোসলেম উদ্দিন	দড়িহাসরাজ	মধুপুর
২৫৫৪	শ্রী অহিন্দ্রনাথ রায়	শ্রী কৃষ্ণ নারায়ণ রায়	বারধরিয়া	দিগদাইড়
২৫৫৫	শ্রী কৃষ্ণ মহন্ত	শ্রী রাম চন্দ্র মহন্ত	বারঘরিয়া	দিগদাইড়

স্বাধীনতার ঘোষণা

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী এলাকায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ।
'মুক্তির ফুলবাড়ী' *ছবি সেলিনা শিউলী*
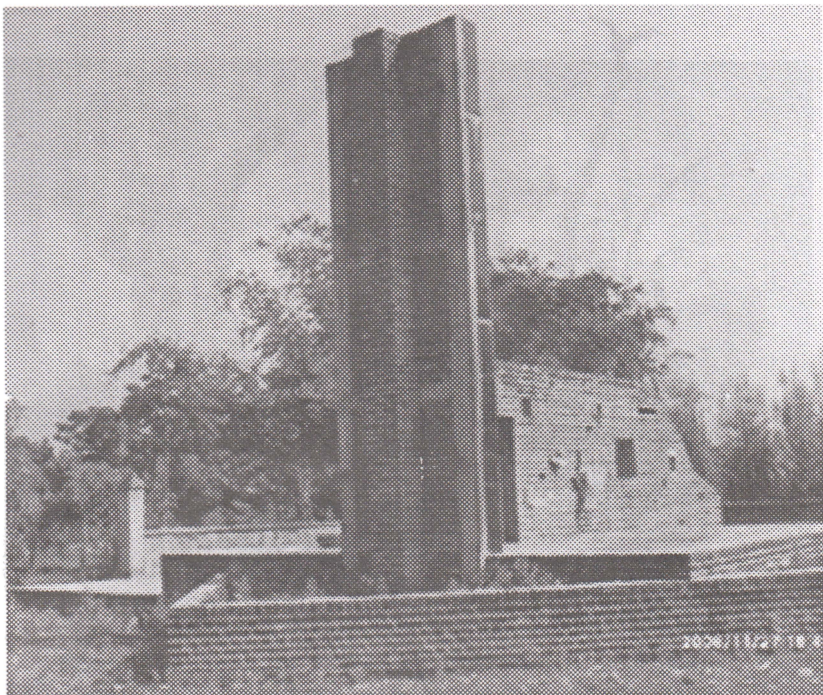
জয়পুরহাট সদর উপজেলার পাগলা দেওয়ানে বধ্যভূমির উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। *ছবি : সেলিনা শিউলী*

জয়পুরহাট সদর উপজেলার পাগলা দেওয়ানে ১৯৭১ সালের
পাক হানাদার বাহিনীর নির্মিত বাংকার। *ছবি : আসাদ*

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য 'বীর বাঙ্গালী' স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে সাতমাথায়। জামায়াত–শিবিরের আক্রমণে '৯৩ সালে ভাস্কর্যটি ক্ষতবিক্ষত হয়। সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরবর্তীকালে বিগত জোট সরকারের সময় স্থানান্তর করা হয় শহরের দ্বারপ্রান্ত বনানীতে। কিন্তু আজ অবধি তার কোন সংস্কার হয়নি। ছবিতে পূর্বের ও বর্তমানের অবস্থা বগুড়াবাসীর প্রশ্ন কবে হবে এর সংস্কার। *ছবি : মোমিন জিলু*

বগুড়ার এসডিও বাংলোর পাশের পুকুর যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ ফেলা হতো। *ছবি সেলিনা শিউলী*

বগুড়ার বাবুরপুকুরে ১৪জন শহীদের গণকবর অবহেলায়।   *ছবি   সেলিনা শিউলী*
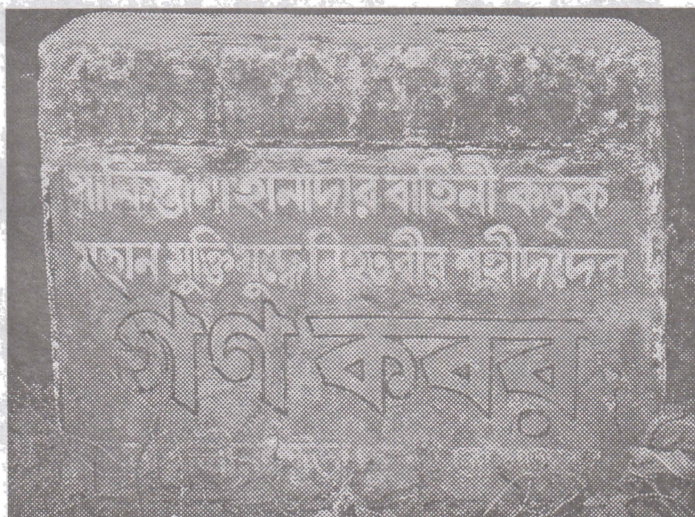
বগুড়া শহরের নারুলী রেলগেট সংলগ্ন গণকবর। যার শুধু নাম ফলকটিই রয়েছে। *ছবি : সেলিনা শিউলী*
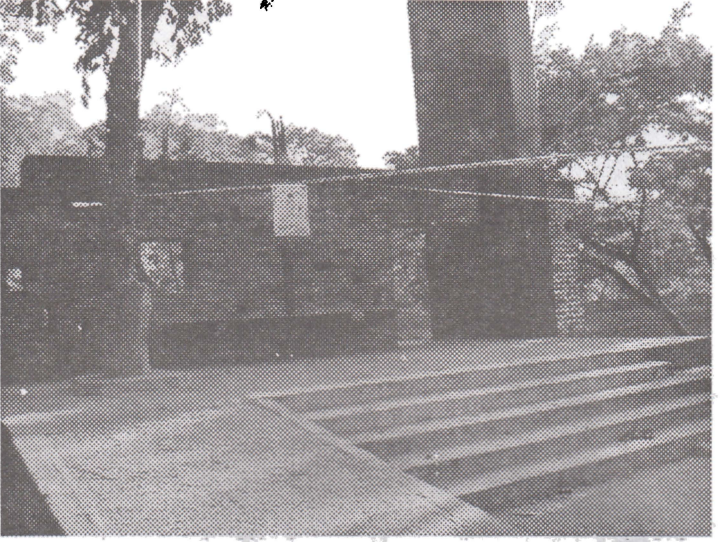
বগুড়া শহরের স্টেশনে রোড বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিসৌধ অবহেলা আর অযত্নে শিকার। সেলিনা শিউলী

মহান মুক্তিযুদ্ধো অসংখ্য লাশ ফেলা হয়েছিল এই জলাশয়ে। তা দেখিয়ে দেন রেলগেটের রক্ষী।
বগুড়ার শহরের নারুলী রেলগেট সংলগ্ন গণকবর। *সেলিনা শিউলী*

বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী এসপির আম বাগান যা গাঙ্গুলির বাগান নামে পরিচিত। কুয়ার মধ্যে অসংখ্য লাশ ফেলেছে।

বগুড়ার শেরপুরে বাগড়া কলোনিতে পাকসেনাদের ব্রাশফায়ারে চাচার ঝাঝড়া দেহ পুরাতন কবরে ঢুকিয়ে দেয়ার জায়গা দেখাচ্ছেন বায়জিদ বোস্তামী। ছবি সেলিনা শিউলী

বগুড়ার শেরপুরে বাগড়া কলোনীতে বধ্যভূমিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কুদ্দুসকে পুতে রাখা জায়গা দেখাচ্ছেন তার স্ত্রী ময়না বেওয়া (৫৮)। *ছবি : সেলিনা শিউলী*

বগুড়ার শেরপুরে বাগড়া কলোনিতে বধ্যভূমিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবছার সরকার ও বড় ভাই মাস্টার মুনছের সরকারকে পুতে রাখা জায়গা দেখাচ্ছেন তার স্ত্রী ফাতেমা বেওয়া (৫৫)। *ছবি : সেলিনা শিউলী*
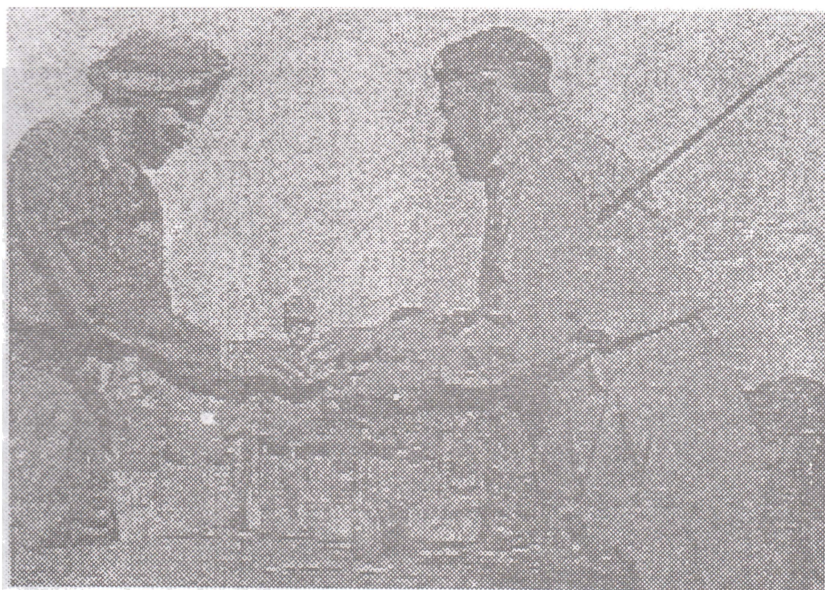
মেজর জেনারেল লচমন সিং এর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন পাকবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ মিত্রবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার।
ছবি : হামিদুল হোসেন তারেক (বীরবিক্রম)

বগুড়ার অভিমুখে ট্যাঙ্ক নিয়ে যাত্রা। *ছবি : হামিদুল হোসেন তারেক (বীরবিক্রম)*
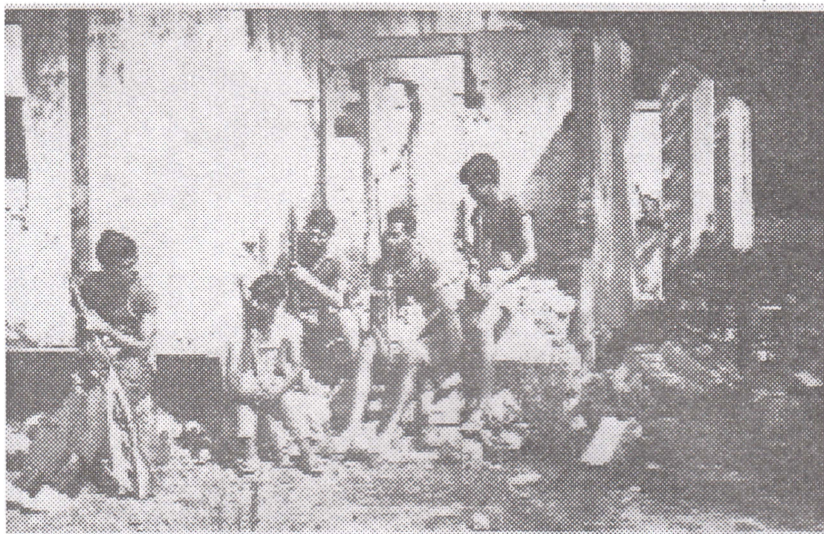
বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন অবস্থা। *ছবি : হামিদুল হোসেন তারেক (বীরবিক্রম)*
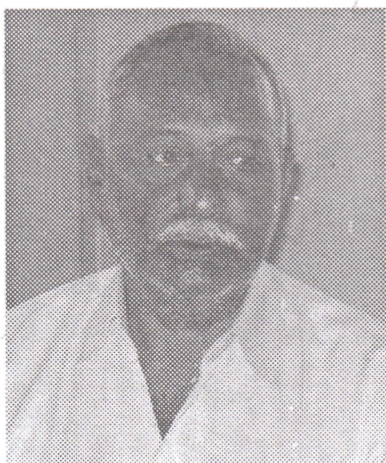
মুক্তিযোদ্ধা টি এম মুসা পেস্তা।

মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম মন্টু
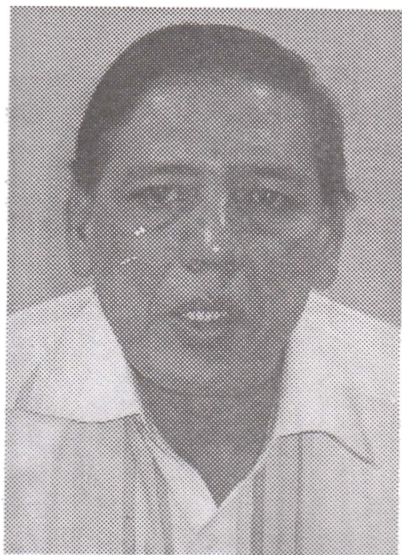
মুক্তিযোদ্ধা মাছুদার রহমান হেলাল

মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াছ উদ্দিন আহম্মেদ
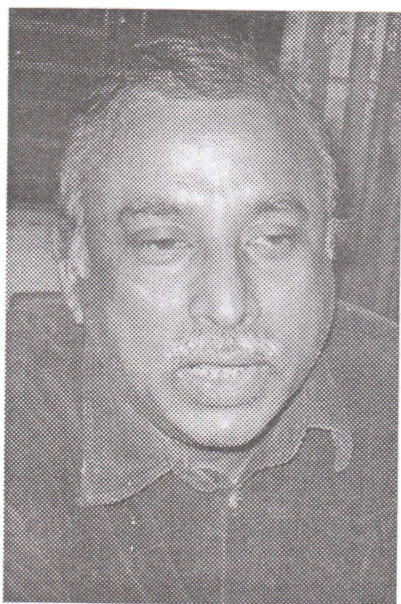
মুক্তিযোদ্ধা জগলুর রশীদ জগলু
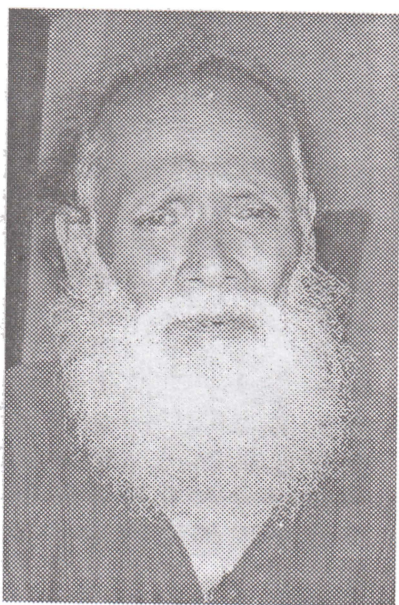
মুক্তিযোদ্ধা মসলেম উদ্দিন। প্রতিবাদের আজও কালো পোষাক পরেন
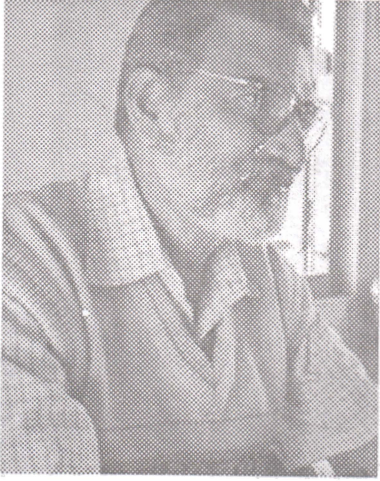
মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ হারুন সুলতান
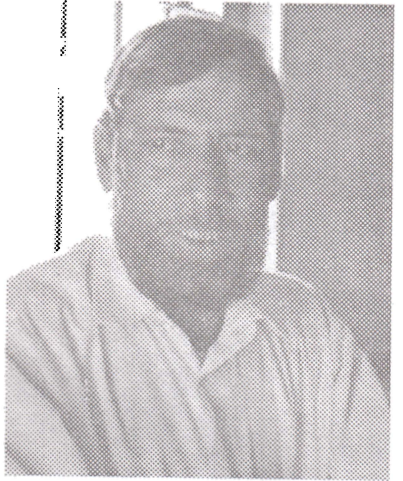
মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিন
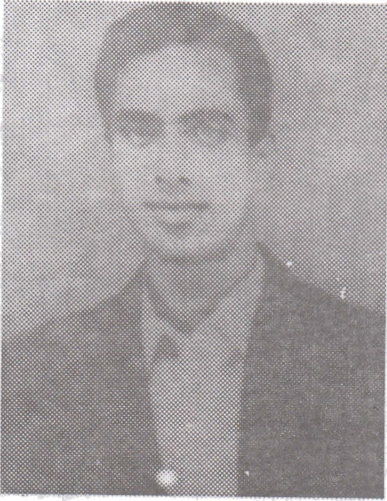
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাছুদুল আলম চান্দু। ১৯৭১ সালের বগুড়ার গাবতলীর দাড়িপাড়ায় পাকহানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আজাদ

শহীদ কাবুল আহম্মেদ

শহীদ আবুল হোসেন পশারী

রাজাকার আয়েজ উদ্দিন

বগুড়ায় যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামী ওসমান বিহারী
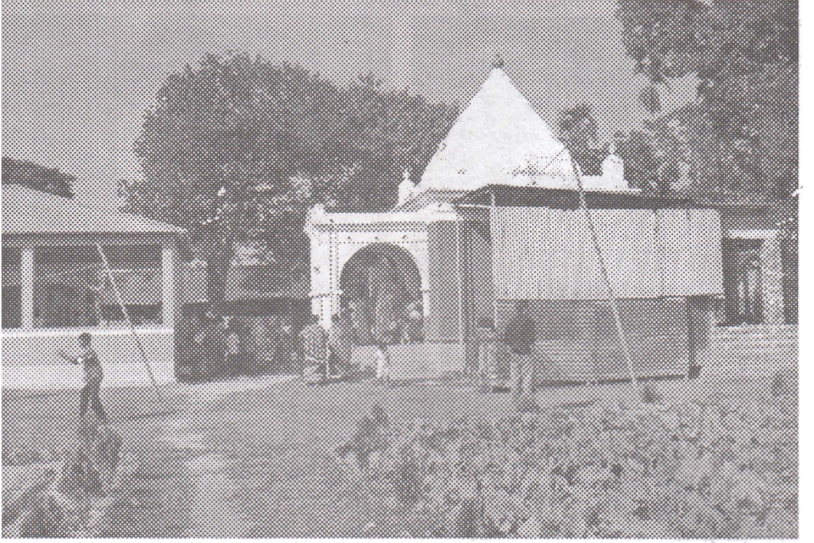
বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী সাধুর আশ্রম। এখানে বৃদ্ধ সাধু ও তার ভাইসহ অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল পাক হানাদাররা

বগুড়ার ধুনট উপজেলার পশ্চিম ভরনশাহীতে ২১ জনের গণকবর

বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী এসপির বাগানের। এখানে রাজাকারদের সহায়তায় নিরীহ মানুষদের হত্যা করে লাশ ফেলেছিল
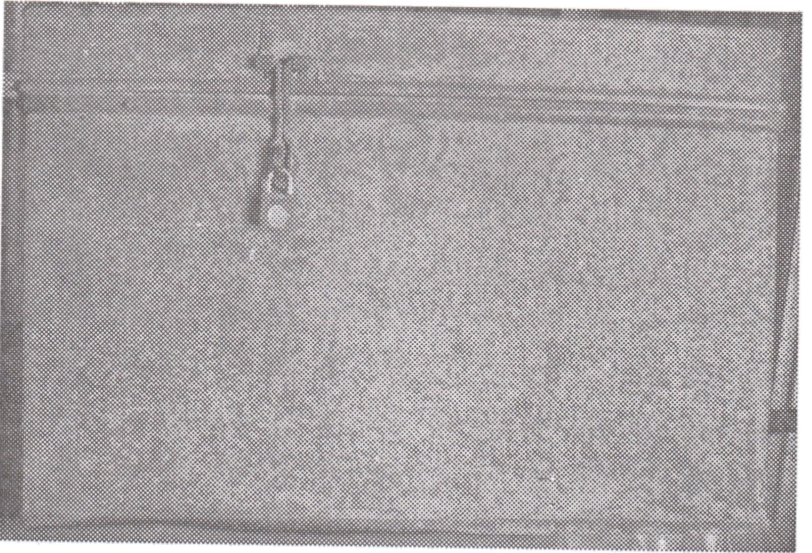
বগুড়া ধুনট উপজেলার ভরনশাহী গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও গোলা বহনে ব্যবহৃত ট্রাঙ্ক

বগুড়ার অড়িয়া বাজারের মাসুদ নগর। এখানে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিলে প্রতিরোধে মাসুদ শহীদ হন
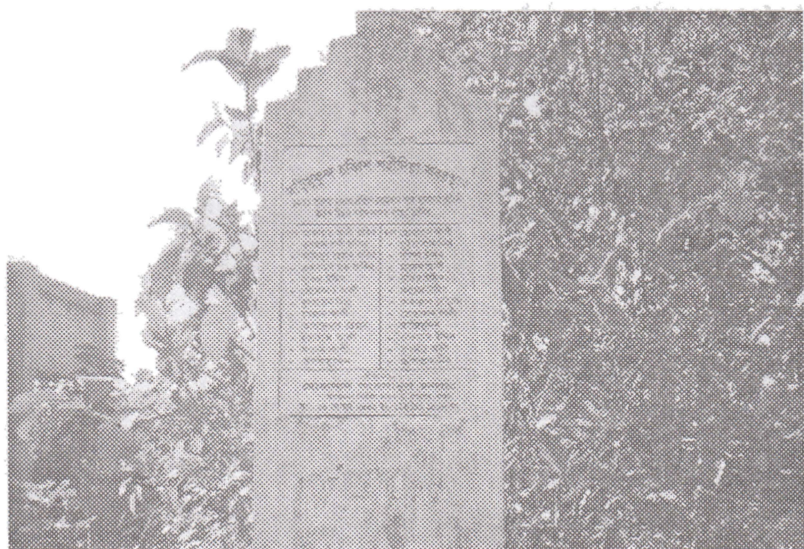
বগুড়ার শেরপুরের দড়িমুকুন্দে ২৪ জন শহীদের নামফলক খচিত কবরস্থান

বগুড়ার শেরপুরে বাগড়া কলোনি। এখানে ইটভাটায় পাকহানাদাররা মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামের নিরীহ জনতাকে হত্যা করে লাশ পুতে রাখে
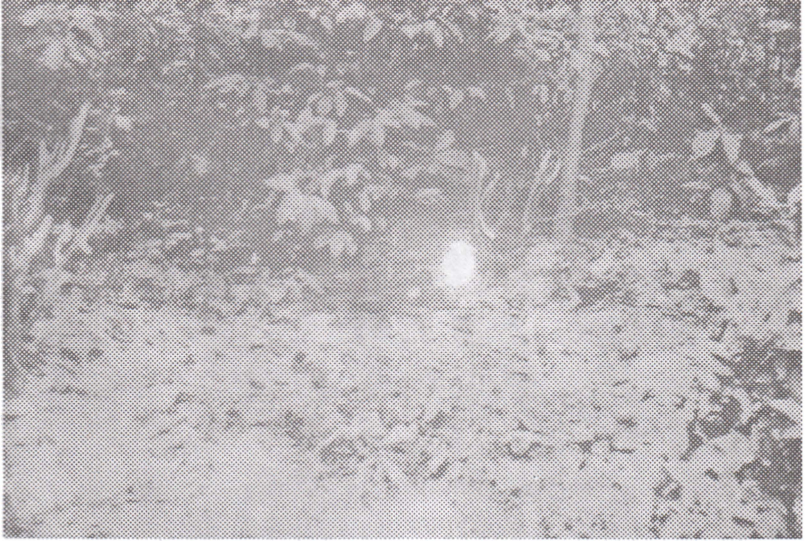
ঠেঙ্গামারার বালাপাড়া গ্রামে বগুড়ার প্রথম শহীদ তোতার কবর
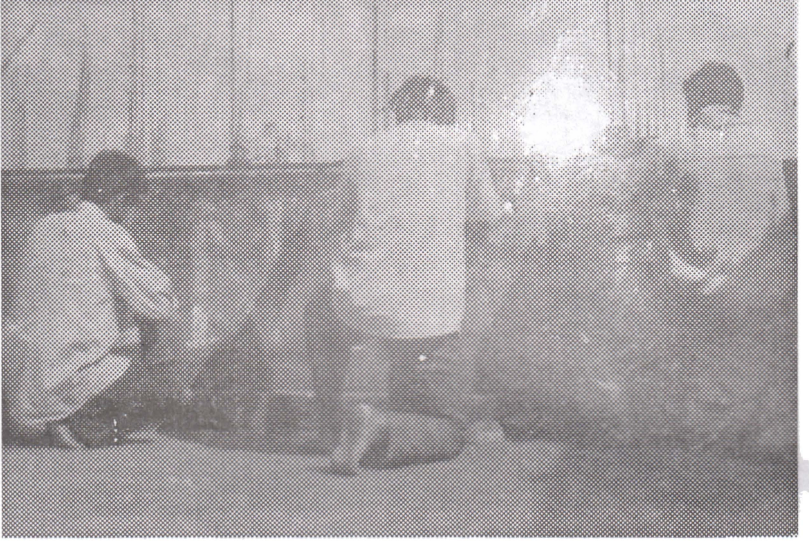
বড়গোলাস্থ ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক (আজকের ক্রেডিট ট্রাষ্ট ব্যাংক–এর ছাদের ওপর যুদ্ধরত টিটু, হিটলু ও ছুনু

১৯৬২ সালে তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বগুড়ার সাতমাথায় বিক্ষোভ

বগুড়ার প্রথম শহীদ তোতা ঠেঙ্গামারার এই রাস্তায় ব্যরিকেড দেওয়ার জন্য গাছ কাটতে গিয়ে শহীদ হয়।
১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ

১৯৭১ সালে ১লা এপ্রিল আড়িয়া বাজার পাক ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে গিয়ে শহীদ হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ
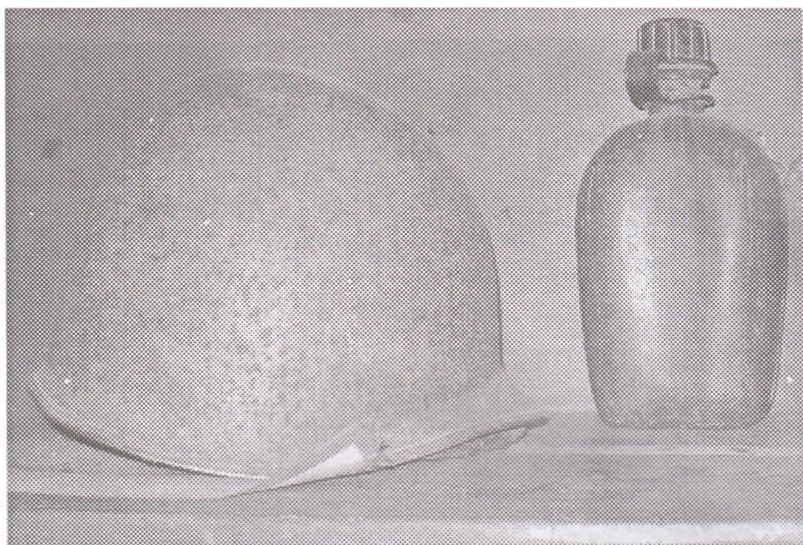
পাকসেনাদের ব্যবহৃত হেলমেট ও পানির পট

পাকসেনাদের ব্যবহৃত জুতা

বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী সাধুর আশ্রমের একাংশ। এখানে হত্যা ও নির্যাতন চলে নিরীহ মানুষদের উপর

বগুড়ার আড়িয়াবাজারে পাকিস্তানি ক্যান্টনমেন্ট ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল এই ঘর থেকেই পাকিস্তানি আর্মি গুলি চালিয়েছিল

বগুড়ার বাবুর পুকুরে ১৪জন শহীদ পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যদের কয়েকজন

আবুল হোসেনের মাতা আলতাফুন নেছা

ওয়াজেদার রহমান টুকুর স্ত্রী
লাইলী বেওয়া

ফজলু খানের স্ত্রী
রাজিয়া বেওয়া

আব্দুস সবুর ভোলার স্ত্রী
রেজিনা বেওয়া

বাচ্চু শেখের স্ত্রী
হামিদা বেওয়া

আলতাফ আলীর পুত্রবধু
আনজুমান আরা

INSTRUMENT OF SURRENDER

MAY IT BE KNOWN TO ALL THAT I, PA-117 MAJOR GENERAL NAZAR HUSSAIN SHAH, GENERAL OFFICER COMMANDING 16 INFANTRY DIVISION, PAKISTAN ARMY, DO HEREBY SURRENDER UNCONDITIONALLY TO MAJOR GENERAL LACHHMAN SINGH LEHL, VrC, GENERAL OFFICER COMMANDING 20 MOUNTAIN DIVISION INDIAN ARMY, AND ORDER ALL MILITARY AND PARA-MILITARY FORCES. UNDER MY COMMAND, TO LAY DOWN THEIR ARMS.

2 HENCEFORTH ALL ORDERS ISSUED BY MAJOR GENERAL LACHHMAN SINGH LEHL, VrC, OR ANY OFFICER APPOINTED BY HIM, SHALL BE OBEYED BY ME AND ALL RANKS OF MILITARY AND PARA MILITARY FORCES, WHO WERE UNDER MY COMMAND.

3 SIGNED ON THIS EIGHTEENTH DAY OF DECEMBER NINETEEN SEVENTY ONE AT BOGRA.

(LACHHMAN SINGH LEHL)
MAJOR GENERAL
GENERAL OFFICER COMMANDING
20 MOUNTAIN DIVISION
INDIAN ARMY
18 DEC 71

(NAZAR HUSSAIN SHAH)
MAJOR GENERAL
GENERAL OFFICER COMMANDING
16 INFANTRY DIVISION
PAKISTAN ARMY
DEC 71

মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের লিখিত দলিল

মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের লিখিত দলিল।
সূত্র : হামিদুল হোসেন তারেক (বীরবিক্রম)

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল কুদ্দুস বুলবুল এর হাতের লেখা

(১) মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস আরা পারভীন ডলিকে তার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ভাই এভাবে ছবি এঁকে যুদ্ধের কলাকৌশল শিখিয়েছিল
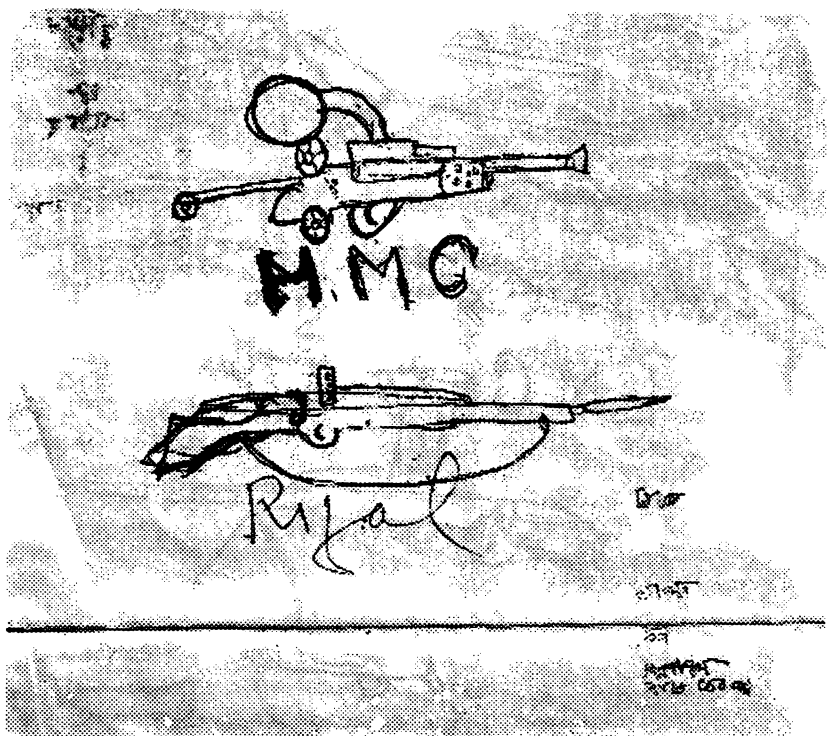
(২) মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস আরা পারভীন ডলিকে তার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ভাই এভাবে ছবি এঁকে যুদ্ধের কলাকৌশল শিখিয়েছিল

সাত নম্বর সেক্টর

সাত নম্বর সেক্টর দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর হেড কোয়ার্টার ছিল তরঙ্গপুর। লেঃ কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) সেক্টর কমান্ডার হিসেবে এই সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সেক্টরটিকে ৯টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়।

১। লালগোলা সাব-সেক্টর — ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন সাব-সেক্টর কমান্ডার। পরবর্তীতে বীরবিক্রম উপাধি পেয়েছিলেন।

২। মেহেদীপুর সাব-সেক্টর — ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ)

৩। হামজাপুর সাব-সেক্টর — ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, সাব-সেক্টর কমান্ডার। (পরবর্তিতে বীরবিক্রম)

৪। শেখপাড়া সাব-সেক্টর — ক্যাপ্টেন রশিদ সাব-সেক্টর কমান্ডার।

৫। ভোলাহাট সাব-সেক্টর — লেঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-সেক্টর কমান্ডার।

৬। মালঞ্চ সাব-সেক্টর — প্রথমে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন, সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, পরে একজন সুবেদার তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেন।

৭। তপন সাব-সেক্টর — মেজর নাজমুল হক, প্রথম দিকে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন, পরে লেঃ কর্নেল নূরুজ্জামান ৭নং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে তিনি ৭নং সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। এক মর্মান্তিক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। পরে এক সুবেদার এই সাব-সেক্টর কমান্ড করেন।

৮। ঠোকরাবাড়ি সাব-সেক্টর — সুবেদার মোয়াজ্জেম।

৯। আঙ্গিনাবাদ সাব-সেক্টর — এই সাব সেক্টরে দুটি অপারেশনাল ক্যাম্প ছিল। বড়াহার ক্যাম্প ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থাপাথাপা ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা মহসীন ক্যাম্প অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন। আঙ্গিনাবাদ

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

১। রশীদ হায়দার সম্পাদিত — শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ।
২। আসলাম সানী সম্পাদিত — শহীদ বুদ্ধিজীবী।
৩। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সম্পাদিত — বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল (৮ম, ৯ম ও ১০ম খণ্ড)।
৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত — শত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল (৯ম খণ্ড)।
৫। এ.কে.এম সামসুদ্দীন তরফদার — দুই শতাব্দীর বুকে।
৬। মোহাম্মদ জাকির সুলতানা সোনা — সারিয়াকান্দীর ইতিবৃত্ত।
৭। মহিউদ্দিন আহম্মদ সম্পাদিত — আমাদের একাত্তর।
৮। রশীদ হায়দার সম্পাদিত — স্মৃতি ১৯৭১।
৯। মুহাম্মদ নূরুল কাদির রচিত — দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা।
১০। মাহমুদ শফিক — গণহত্যা-'৭১।
১১। শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন বি,এল — বগুড়ার ইতিহাস
১২। কাজী মোহাম্মদ মিছের — বগুড়ার ইতিকাহিনী।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

১৩। আবু মাহমুদ (লেফট্যান্যান্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের প্রতি খোলা চিঠি) বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (মুক্তিযুদ্ধ পর্ব)
১৪। (দৈনিক পাকিস্তান ১১, অক্টোবর, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত) বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ পর্ব।
১৫। আজিজার রহমান তাজ : মল্লিকা।
১৬। রাজিব ব্যানার্জী : প্রতিস্রোত (সংকলন)
১৭। দৈনিক প্রথম আলো
১৮। বাংলাদেশ গেজেট।

যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

১। রেজাউল করিম মুন্টু	মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক পৌর চেয়াম্যান, বগুড়া।
২। মোফাজ্জল হোসেন	মুক্তিযোদ্ধা - বিহার।
৩। মকবুল হোসেন	মুক্তিযোদ্ধা - বিহার।
৪। মাসুদার রহমান হেলাল	মুক্তিযোদ্ধা বগুড়া সদর।
৫। মোসলেম উদ্দিন	মুক্তিযোদ্ধা- গাবতলী।
৬। ইউসুফ হারুন	মুক্তযোদ্ধা- ধুনট।
৭। শেখ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন	মুক্তিযোদ্ধা- ধুনট।
৮। টি.এম.মুসা পেস্তা	মুক্তিযোদ্ধা- ধুনট।
৯। ছাইদুজ্জামন তারা	মুক্তিযোদ্ধা- বগুড়া সদর।
১০। দিলীপ চৌধুরী	মুক্তিযোদ্ধা- মাদলা।
১১। ফিরোজ আহমেদ	মুক্তিযোদ্ধা- বগুড়া-সদর।
১২। ইলিয়াস উদ্দিন আহমদ	মুক্তিযোদ্ধা- বগুড়া সদর।
১৩। মোজাম্মেল হোসেন	প্রত্যক্ষদর্শী, নারুলী।
১৪। দিপালী রানী	প্রত্যক্ষদর্শী, মাদলা।
১৫। এ.কে.এম রেজাউল হক রাজু	মুক্তিযোদ্ধা, মাদলা।
১৬। আনছার আলী	মুক্তিযোদ্ধা।
১৭। জহুরুল ইসলাম	মুক্তিযোদ্ধা।
১৮। নাজনীন বেগম (রাজাকার ওসমান বিহারী)	
১৯। মনিকব চৌধুরী	
২০। ফরিদ উদ্দিন	মুক্তিযোদ্ধা-ধুনট।
২১। হাসেম আলী	মুক্তিযোদ্ধা-ধুনট।
২২। মোজাম্মেল হক	মুক্তিযোদ্ধা- ধুনট।
২৩। শামসুল হক	মুক্তিযোদ্ধা- ধুনট।
২৪। ফেরদৌস আরা পারভীন ডলি	মুক্তিযোদ্ধা-গাবতলী।
২৫। মোস্তাফিজুর রহমান	মুক্তিযোদ্ধা- ধুনট।
২৬। হামিদুল হোসেন তারেক	বীরবিক্রম।
২৭। প্রদীপ মোহন্ত	সাংবাদিক।
২৮। ডাঃ জাহিদুর রহমান	মুক্তিযোদ্ধা।
২৯। গাজীউল হক	ভাষাসৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা।

৩০। রবিউল হক হক খান	সম্পাদক, দৈনিক
৩১। আলিমুলদ্দীনা হারুন মন্ডল	পৌর পিতা-ধুনট।
৩২। মঞ্জুর রহমান	মুক্তিযোদ্ধা।
৩৩। আশরাফুল ইসলাম	মুক্তিযোদ্ধা।
৩৪। জগরুল রশীদ	মুক্তিযোদ্ধা।
৩৫। মোমিন জিলু	ফটো সাংবাদিক (দৈনিক প্রথম আলো)
৩৬। গোলাম ওয়াহাব	মুক্তিযোদ্ধা-ধুনট।
৩৭। দোল খান	মুক্তিযোদ্ধা-বগুড়া সদর।
৩৮। রতন খান	হুড়াকার।
৩৯। মাসুদ রানা	সাংবাদিক (প্রথম আলো) নাটোর।
৪০। আনোয়ার পারভেজ	সাংবাদিক, জয়পুরহাট প্রতিনিধি আলো
৪১। তাইবুল হাসান খান	গবেষক ও লেখক, (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
৪২। শফিকুল ইসলাম সোহেল	ব্যবসায়ী ও ইতিহাস আনুসন্ধানী।
৪৩। সমুদ্র হক	সিনিয়র সাংবাদিক (দৈনিক জনকণ্ঠ)
৪৪। মিলন রহমান	সাংবাদিক প্রথম আলো
৪৫। শিহাব সাহরিয়ার	গবেষক, প্রযোজক
৪৬। রফিকুল ইসলাম ভান্ডারী	প্রভাষক। নুন গোলা ডিগ্রী কলেজ।
৪৭। তোফাজ্জল হোসেন	অধ্যক্ষ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ।
৪৮। শাহাদাত আলম ঝুনু	প্রভাষক, বগুড়া। পুলিশ লাইন হাইস্কুল এন্ড কলেজ।
৪৯। আসাদুল ইসলাম	সাংবাদিক, প্রথম আলো।
৫০। মোহিত-উল-আলম মিলন	ফটোগ্রাফার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী।
৫১। মনিক চৌধুরী	
৫২। অমর নাথ চৌধুরী	
৫৩। আজিজার রহমান তাজ।	
৫৪। রাজিব ব্যানার্জী	
৫৭। বারিফুল কবির (S.M. স্যার)	
৫৮। মোখ সবুজ উদ্দন	সাংবাদিক
৫৯। মনযূর উল করীম	সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব।
৬০। নন্দকিশোর আগরওয়ালা	আইনজীবী-জয়পুরহাট।
৬১। মোঃ আবুল হোসেন	জয়পুরহাট
৬২। আমিনুল হক বাবু	জয়পুরহাট
৬৩। বজলুল করিম বাহার	অধ্যক্ষ, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

৬৪। রফিকুল ইসলাম লাল	মুক্তিযোদ্ধা।
৬৫। আব্দুল লতিফ পশারী (ববি)	এডভোকেট-বগুড়া বার।
৬৬। শাহরীন মালা	আইনজীবী- ঢাকা সুপ্রীম কোর্ট।
৬৭। আব্দুল হক	
৬৯। আবুল ফজল রোমেল	ছাত্র।
৭০। টি.এম. মিজানুর রহমান	সাংবাদিক। আমার দেশ (সরণ খোলা প্রতিনিধি)
৭১। সাবেরা ঝর্না	সাংবাদিক। সাপ্তাহিক বনাঞ্চল।
৭২। আনোয়ার হোসেন আকন	দৈনিক খবর।
৭৩। জিয়া শাহীন	সাংবাদিক-মানবজমীন
৭৪। আব্দুস সালাম সরকার	মুক্তিযোদ্ধা
৭৫। মোহন আকন্দ	সাংবাদিক, সমকাল।
৭৬। খায়রুল ইসলাম	সাংবাদিক, প্রথম আলো, নাটোর।
৭৭। হারুন–অর–রশীদ	চাকুরীজীবী

. ——— .